কাঁটাতারে প্রজাপতি

সেলিনা হোসেন

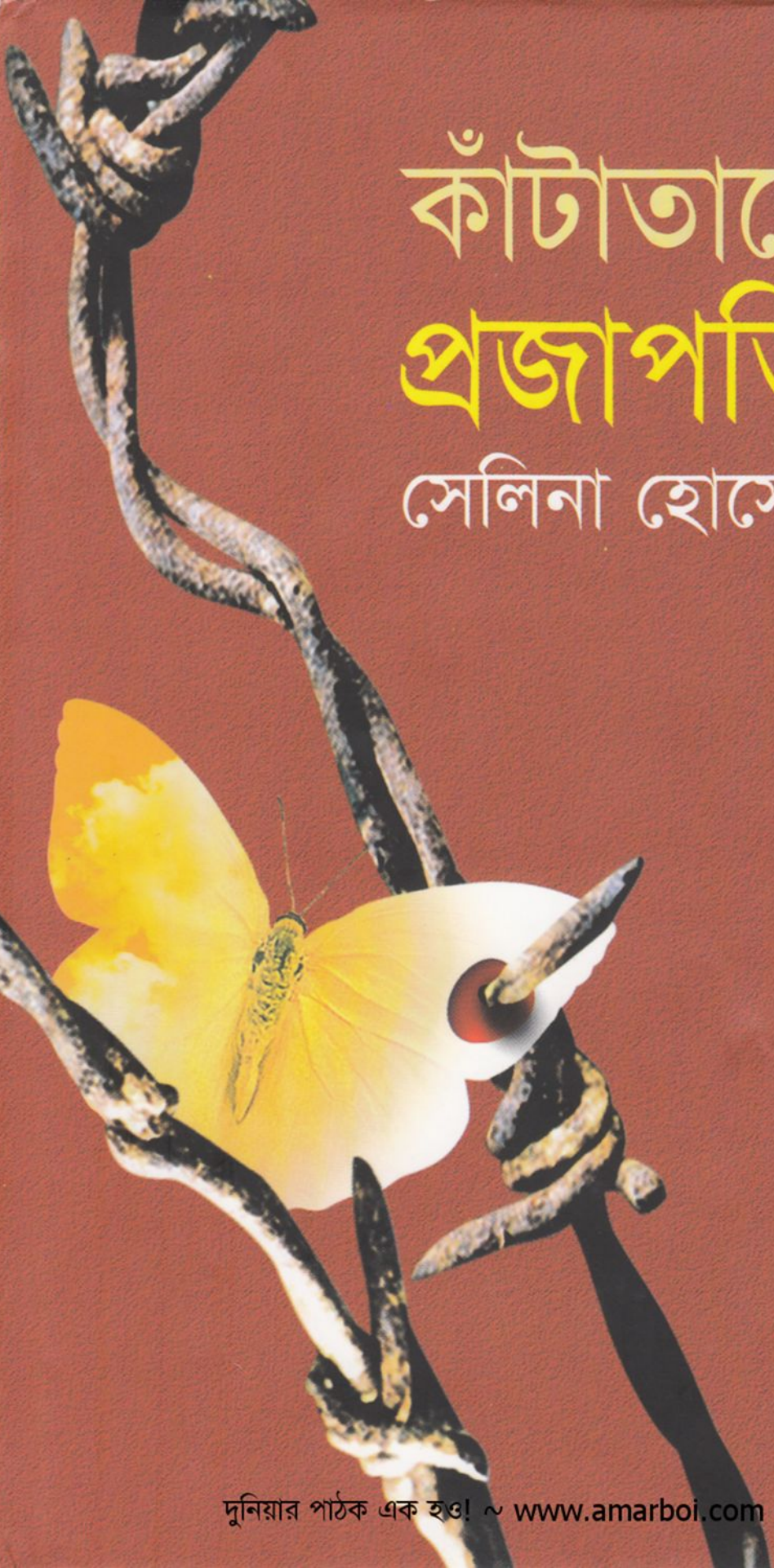

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁটাতারে প্রজাপতি • সেলিনা হোসেন

'কাঁটাতারে প্রজাপতি' নাচোলের তে-ভাগা আন্দোলনের শিল্পরূপ।

এ উপন্যাসে ইলা মিত্রের মতো ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীর পাশাপাশি উঠে এসেছে আরো অনেক সাধারণ জন– আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, সফলতা-ব্যর্থতা নিয়ে যাদের প্রত্যেকে একেকজন পরিপূর্ণ মানুষ।

ইতিহাসের বিচারে তে-ভাগা আন্দোলন হয়তো কাঙ্ক্ষিত পরিণতি অর্জন করতে সফল হয় নি, কিন্তু এ এক অমোঘ সত্য যে কখনো নিঃশেষ হয় না জনগণের শক্তি ও সংগ্রাম। জীবনের বিনিময়ে জীবন অর্জন করে নবতর প্রেরণা। সেখান থেকে উজ্জীবিত হয় নতুন প্রজন্ম। এভাবেই ভরে ওঠে ইতিহাসের সাদা পৃষ্ঠাগুলো। উপন্যাস মানবের সঙ্গে মানবের সংযোগ সেতু– এপার থেকে ওপারে নিয়ে যায় মানুষকে। 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' এমন এক রচনা যা পাঠককে নিয়ে যায় নিজের কাছ থেকে বহু দূরে এবং একই সঙ্গে ফিরিয়ে আনে নিজের খুব কাছে।

এভাবেই এ উপন্যাস– গল্প ও জীবনের গাঁথাকে গ্রন্থিত করেছে অসাধারণ শব্দ নৈপুন্যে। এই শিল্পের ক্যানভাসে মানুষই একমাত্র সত্য– যে মানুষ পুড়ে যায়, উঠে দাঁড়ায় এবং জীবনের ফুল ফোটায়।

প্রচ্ছদ ▪ ধ্রুব এষ

সেলিনা হোসেনের জন্ম ১৪ জুন ১৯৪৭। রাজশাহী শহর। ষাটের দশকের মধ্যভাগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে লেখালেখির সূচনা। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'উৎস থেকে নিরন্তর' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে।

রাজশাহীতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ার সময়ে বিভাগীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশিপ স্বর্ণপদক পান। ড. মুহম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক (১৯৬৯); বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮০); আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১); অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৪); শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৬ ও ১৯৯৭); দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্যে 'রামকৃষ্ণ জয়দয়াল হারমোনি অ্যাওয়ার্ডস', দিল্লি (২০০৬); জাতীয় পুরস্কার একুশে পদক (২০০৯); দিল্লির ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানিং এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট থেকে 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' (২০১০); ঢাকা লেডিস ক্লাব কর্তৃক লায়লা সামাদ স্বর্ণপদক (২০১১); রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা থেকে ডিলিট উপাধি (Honoris Causa) ২০১০; 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসের জন্য আইআইপিএম, দিল্লি কর্তৃক রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ২০১০। দিল্লির সাহিত্য আকাদেমী থেকে প্রেমচাঁদ ফেলোশিপ লাভ ২০০৯।

'নীল ময়ূরের যৌবন' ও 'যাপিত জীবন' উপন্যাস রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি' ও 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ পত্রে পাঠ্য। প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতায় গল্প পাঠ্য। 'গায়ত্রী সন্ধ্যা', 'নীল ময়ূরের যৌবন' ও 'হাঙর নদী গ্রেনেড' আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ৩টি উপন্যাস নিয়ে এমফিল থিসিস সম্পন্ন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যের ওকটন কমিউনিটি কলেজে ২০০৬ সালের দুই সেমিস্টারের পাঠ্য ছিল 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন ও জেন্ডার স্টাডিস ডিপার্টমেন্টে 'কালকেতু ও ফুল্লরা' উপন্যাস পাঠ্য।

ইংরেজি, হিন্দি, মারাঠি, কন্নড়, রুশ, মালে, ফরাসি, জাপানি, উর্দু, মালয়েলাম্, কোরিয়ান, ফিনিস, আরবি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর গল্প এবং উপন্যাস। ইংরেজিতে অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪।

উৎসর্গ

পুড়ে যায় গ্রাম এবং মানুষ
ঘাসফুলে তবু প্রজাপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশকের কথা

নাচোলের তে-ভাগা আন্দোলনের এক শাণিত শিল্পরূপ হচ্ছে জননন্দিত কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের 'কাঁটাতারে প্রজাপতি'। একটা উপন্যাসের ভিতর কিভাবে একটা সময় নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করা যায়, এই বইটি তার এক বিরল সাক্ষী বললে অত্যুক্তি করা হবে বলে মনে হয় না। বিভিন্ন সময়ে আমরা এমন কিছু উপন্যাস এই কথাশিল্পীর হাত থেকে পেয়েছি, যা বোধ করি শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, ইতিহাসের অংশও বটে। ১৯৮৯ সালে যখন 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' প্রকাশিত হয় তখন থেকেই বোদ্ধা ও সন্ধিৎসু পাঠকের কাছে এর মূল্যায়ন ছিল আশাতীত। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে এই গ্রন্থ। পরবর্তীতে ২০০৩ ও ২০০৭ সালে বের হয় বইটির আরো দুটো মুদ্রণ। কিন্তু ১৯৮৯ থেকে ২০১৩— এ দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে লেখক মনে করেছেন বইটির পরিমার্জন দরকার। তাই তিনি নতুন করে কিছুটা সময় ব্যয় করে উপন্যাসটিকে করেছেন আরো শাণিত— আরো সময়োপযোগী। বইটি পেয়েছে কিছুটা হলেও নতুন রূপ। এই পরিমার্জিত রূপই পাঠককে নতুন রসদ যোগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রকাশক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনাকাল
ডিসেম্বর ১৯৮৫-জুন ১৯৮৮
পরিমার্জন নভেম্বর ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিবগঞ্জে সুতো বিক্রি করে আজিজের কাছে যাবে বলেই ভেবে নেয় আজমল। সুতোর ভালো দাম পেয়েছে, এই খুশির খবর আজিজকেই আগে দিতে হবে। তাঁতিরা বলে, ইয়াসিন বসনির সুতোয় বেনারসী বুনলে তা আর সব শাড়িকে ম্লান করে দেয়, কালো মেয়ে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দৃশ্যটা কল্পনা করতেই হাসি পায় ওর, কিছুটা রোমাঞ্চিতও হয়। অমন আলো করা কারুর এখনো দেখাই পেল না। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে। আজিজ কেমন আছে? মাস ছয়েক মামা বাড়ি যাওয়া হয় না। দুমাসে চার মাসে নাচোল না গেলে ওর হাঁফ ধরে, যেন শীতকালের শ্বাসকষ্ট, কিছুতেই যন্ত্রণা কমে না। তাছাড়া মল্লিকপুরে ছমির আলির ওখানে না গেলেই নয়। ছমির আলি আজিজের মামা হলেও ওর সঙ্গে সম্পর্ক দারুণ। গেলে ছাড়তেই চায় না। আর কথা? বুক উজাড় করে বলে। তার জীবনের এমন কোনো কথা নেই, যেটা আজমল শোনেনি, কোনো কোনো ঘটনা অনেকবার শোনা হয়েছে। শুনতে ওর ভালো লাগে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যদি গল্পের মতো হয়, তার আকর্ষণ ওর কাছে অনেক বেশি।

গরুর গাড়ির দুলুনিতে ঘুম আসে না, ঘাড় ব্যথা হয়। এবড়ো-থেবড়ো অসমান রাস্তায় এই এক ঝামেলা। গরুর গাড়িতে এখনো ও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি, হাঁটতেই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু সঙ্গে এত টাকা নিয়ে হাঁটতে ওর সাহস হয়নি। তাছাড়া পথও অনেক, হেঁটে কুলোন যাবে না। গরুর গাড়ির ছইয়ে হেলান দিয়ে ও সামনে পা ছড়িয়ে দেয়। রাস্তার দুপাশে আম-বাগান। এখন মৌসুম নয়, ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগে গাছগুলো। রাস্তায় লোক চলাচল বেশ, আজ বোধহয় হাটবার। লোকজন নানা রকম জিনিস নিয়ে ছুটছে। ও তাকিয়ে দেখে, ছমির আলির কথা মনে হয়। হাটের দিন লোকটা পাগলের মতো সওদা করে। নিজে চমৎকার রাঁধতেও পারে। ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানে, গাঁয়ের লোকে ছমির আলি বুড়োর হিংসে করে। এই পঁচাত্তর বছর বয়সেও লোকটা প্রাণ খুলে হাসতে পারে। চোখে ছানি পড়েনি, পরিষ্কার দেখতে পায়। এই বয়সে সবাই যখন কথার খেই হারিয়ে ফেলে, একটা কথা বারবার বলে, তখন ও পুনরাবৃত্তি না করে কথা বলে। বুড়োর স্মৃতিশক্তি প্রখর। বড় ধরনের ঘটনা তো মনে থাকেই, ছোটখাটো অনেক কিছুও অবলীলায় বলে যায়। লোকে হিংসে করলে বুড়োর ভালোই লাগে। ও বাতাসে উড়িয়ে দেয় মানুষের হিংসে। কিন্তু পারে না রতনের সঙ্গে। এই হিংসে বুড়োর একমাত্র ছেলে রতনেরও আছে। বাপের কোনো কিছুই ওর পছন্দ হয় না। মানুষের যখন বুড়িয়ে থিতিয়ে যাবার কথা, তখন কেউ যদি বিনা বাধায় নিজের ইচ্ছেমতো চলতে পারে, তাকে সহজে গ্রহণ করা কঠিন। রতনের ইচ্ছে, বাপ এই বয়সে কঁকাবে, বিছানায় তড়পাবে, ছেলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে, তা না হয়ে হয়েছে একদম উল্টো। রতনের জ্বালা ঐ এক জায়গায়। বুড়ো ঠা-ঠা হাসলে রতনের বুক জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যায়।

ছমির আলি রতনকে সংসার থেকে আলাদা করে দিয়েছে। ওর বউ তারাবানু দজ্জাল মেয়েলোক। যদিও রতন নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছিল, কিন্তু এখন হাড়ে-হাড়ে টের পায়। রতনের আয়-রোজগার তেমন নেই। ছেলেপুলের সংখ্যা বেশি। ঠিক মতো সংসার চালাতে পারে না বলে মেজাজ খারাপ থাকে। বউ'র সঙ্গে রাত-দিন ঝগড়া হয়। কখনো ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে, বুড়ো মরেও না, মরলে বেঁচে যেতাম! ছমির আলি শুনে হাসে। বেশি হাসি পায় তারাবানুর কথায়। তারাবানু ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, বুড়োটা শুয়োরের মতো খায়, তখনো ওর কষ্ট হয় না। নিজের খেয়েও ছেলের বউয়ের খোটা শুনতে হয় বলে বেদনা হওয়া উচিত, কিন্তু হয় না। ও উপেক্ষা করে। কিন্তু উপেক্ষা করতে পারে না রতন। তারাবানুর মুখে গালাগাল শুনলে ও তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। শুরু হয় প্রচণ্ড ঝগড়া এবং পরিশেষে মারধোর। তারাবানু হটে যাওয়ার পাত্রী নয়। রতনের সঙ্গে শারীরিক শক্তিতে না পারলেও একদম ছেড়ে দেয় না। প্রায়ই দুচার ঘা দেয় স্বামীকে। ছেলেমেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে, হাসে। দাদার কাছে ছুটে এসে অঙ্গভঙ্গি সহকারে ঝগড়ার বিবরণ দেয়। ওদের সঙ্গে ছমির আলি সহজ হৃদ্যতা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল মাথা থেকে ওকে তাড়াতে চায়। ক্লান্ত লাগছে, ঘুম পাচ্ছে। এখনো অনেকটা পথ, পৌঁছুতে বিকেল হয়ে যাবে। গাড়োয়ান বেসুরো গলায় গান গাইছে। মাঝে মাঝে গরুর লেজ ধরে বিকট চিৎকার করে তাড়া দিচ্ছে, গরুগুলো আচমকা ছুটতে শুরু করে এবং প্রবল ঝাঁকুনিতে দুলে ওঠে গাড়ি। আজমল রেগে যায়, এই শালা, কুত্তার বাচ্চা, ঠিক মতো গাড়ি চালা। গাড়োয়ান দাঁত বের করে হাসে, এই একটু মজা করি। আজমল দাঁত কিড়মিড় করে; কিন্তু মুখে কিছু বলে না। সঙ্গে অনেকগুলো টাকা, যদি কোনো অঘটন ঘটে! সামনে রাস্তার দুপাশে হাট, লোকের ভিড় চারদিকে। গাড়ি আস্তে চালাতে হয়। হাটে নেমে আজমল আজিজের জন্য দু সের রসগোল্লা কেনে। রসগোল্লা ওরা দুজনেই খুব পছন্দ করে। গাড়োয়ান সের পাঁচেক বেগুন কিনে গাড়িতে ওঠায়। আজমল চোখ বড় করে, এত?

লোকটা আবারো দাঁত বের করে হাসে। হাসিটা ওর অভ্যেস। আজমল এখন আর বিরক্ত হয় না। ও বুঝে গেছে লোকটাকে। হাট এখনো তেমন জমেনি। চারদিক থেকে মাথায় মাল নিয়ে লোকজন আসছে। আনাজ, হাঁস-মুরগি, মাছ, মুড়ি-বাতাসা-খৈ, ছাগল-গরু ইত্যাদি হাজার রকমের জিনিস। ইচ্ছে হয়, মনের সুখে কেনাকাটা করতে। ভোলাহাটে এমন বড়সড় হাট বসে না। একজন বুড়ো এসে ওর সঙ্গে হাত মেলায়, আপনি ভোলাহাটের আজমল না?

আজমল মাথা নেড়ে সায় দেয়, কিন্তু লোকটাকে চিনতে পারছে না বলে বিব্রত বোধ করে। লোকটা বুঝে ফেলে তা। নিজেই পরিচয় দিয়ে বলে, আমি ছমির আলির প্রতিবেশী। ওনার বাড়িতে আপনাকে দেখেছি।

ও! তা আপনাদের খবর ভালো তো? আমি দিন তিনেক পর যাব ছমির মামার ওখানে। গিয়ে বলবেন।

ভালোই তো, খুব ভালো।

লোকটা গদগদ স্বরে কথা বলে। আবার আরেকজনের দাঁত বের করা হাসি। ওর গা ঘুলিয়ে ওঠে। গাড়োয়ান এক কোণায় দাঁড়িয়ে জিলাপি খাচ্ছে। ওদিকে একবার তাকিয়ে ও দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়।

ছমির মামা কেমন আছে?

আছে ভালোই। তবে রতনটা বড্ড গণ্ডগোল করে।

ও একটা পাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজে কিছু করতে পারে না, কেবল বাপের সম্পত্তিতে নজর।

আজমল উদার হাসে। এমন সরল উক্তিতে ওর রাগ হয় না। কেউ কেউ মানুষকে এমনভাবেই দেখে। হয়তো রতনের নিজের কিছু যুক্তি আছে, কিন্তু সেটা কারো কাছে পৌঁছায় না।

চলেন।

গাড়োয়ান গামছা দিয়ে মুখ মুছে সামনে এসে দাঁড়ায়।

চলো।

ও লোকটির কাছ থেকে বিদায় নেয়। দুহাতে মিষ্টির হাঁড়িটা ধরে গাড়িতে ওঠে। তখন ওর মনে হয়, ওর খিদে পেয়েছে। মুখ থুতুতে ভরে আছে, জিহ্বা বিস্বাদ। ওর কিছু ভালো লাগে না। ও খুব যত্নে মিষ্টির হাঁড়ি ধরে আছে। কিছুক্ষণ পর কোলের ওপর রেখে পা মেলে বসে। মিষ্টির অর্ধেক রমেন মিত্রকে দেবে আজিজ। ও রমেন মিত্রের অনুসারী। এজন্য ওর মামা আজিজের ওপর বিরক্ত। কিন্তু এতে ওর কিছু এসে যায় না। ওর ধাতই আলাদা। ওর মতে, রমেন মিত্রের মতো মানুষ হয় না। ও ভেবে দেখলো, কেউ কাউকে এমন করেই ভালোবাসে। কারো প্রতি ওর এখনো তেমন আকর্ষণ নেই। ও দূরে দাঁড়িয়ে লোক দেখতে পছন্দ করে। ভাবতে ভাবতে ওর রতনের কথা মনে হয়। ও জানে, বাপকে নিয়ে ঝগড়া বাঁধলে রতনের মাথা ঠিক থাকে না। সব রাগ গিয়ে পড়ে বাপের ওপর। তারাবানু সহজে কাবু হবার মেয়ে নয়, কান্নাকাটির মধ্যে নেই। মা'র খেলে দ্বিগুণ বেগে ফুঁসে ওঠে। শাপ-শাপান্ত করে মাতিয়ে রাখে আধাবেলা। রতন মারধোর করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কখনো বাপের সামনে এসে তীব্র চোখে তাকিয়ে থাকে। ছমির আলি মৃদু হাসে, কিছু বলবি?

বুড়ো শকুন।

রতন দাঁত কিড়মিড় করে উচ্চারণ করে।

আমি মরলে তোর শান্তি, না?

জানোই তো।

কবে যে তোর কপালে তা জুটবে।

বিষ খাও।

ছমির আলি হা-হা করে হাসতে থাকে। রতনের দু চোখে তীব্র ঘৃণা উপচে ওঠে। ও দেখতে পায়, বাপের শাদা চুল, শাদা দাড়ি সম্বলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেহারায় অলৌকিক দ্যুতি ভেসে ওঠে। ঠাণ্ডা গলায় ছেলেকে বলে, শকুনের দোয়ায় কি গরু মরে রে? বিষ খেলে বিষ যে আমার হজম হয়ে যাবে।

তুমি একটা মানুষ না।

রতন দুপদাপ পা ফেলে চলে যায়। ছেলের প্রতি ছমির আলির টান যে নেই, তা নয়; কিন্তু ওর এই তিরিক্ষ স্বভাব ওকে ছমির আলির কাছ থেকে দূরে নিয়ে গেছে। তাছাড়া বুড়ো উপলব্ধি করে, ছেলেমেয়ে সুখ-দুঃখে বড় একটা কাজে লাগে না। বয়স হলে যে যার মতো হয়ে যায়। তাই কারো ওপর তেমন নির্ভর না করে নিজের মতো গুছিয়ে চলাই ভালো।

আজমল ভেবে দেখল, হয়তো একথাই ঠিক। কে জানে? ওর বাবাও হয়তো এমনই ভাবে। তবে ও নিজে রতনের মতো এত রাগী নয়। ও যখনই ছমির আলির বাড়িতে যায় বাপ-ছেলের ঠাণ্ডা লড়াই দেখে। কখনো রতন ওর ওপর রাগ করে ছমির আলি ওকে খাতির করে দেখে। আসলে বাবার সবকিছুতেই ওর ঈর্ষা।

ছমির আলির ধানের জমি, বাগান-পুকুর যা আছে, তাতে স্বচ্ছন্দে চলে যায়। ওর কাকেই বা তোয়াক্কা! সে যতই হোক আর তারাবানু হোক! তবু তো ছেলেকে ভিটেতে জায়গা দিয়েছে, এটুকু না দিলেও পারতো। রতনের কিছু বলার থাকতো না। কিন্তু ছমির আলি অতটা নির্মম হতে চায়নি। বরং এটুকু দয়া করলে ছেলেটা তার হাতের মুঠোয় থাকবে। তারাবানু যত গলাবাজি করুক, জানে, শ্বশুর ছাড়া গতি নেই। অতএব ছমির আলির এখানেই জিত।

ছমির আলির এসব কথা শুনলে আজমল অবাক হয়। মানুষের কত যে বিচিত্র নেশা। প্রতিশোধের স্পৃহাও এক ধরনের নেশা। ও মাঝে-মধ্যে হঠাৎ করে এসব কথা জিজ্ঞেস করতে চায়, কিন্তু হয় না। আরেকজনের গোপন জায়গায় হাত দেবার অধিকার কি তার আছে? বড় বিচিত্র এই বাড়ির সবকিছু। ও নিজেও এক অদ্ভুত পারিবারিক বন্ধনে বাস করে। তাহলে প্রতি ঘরই কি দুর্গ? যেখানে এক লুকনো অন্ধকার কুঠুরি আছে? আজমলের তন্দ্রা মতো হলে তা ছুটে যায় গাড়োয়ানের গানে। ও রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়েছে। পাশ থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করে, কে যায়? আজমল ছইয়ের ভেতর থেকে মুখ বের করে, কে?

ও আজমল তুমি? কোথায় যাচ্ছো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামচন্দ্রপুর হাট। কেমন আছেন চাচা?

ভালো। তোমার আব্বা ভালো?

জী।

লোকটি ইয়াসিন বসনির পরিচিত।

কাল তো রামচন্দ্রপুর হাটের জমিদার রমেন মিত্র কলকাতা থেকে বউ নিয়ে ফিরবে।

তাই নাকি! রমেনদা বিয়ে করেছে?

হ্যাঁ, কলকাতার মেয়ে।

মজাই হবে তাহলে।

আজমল উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কথা শেষে বুড়ো আমবাগানের ভেতর দিয়ে ডানের রাস্তায় নেমে যায়। রমেনদার বৌ? আজিজ তাহলে বিয়ে নিয়ে ফুর্তিতেই আছে? ওর ভালো লাগতে শুরু করে। ওখানে উৎসবের মধ্যে ওর সময় ভালোই কাটবে।

গাড়োয়ান গাড়ি ছেড়ে দেয়। ওর মনে পড়ে, বছর দুই আগে ও আর আজিজ ছমির আলির ষাটতম বিয়ে বার্ষিকী উৎসবে গিয়েছিল। বুড়োর সে কী ধুমধাম! খাসি জবাই করে খিচুড়ি রাঁধে। নিজে কাছে দাঁড়িয়ে সে রান্নার তদারকি করে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে দাওয়াত করে এক মহা-উৎসবের আয়োজন করে। বুড়ি প্যারালাইসিসের রোগী। বছর পাঁচেক ধরে বিছানা থেকে উঠতে পারে না। তাতে ছমির আলির সুখ-দুঃখ নেই। বুড়ির জন্য নতুন কাপড় কিনে এনে নিজের হাতে পরিয়ে দেয়। এমনকি খিচুড়িও নিজের হাতে খাওয়ায়। লোকের বুক জ্বলে এসব দেখে। কেউ ঠোঁট উল্টে বলে, আদিখ্যেতা। কেউ বলে, বুড়ো বয়সের ভীমরতি। তবে সবই আড়ালে। বাড়ির বাইরের আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে এসব শুনেছে আজমল আর আজিজ। সমবয়সী বুড়োরা যাবার সময় রতনকে রাস্তা পর্যন্ত ডেকে নিয়ে গেছে। বাঁকা করে বলেছে, তোর বাপের রস কমলো না। রতনও ওদের মতো করেই বলে, এক পা কবরে গেছে, তাও কত ঢঙ। লজ্জায় মরে যাই।

আর বলিস কেন? এবার ক্ষান্ত দিতে বল।

আমার কথা শুনলে তো! আমি তো ওর বড় শত্রু।

আরো একগাদা কথা বলে রতন জ্বালা জুড়োয়। ওদের খাওয়া এখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি। সব মেহমান চলে গেলে হবে। তারাবানু বেড়ার ও-পাশে বসে গজ্‌গজ্‌ করে। একবার রতনের সামনে ফোঁস করে উঠেছিল, ইচ্ছে করে বুড়োর মাথা ফাটিয়ে ফেলি। রতন উত্তর দেয়নি। ওর ভীষণ খিদে পায়। রান্নার গন্ধে তারাবানুর জিভ দিয়ে জল গড়ায়। কতদিন এমন ভালো খাবার খাওয়া হয়নি! এমন করে কষ্ট দেয়ার কি কোনো মানে হয়? আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?

অনেক রাতে ডাক পড়ে ওদের। রতন গম্ভীর, তারাবানু মুখ ফুলিয়ে রাখে। জানে, ওরা এখন কিছু বলবে না। আগে গপ্‌গপিয়ে খাবে। এই জিতটুকুতে বুড়োর ভারি আনন্দ।

বৌমা, তোমাকে আরেকটু মাংস দেব?

তারাবানু লম্বা করে ঘাড় কাত করে। ছমির আলি তারাবানুর পাতে এক হাতা মাংস তুলে দেয়। রতনকে দেয় জিজ্ঞেস না করেই। রতন পেট ভরে খায়, খাবার গলা পর্যন্ত উঠে যায়। বড় একটা ঢেকুর তুলে বলে, মা কি ঘুমিয়েছে?

হ্যাঁ।

তোমার এত ধুমধাম করার দরকার ছিল কি?

তাতে তোর কি?

আমার আর কি? সবাই হাসাহাসি করছিল।

কাউকে তো কম খেতে দেখিনি।

খামোখা কতগুলো টাকা খরচ করলে।

এই টাকা খরচ না করলেও তোর কাজে লাগতো না রতন। আর আমি জানি, লোক খুশিই হয়েছে। মাগ্‌না একটা দাওয়াত খেতে পেল তো?

ছমির আলির ঠাণ্ডা কণ্ঠ রতনের বুকে গেঁথে থাকে। ওর নীরস মুখে জেগে থাকে অসহিষ্ণুতার ছাপ। তারাবানু উঠে যাবার সময় বাসনটা হাতে করে ধরে নিয়ে যেতে ভোলে না। অনেকগুলো মাংসের টুকরো রয়ে গেছে। ভোরে ছেলেমেয়েগুলোকে দেবে। ছমির আলি ওদেরকে আগেই খেতে দিয়েছিল, ওরা ঘুমিয়ে গেছে।

কাজের লোকগুলো এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে। ভোজনরসিক ছমির আলি এখনো প্লেট ছেড়ে ওঠেনি। ওর ছিপছিপে দীর্ঘ শরীরে মেদ নেই। পেট পুরে খেলেও ঢেকুর ওঠে না, হজমে গণ্ডগোল নেই। ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারদিকে বড় স্বস্তি।

খেয়ে-দেয়ে ছমির আলি বারান্দায় বসে আছে। আজমল এসে পাশে বসে। আজিজ ঘুমিয়েছে।

মামা শোবেন না?

ছমির আলি মৃদু হাসে।

তোমাকে আজ একটা গল্প বলব।

আজমল উৎসুক হয়ে বুড়োর মুখের দিকে তাকায়। অন্ধকারে কিছু স্পষ্ট হয় না। ছমির আলির অভিব্যক্তি ওর আড়ালেই থেকে যায়।

গল্প শোনার সময় কোনো প্রশ্ন করবে না আমাকে।

আচ্ছা।

আজমল সুবোধ বালকের মতো সোজা হয়ে বসে। রান্নাঘরে কাজের লোক তিনজন খাচ্ছে। ঘরে স্ত্রী ঘুমিয়ে। পাশের ঘরে রতনের সংসার। কাঠের দেয়াল দিয়ে ওদের আলাদা করা হয়েছে। খুব মৃদুস্বরে কথা বলে যায় ছমির আলি, যেন ওটা হাওয়ায় ভেসে অন্য কোথাও না যায়, যেন ওর বুকের বদ্ধ কুঠুরিতেই গুমরে মরে।

এত আয়োজন-উৎসবের মধ্যেও এক মুহূর্তের জন্য ও তো ভুলতে পারেনি, আজ শান্তির জন্মদিন। মা'র মৃত্যু, শান্তির জন্মদিন এবং ফিরোজার সঙ্গে ওর বিয়ে—সবই তো একই সুতোয় বাঁধা। ওর মনে হয়, এত কিছুর একত্র বন্ধন না হলে ও ওই আজকের ছমির আলি হতে পারতো না। ফিরোজার সঙ্গে বিবাহিত জীবনে কোনো বিরোধ ছিল না। ফিরোজা সরল, বোকা, নির্বিরোধ মানুষ। কোনোদিন ছমির আলির মন খারাপ থাকলেও জানতে চায়নি যে কি হয়েছে। হাসি দিয়ে সবকিছু উড়িয়ে দেয়া যার স্বভাব, এমন মানুষকে বোঝা মুশকিল। কখন তার সুখ, কখন তার দুঃখ, কে ধরবে? তাই আমি সবার বোঝার আড়ালেই থেকে গেলাম। সবাই হিংসে করলে আমি নিজেকে আড়াল করে রাখার সুখটুকু উপভোগ করি বেশি করে।

আমি জানি না, শান্তি এখনো বেঁচে আছে কি না? এখন থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগে ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। নদীর ঠিক ওপরে ওদের বাড়ি ছিল। ওদের বাড়ি থেকে নদীর ঢালুতে নেমে যাওয়ার চমৎকার রাস্তা ছিল। পেছনে ছিল গাছগাছালির বাগান। শান্তির বাবা ছিল কবিরাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বয়স তখন চৌদ্দ। মাস দুয়েক আগে মা মারা গেছে। মা মারা যাবার পর বাবা পাগলের মতো হয়ে যায়। সংসারে মতি ছিল না। প্রায়ই উধাও হয়ে যেতো বাড়ি থেকে। কোথায় যেতো, কেউ বলতে পারে না। নিজেও কাউকে কিছু বলতো না। কান্নায় বুক ভেঙে যায়। বুঝলাম, শুধু মা নয়, বাবাকেও হারিয়েছি আমি। একদিন বড় মামা এলো দেখতে। অবস্থা দেখে ক্ষেপে গেল। বললো, আপনি এমন করলে ছমিরের কি হবে?

কি আর—

বাবা কথা শেষ করে না। জানে, জবাব দেবার তার কিছু নেই।

ওর দিকে তো নজর রাখতে হবে। ও ছেলে মানুষ—

আমি কিছু পারব না। আপনি নিয়ে যান।

সেই ভালো।

দুদিন বাদে বড় মামা আমাকে নিয়ে চলে আসে। সেই গ্রামেই শান্তিদের গ্রাম। আমি ওখানে বছর পাঁচেক ছিলাম এবং জীবনের প্রথম ফসল নিয়েছিলাম।

বড় মামা আমাকে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিল। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ছিল শান্তিদের বাড়ি। সবকিছু হারিয়ে প্রচণ্ড শূন্যতা ছিল আমার মনে। বাবা থেকেও যখন নেই হয়ে গেল, সে শূন্যতা আরো তীব্র হয়ে উঠল। উপরন্তু নতুন পরিবেশে মন আরো খাঁ-খাঁ করে। আমার কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। একা একা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতাম। গাছগাছালি ভরা শান্তিদের বাড়িটা ছিল আমার কৌতূহল। চুপিচুপি বাগানে ঢুকে যেতাম। করমচা গাছের কাছে দাঁড়ালে মার স্মৃতি মনে পড়ত। কত খুঁটিনাটি অসংখ্য স্মৃতি। মনে পড়লেই বুক খাঁ-খাঁ করে ওঠে, চোখে জল আসে। কতদিন বুক ঠেলে উঠে আসা কান্না চাপতে চাপতে বেরিয়ে এসেছি বাগান থেকে। একটা তুলসী গাছ আমার খুব প্রিয় হয়ে যায়। আমার মায়ের অমন একটা গাছ ছিল। কাশি হলে রস করে খাওয়াত আমাকে। আর আমাদের ঘরের পুব দিকের বিশাল নিম গাছটা? এখানেও তেমন একটা গাছ আছে। এই বাগানের সঙ্গে মায়ের স্মৃতি জড়িয়ে গিয়ে এক অন্ধ আবেগে আমি এখানে চলে আসতাম।

একদিন শুকয়ে যাওয়া কাঠমল্লিকা গাছের নিচে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি। সেদিন শান্তির সঙ্গে প্রথম দেখা। শান্তি আমার চাইতে দু ক্লাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপরে পড়ত। আমার মুখোমুখি উবু হয়ে বসে গভীর চোখে তাকিয়ে ছিল।

কাঁদছো কেন?

মার জন্য।

মা কোথায়?

মরে গেছে।

ও। শান্তি কিছুক্ষণ চুপ থেকে ব্যাকুল হয়ে আমার হাত ধরে, কেঁদো না।

ঐ শব্দ নিমপাতা ছুঁয়ে আসা বাতাসেরম তো শীতল করে দেয় আমাকে। আমি আজো অনুভব করি সে স্পর্শ, এখনো শুনতে পাই সে কণ্ঠ। সে দিনগুলোতে শান্তি না থাকলে আজ আমার জীবন হয়তো অন্যরকম হতো।

তবে শান্তিদের বাড়িতে ঢোকার কোনো অনুমতি ছিল না আমার। মুসলমান বলে ওর মা প্রচণ্ড অবজ্ঞা করত। কিন্তু তাতে কোনো দুঃখ ছিল না আমার। বাগান এবং শান্তিই ছিল আমার সব। আমি এখন বুঝি, জীবনের কলরোল তোলপাড় করে না উঠলে অর্থহীন হয়ে যায় সময়। আমার জীবনে এমন তোলপাড় করা সময় অনেকবার এসেছে। সেই সময়গুলো জমা হয়েছে একে একে। এই সঞ্চয় জীবনভর আমাকে শক্তি যুগিয়েছে। এতেই আমার বেঁচে থাকা পরিপূর্ণ হয়েছে। সেজন্য এত বছর পরও শান্তি ম্লান হয়নি। কেউ বুঝতে পারে না যে, ওর জন্মদিনের উৎসব পালিত হয়। লোকে আমাকে ঈর্ষা করে। এই বাড়তি আনন্দের ভাগ আমি কখনো কাউকে দেইনি।

ছমির আলির গল্পের বাধা পড়ে কাশেমের ডাকে, ঘুমাবেন না চাচা?

পরে। তুই যা। দেখলে আজমল, এরাই এখন আমার আপনজন। নিজের ছেলে পর হয়ে গেছে।

আজমল মাথা নাড়ে, কিন্তু কথা বলে না। ওর মনে হয়, রতনের সঙ্গে ওর বাবার সম্পর্ক জটিল। এ নিয়ে ও কথা বলতে চায় না। এই জটিলতা ওর নিজের জীবনেও আছে।

জানো, আমি চোখের সামনে দেখেছি, কেমন করে বখে গেছে বাবা। কী নিদারুণ ছিল সেই দিনগুলো! এ গল্প আরেকদিন করব। ম্যাট্রিক পাসের পর বাবা আমাকে নিয়ে এলো বাড়িতে। বলল, সংসার গুছিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাও। আমি থেকেও নেই। আমাকে তুমি পাবে না। একটি মানুষ চোখের সামনে আছে, কিন্তু কার্যত নেই। ছন্নছাড়া, বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়ায়, বাজে আখড়ায় যায়, গাঁজার নেশায় নিজেকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলে, আমি এসব কিছু দেখেও দেখি না। এই তোলপাড় করা সময় আমি অবলীলায় পার হয়েছি।

শান্তিদের গ্রাম ছাড়ার তিন দিন আগে ওর বিয়ে হয়ে যায়। অল্পক্ষণের জন্য দেখা হয়েছিল শান্তির সঙ্গে। ও প্রথম কথাটাই বলেছিল, আমাকে ভুলে যাবে?

না।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলাম।

কেমন করে মনে রাখবে?

আমি পারব।

কিভাবে?

ভুলব না কোনোদিন।

তা কি হয়? মানুষ একদিন সবকিছু ভুলে যায়।

শান্তি, এই শাদা করবী, তোমার প্রিয় ফুল ছুঁয়ে বললাম, আমি তোমাকে আমৃত্যু মনে রাখব।

খুব বিষণ্ন ছিল শান্তি। আমার কথায় খুশি হলো কি না, বোঝা যায়নি। শান্তিকে কখনো বুঝতে পারিনি আমি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ভেবেছিলাম, শান্তিকে বোঝার মতো যথেষ্ট বড় হয়েছি। কিন্তু না, ঐ পর্যন্তই। আমি তো জানতাম, পুরো ব্যাপারটাই ছিল একতরফা। আমি ওর কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা করিনি। ও যে আমাকে সঙ্গ দিয়ে আমার ক্ষত মুছিয়ে দিয়েছিল, তাতেই আমি আনন্দিত ছিলাম। ভালোবাসার কথা আমিও কোনোদিন শান্তিকে বলিনি। আজমল তুমি বুঝবে না এ কি, কাউকে এসব বোঝানোও যায় না।

আজমল কথা বলে। ছমির আলির মগ্নতা ভাঙে না। বুড়ো এখন নিজের মধ্যে পিষ্ট হচ্ছে। এক সময় সে খুব মৃদু কণ্ঠে, যেন অনেকদূর থেকে বলছে, রহস্যময় করে তোলে পরিবেশ। গোয়াল থেকে বিশ্রী গন্ধ আসছে, লেদা-চনা একাকার। আমগাছের নিচে কাজের লোকগুলো গুলতানি করছে। ঘরে ভ্যাপসা গরম। বাইরে বাতাসে বসে থাকে ওরা। সারা দিন কাজ করেছে, তবু তেমন ক্লান্তি নেই। দুটো কুকুর এলোমেলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে থাকা হাড় নিয়ে মারামারি করে। রতনের ঘর অন্ধকার। বোধহয় ঘুমিয়ে গেছে।

আজমল ভেবে দেখল, এটাই উপযুক্ত সময় ছমির আলির শান্তির সঙ্গে মুখোমুখি হবার। প্রতিটি মানুষকে যদি জানা যেত এভাবে, বোঝা যেত ওদের বুকের গভীরে কি আছে? ও নিজেই মাথা নাড়ে, তা কোনোদিনই হবার নয়। তখন ছমির আলি বিড়বিড়িয়ে বলে, এভাবেই আমি শান্তির ঋণ শোধ করে যাই। আজমল আচমকা প্রশ্ন করে, শুধু ঋণ, ভালোবাসা নেই? বুড়ো অকৃত্রিম হাসি হাসে, আছে। এই আনন্দ নিয়ে আজ রাতে আমি ঘুমুতে যাচ্ছি।

কিন্তু ঘুমুতে পারে না আজমল। ও ভোর রাত পর্যন্ত বিছানায় ছটফট করে কাটিয়ে দেয়। ও এখন পর্যন্ত কাউকে ভালোবাসেনি। ছমির আলির এই গভীরতার পরিমাপও করতে পারে না। ওর শ্বাসকষ্ট হয়। ও বাইরে এসে দাঁড়ায়। মানকচু গাছগুলো যেখানে বিশাল হয়ে উঠেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে পেসাব করে। ওর ভীষণ পিপাসা পায়, কিন্তু রান্নাঘর হাতড়ে পানি খেতে পারে না বলে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। সে রাতে ও বারান্দার খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। ছমির আলিকে হিংসে করে ওর বুক পুড়ে যায়।

বুক কি এখনো পোড়ে? আজমল নিজেকে প্রশ্ন করে। গরুর গাড়ির দুলুনি অসহনীয় হয়ে উঠেছে। প্রশ্নটা ঠোক্কর খেয়ে ঘোরে। ও উত্তর হাতড়ায়। কখনো তো অবশ্যই পোড়ে। মানুষের সুখ দেখে ঈর্ষা না হয় কার? ও নিজের পক্ষ অবলম্বন করে। যদিও অবলম্বন করতে লজ্জা হচ্ছিল। ছমির আলির মতো হতে না পারলে ঈর্ষা করে লাভ কি? নিজেকে বোঝাতে চায়, পারে না। এখন কিছু দুঃখ দেখতে চায় ও। এই একটি জায়গায় রতনের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব।

গ্রামের ভেতর ঢুকে গেছে গাড়ি। ও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। নড়েচড়ে বসে, ইচ্ছে হয়, গোটা দুই রসগোল্লা খায়, কিন্তু না থাক, হাত গুটিয়ে নেয়। ডানে সবুরনদের বাড়ি, সামনে বড় লিচু গাছ। বারান্দায় কেউ নেই। পেছনের কলাবাগানে তমেজ মিয়া হুঁকো হাতে দাঁড়িয়ে আছে। গরু গাড়ি দেখে ভুরু কুঁচকে তাকায়। আজমলের সাড়া দেয়ার ইচ্ছে নেই। নামলে অনেক সময় নষ্ট হবে। সবুরনের মল্লিকপুরে বিয়ে হয়েছে, ছমির আলির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি থেকে দুই ক্রোশ রাস্তা। সবুরনের সঙ্গে ছোটবেলায় অনেক আম কুড়িয়েছে। ওর বাবা খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছে। কালকে একবার এসে দেখা করে যাবে। ছমির আলির কথা ভাবতে ভাবতে এতটা পথ আসায় শরীরে ক্লান্তি নেই। ডানে কলিমদের বাঁশঝাড়, অনেকটা জায়গাজুড়ে ঝাড়। গাড়ির নিচে শুকনো পাতা মচ্‌মচ্‌ করে। বাঁশঝাড় হলুদ হয়ে আছে, সবুজের ভাগ কম। ওর গা ছম্‌ছম্‌ করে। গাড়োয়ান হৈ-হৈ করে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পথটা বেশ সমতল বলে গরুগুলো দৌড়ুচ্ছে, ভালোই লাগছে ওর। ও গাড়োয়ানের কাছে এসে বসে, এখন আর ছইয়ের ভেতর থাকতে ভালো লাগে না। বাঁশঝাড় পেরুলে বেশ খানিকটা জায়গায় বাড়িঘর নেই। দুপাশে বিস্তীর্ণ ক্ষেত। এদিকে ফণীমনসার ঝোপ বেশি। বিকেলের হলুদ আলোয় ন্যাড়া ক্ষেতগুলো ধূসর। চষা ক্ষেত দেখলেই ওর চোয়ালভাঙা চেহারার কথা মনে হয়। অনেকটা আশিক আলির মতো। সঙ্গে সঙ্গে একজনের সঙ্গে মেলাতে পেরে ওর নিজের ওপর বিশ্বাস বেড়ে যায়। ও ভেবে নেয়, এটুকু পথ হেঁটে যাবে। এখন আর গাড়ির থাকার কোনো মানে হয় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

পথের এই মোড়টাকে ছোটবেলায় ওরা বলতো ফণীচোরা বন। ফণীমনসা অনেকটা জায়গাজুড়ে বেড় দিয়ে রেখেছে। মাঝখানটা ফাঁকা। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে এর ভেতরে ঢুকতো। একবার সবুরন লাফ দিয়ে পার হতে গিয়ে ঝোপের ওপর পড়ে যায়। কাঁটায় ছড়ে যায় ওর হাত-পা। সে কী রক্ত! ওরা ভয়ে থরথর কাঁপে, কি করবে বুঝতে পারে না। সবুরনের সে কি কান্না! সবাই ওকে ঘিরে বসে থাকে। শেষে তমেজ মিয়া এই পথে যাবার সময় মেয়েকে দেখে উঠিয়ে নিয়ে যায়। সেদিন লোকটা ওদেরকে কিছু বলেনি, মেয়েকেও না। কৃতজ্ঞতায় ভরে ছিল ওদের মন। আজ কত বছর পর গাড়োয়ানের ভাড়া চুকিয়ে দেবার পর ওর বুক খাঁ-খাঁ করে। ও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে গাড়ির চলে যাওয়া দেখে। বাঁশঝাড়ের ওপাশ থেকে কেউ একজন আসছে। পরিচিত কেউ হতে পারে ভেবে ও দাঁড়িয়ে থাকে। এক হাতে মিষ্টির হাঁড়ি, অন্য হাতে গামছায় বাঁধা একটি লুঙ্গি, একটা গেঞ্জি। গায়ের জামাটা ময়লা হয়েছে দেখে ওর একটু লজ্জাও করে। বেশ খানিকটা দূর থেকেই ও বুঝতে পারে, লোকটা আজিজ। পরনে সবুজ লুঙ্গি, গায়ে ঘিয়ে রঙের ফতুয়া। লুঙ্গি হাঁটুর ওপরে ওঠানো। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে, ওকে নতুন লাগছে। আজমলকে দেখে বাঁশঝাড়ের কাছ থেকেই চিৎকার করে ওঠে, হুই আজমল। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় একঝাঁক কাক। ফণীমনসার ঝোপ থেকে একটা বেজি বেরিয়ে দৌড় দেয় রাস্তার মাঝখান দিয়ে। আজিজ দৌড়ে এসে আজমলের হাত ধরে, কত দিন পর এলি?

শিবগঞ্জ থেকে এলাম।

সুতা বেচেছিস?

হ্যাঁ, ভালো দাম পেয়েছি। তোর জন্য রসগোল্লা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল ওর দিকে মিষ্টির হাঁড়ি বাড়িয়ে দেয়। আজিজ দুহাতে আঁকড়ে ধরে।

এইমাত্র আমি জমিদার বাড়ি থেকে এলাম। রমেনদার মা এক মণ মিষ্টির অর্ডার দিয়েছে, শিবগঞ্জের চমচম। এক একটার যা সাইজ না! একটার বেশি খেতে হবে না কারো। কাল রমেনদা বৌ নিয়ে আসছে। তুই এসে ভালোই করেছিস। জমিদার বাড়িতে সাজ-সাজ রব। গেলে আর আসতে ইচ্ছে করে না।

আজমল নীরবে হাঁটে। ওর ময়লা জামার জন্য লজ্জা হয়, এই পরে কি জমিদার বাড়ির উৎসবে যাওয়া যায়? কিরে কি ভাবছিস?

ভাবছি, জামা-কাপড় তেমন আনিনি—

আরে দুর, এই নিয়ে ভাবনা কি? আমার জামা নেই বুঝি? আর রমেনদাকে তুই তো কাছ থেকে তেমন দেখিসনি। তিনি মানুষকে মানুষের মর্যাদায় দেখেন, জামা-কাপড় দিয়ে নয়।

ছিঃ ছিঃ আমি এসব কিছু ভেবে বলিনি।

থাক, এত লজ্জা পেতে হবে না। জানিস, রমেনদার বৌর নাম ইলা সেন, বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন, যশোরের ঝিনাইদহের মেয়ে। মাসীমা তো কেবলই বৌর গল্প করেন। আর করবেনই বা না কেন? বৌদি বিএ পাস। বেথুন কলেজে পড়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। খেলাধুলোয় নাকি দারুণ! সাঁতার খুব ভালো পারে। তা ছাড়া বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন খেলে। অনেকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কাচের আলমারি ভরা সব পুরস্কার।

আজমল খুব মনোযোগ দিয়ে আজিজের কথা শোনে। এমন মেয়ে ওর অভিজ্ঞতার বাইরে। ও ভাবতেই পারে না যে, মেয়েরা এতকিছু পারে। ও যাদের দেখে, তারা এতই সাধারণ যে, ওদের নিয়ে বিশাল কোনো কল্পনা করা যায় না। ফলে ইলা সেন ওর ধারণার বাইরে রয়ে যায়।

করিমদের বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যায় ওরা। দড়িতে এখনো কাপড় ঝুলছে, ছেঁড়া শাড়ি, হয়তো করিমের মার, লুঙ্গি, গামছা, গেঞ্জি কার, ও তা বুঝতে পারে না, করিমের তো বাবা নেই। করিম চাঁপাইনবাবগঞ্জ থাকে। ও কি বাড়ি এসেছে? আজিজকে জিজ্ঞেস করলে ও জানালো, আসেনি। ওদের শাদা গাই ভুষির গামলায় মুখ ডুবিয়ে খাচ্ছে, লেজ দিয়ে পিঠে বাড়ি মারছে। করিম বাড়ি এলে সারাক্ষণই গরুটার যত্ন করে। ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ওর মামার ধানের কলে কাজ করে। আসার সময় বস্তা ভরে ভুষি আনে। গরুটার তখন সারা দিন উৎসব। মানুষের মতো গরুও উৎসবের স্বাদ পায়, ভাবতেই আজমল হেসে ফেলে। তাহলে কখনো মানুষ এবং গরুর পার্থক্য মুছে যায়? আজিজকে একথা বলতেই ও হা-হা করে হেসে ওঠে। কেবল হয়ে ওঠা সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে থাকা পাখি উড়ে যায়।

তোর আবিষ্কারটা নেহাৎই ফেলে দেবার মতো নয়।

করিম কবে আসবে রে?

এই তো গত শুক্রবারে গেল।

অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখা হয় না।

আজিজদের পুকুরের পাড় দিয়ে ওরা যখন বাড়িতে ঢোকে, তখন উঠোনের চুলোয় আজিজের মার রান্না শেষ হয়েছে। ইলিশের গন্ধ আসছে। গনগনে চুলোয় হাঁড়ি নেই। কাঠোর আগুন কয়লা হয়নি, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই লালচে আভায় অপূর্ব দেখাচ্ছে আজিকের মাকে। লুছনি দিয়ে হাঁড়ি পরিষ্কার করতে করতে থেমে যায় হাত। ওকে দেখে প্রথমে অবাক হয়, তারপর খুশি হয়ে ওঠে। ও বাবা তুমি? আজমল পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে।

মামী কেমন আছেন?

আমাদের আর থাকা কি? তোমার আব্বা ভালো আছেন?

জী, ভালো।

যাও বাবা, গিয়ে বসো। ও আজিজ, ওকে হাত-মুখ ধোয়ার পানি দে।

আজিজের মা তরকারির হাঁড়ি নিয়ে ঘরে যায়। দুজনে আজিকের ঘরে না ঢুকে কুয়োর ধারে আসে।

গোসল সেরে ফেলি, কি বলিস?

সেটাই দরকার। শরীরে তো ধুলোর আস্তর পড়েছে।

আমাদের এদিকে যা ধুলো, কেবলই ওড়ে। মাটি মাটিতে থাকতে চায় না। যেতে চায় অন্য কোথাও, আকাশে কিংবা বাতাসে।

তুই কথায় বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছিস। মাটি যাদের, তারা পায় না বলেই এমন হয়, এমন হবে। রমেনদার নেতৃত্বে আমরা মাটি যাদের, তাদেরকেই দিতে চাই। অন্যেরা জোর করে রাখবে কেন?

আজমল কথার জবাব দেয় না। কুয়ো থেকে পানি তুলে গায়ে ঢালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝপ্‌ঝপিয়ে পানি ঢাললে সেটা গা বেয়ে নেমে যায় নিচে, ধুয়ে নেয় ধুলো, শীতল হয়ে ওঠে ও। অনবরত পানি ঢালে, ওর প্রচণ্ড ভালো লাগে।

এবার শেষ কর?

দাঁড়া না। আর একটু।

ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

লাগুক।

সকাল থেকেই সাঁওতালরা ওদের অনুষ্ঠান শুরু করবে জমিদার বাড়িতে। রাতেই চলে আসবে চণ্ডীপুর থেকে। আমার তো ইচ্ছে, রাতে ওদের সঙ্গে থাকব।

রমেনদা পৌঁছুবে কখন?

দুপুর হয়ে যাবে। ঢোল-মন্দিরা-খঞ্জনি বাজিয়ে মিছিল করে আমরা লঞ্চঘাটে যাব। ফুলের মালা বানিয়ে পানি ছিটিয়ে কলাপাতায় মুড়িয়ে রেখেছি। সকালে গিয়ে দেবদারু পাতার তোরণ বানানো হবে। আমি ঠিক করেছি, পাতার মাঝে মাঝে দেব ফুলের কুঁড়ি।

কি ফুল?

এখানে তো আর বাগান নেই। যত রকমের পাওয়া যায়। জমা-ই বেশি হবে। সব হিন্দু বাড়িতে তো ঐ একটা গাছই থাকে।

আজমল গামছা দিয়ে গা মোছে। চুল বেয়ে পানি গড়ায়। মাথা ভালো করে না মুছেই ও শুকনো লুঙ্গি পরে নেয়।

বারান্দায় মাদুর পেতে ওদের খাবার দেয় আজিজের মা। সারা দিনে পথের ধুলোয় আজমলের গা ঘিন্‌ঘিন্‌ ভাব কেটে যায়। চিংড়ি দিয়ে করল্লা ভাজির সঙ্গে গরম ভাত ও ঘরে তোলা ঘি মাখিয়ে খেতে ওর অপূর্ব লাগে। মনে হয়, কোনোদিন ও এত সুস্বাদু খাবার খায়নি। ও একটানে দুই থাল ভাত খেয়ে ফেলে।

বাবা তোমাকে মাছ দেই? তুমি তো কিছু নিচ্ছো না?

আর খাব না, খাওয়া শেষ।

বলো কি, কিছুই তো নিলে না?

মামী, এমন খাবার কোনোদিন খাইনি।

সারা দিন খাসনি তো তাই এমন লেগেছে, খিদের মুখে সবকিছুর স্বাদই এমন লাগে। মা, ওকে মাছের মাথাটা দাও। ও মাথা খেতে ভালোবাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল দুহাত দিয়ে বাধা দেয়, আর পারব না।

ঠিক আছে, এই একবাটি দুধ খাও।

আজিজের মা কাঁসার বাটি ভরা দুধ এগিয়ে দেয়। ঘন দুধের পুরু সর পড়েছে। দেখেই ওর লোভ হয়। ও বাটি টেনে নিয়ে প্রায় এক চুমুকে শেষ করে ফেলে।

মামা এখনো ফিরল না যে?

আব্বার হাজার কাজ। আছে হয়তো বোর্ড অফিসে বসে। চল, আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ি। হরেক, টুটু, মাতলার দল হয়তো এসে পড়েছে।

তোর আব্বাকে জিজ্ঞেস করেছিস? তুই তো জানিস, রমেনের সঙ্গে মেলামেশা তোর আব্বা পছন্দ করে না।

আজিজ মার কথার জবাব দেয় না। নিঃশব্দে উঠে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আজমলও। ওর মা জানে, ছেলে প্রশ্নের জবাব দেবে না এবং রাতে বাড়িতেও থাকবে না। তবু এই বলাটা নিয়মে দাঁড়িয়েছে। এই নিয়মটুকু পালিত না হলে তার ভালো লাগে না। বাসন-কোসন গোছাতে গোছাতে বড় মেয়ে লতাকে ডাকে। এবার অন্য ছেলেমেয়েদের খেতে দেবে। লতা আসে না, হয়তো ছোট ভাইকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেও ঘুমিয়ে গেছে। আজিজের মার বুক ভেঙে নিঃশ্বাস আসে। জোতদার স্বামীর অপেক্ষায় কত রাত জেগে থাকতে হবে, কে জানে। এঁটো বাসন-কোসন নিয়ে শেফালি খাতুনের সামনে পুরো সংসার কেঁচোর মতো কিলবিলিয়ে ওঠে। মনে হয়, সবটাই আতঙ্ক, সবটাই অস্বস্তি।

রাত বেশি নয়, চারদিকে ঘন আঁধার। দুজনে গল্প করতে করতে পথ হাঁটে। বাঁশঝাড় পেরিয়ে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। তারপর দুপাশে বাড়িঘর, আরো পরে জমিদারদের আম-বাগান। গাছের ঘন বিস্তার মাথার ওপর ছাদের মতো। পায়ের নিচে মচ্‌মচ্‌ করে শুকনো পাতা। আজমল আজিজের হাত চেপে ধরে। আজিজ অনুচ্চস্বরে হাসে, ভয় করছে, না? আমারও আগে করতো, এখন করে না। প্রতিদিন এপথে হাঁটতে হাঁটতে অভ্যেস হয়ে গেছে। মানুষ জিন-ভূতের কথা বলে, আমি কখনো কিছু দেখলাম না। মনে হয় সবটাই অকারণ।

চুপ কর, এমন করে বলিস না।

আজমল ওকে ধমক দেয়। এক সময় আমবাগানের পথ ফুরিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠ পেরুলে চৌরাস্তা। ওরা দেখতে পায়, উল্টো দিক থেকে মাতলা মাঝি তার দলবল নিয়ে আসছে। ওরা উচ্চকণ্ঠে নিজেদের ভাষায় কথা বলছে, বাতাসে সেসব শব্দ গানের সুরের মতো ভেসে আসছে। ওরা দুজন ওদের জন্য দাঁড়ায়। আজিজের কণ্ঠে খুশি উপচে ওঠে, জানিস, এই সাঁওতালরা আমাদের নাচোল থানার প্রাণ। এখানকার কৃষক আন্দোলনকে ওরাই প্রাণ দিচ্ছে।

ওরা এগিয়ে আসছে, ওদের কণ্ঠ জোরালো হয়ে উঠছে। কখনো ঢোলে বাড়ি দিচ্ছে। অন্ধকারে বোঝা যায় না যে, ওদের মাথায় লালপট্টি বাঁধা, গায়ে ফতুয়া, ধুতি হাঁটু পর্যন্ত ওঠানো, পায়ে জুতো নেই।

আজিজ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, রমেনদার কাছে শুনেছি, সাঁওতালদের বিদ্রোহের এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। পার্টির ঘরোয়া বৈঠকে এসব কথা বারবার ওঠে, আমরা শুনি, আলোচনা করি, ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করি। ফণী মাস্টারও চমৎকার বলে। ভেতরে ভেতরে সাঁওতালরা নিজেদের সংগঠিত করেছিল। জুলুমে-জুলুমে ওদের শরীরে গাস গজিয়েছিল আজমল। মানুষ যখন গর্জে ওঠে, একদিনে গর্জে ওঠে না, তার পেছনে ভূমি তৈরি হয় আজমল। যারা স্বাধীনচেতা, তারা প্রতিবাদ করে, অন্যরা মুখ বুজে সয়। ১৮৫৫ সালের ৭ জুলাই—তারিখটা মনে আছে? ওই দিন ওরা প্রথম বিদ্রোহ করে। অত্যাচারী জমিদার জোতদার, শাসকশ্রেণী অস্ত্র নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে, ওরা বারবার প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু দমেনি। জীবিকার কারণে ওরা জায়গা বদল করেছে বিভিন্ন সময়ে, বদল করেছে শান্তির নীড় গড়ে তোলার আশায়। এই বিদ্রোহের পর ওদের এক অংশ এসে মালদহ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল এবং আশেপাশে বসতি গড়ে। অন্য অংশ জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর ইত্যাদি জায়গায় চলে যায়। কিন্তু যে আশায় ওরা নীড়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে, সে আশা ওদের পূরণ হয়নি। উত্তরবঙ্গের জোতদারদের পীড়নে জীবন অতিষ্ঠ হয়েছে। বর্গাদার চাষি হয়ে খেটেছে ওদের জমিতে। নিজের খরচে, নিজের শ্রমে ফসল ফলিয়ে তার অর্ধেক নিজের খরচে তুলে দিয়ে আসত জোতদারদের গোলায়। এছাড়া ছিল নানা রকমের আবওয়াব ও বেগার। বড় ভয় করত জোতদারদের খেয়াল-খুশিকে। কেননা, যখন-তখন বিনা কারণে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবার ভয় ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২৯-এর দিকে, তোর তো মনে আছে, অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হলো সারা পৃথিবীজুড়ে। ভারতকেও তার মুখোমুখি হতে হয়। এই সময় ফসলের দাম পড়ে যায়। জোতদাররা বর্গাদারদের মাথার ওপর সংকটের বোঝা চাপিয়ে পার পেতে চাইল। বর্গাচাষিদের কাছে ওরা ফসলের তিন ভাগের দুভাগ দাবি করল। যে দিতে চাইল না, তাকে জমি ছাড়তে হলো। নিরুপায় চাষির বুকে জ্বলে উঠল আগুন। এই অযৌক্তিক দাবি ওরা মানতে চাইল না। ১৯৩২-এ মালদহ ও দিনাজপুরের দু হাজার সাঁওতাল সংগঠিত হয়ে শুরু করে সংগ্রাম। ওদের আক্রমণে জোতদারদের ধানের গোলা পুড়ে যায়, পুড়ে যায় বাড়িঘর, ক্ষেতের ফসল ক্ষেতে নষ্ট হয় কিংবা লুট হয়ে যায়। এই অবস্থা তো বেশি দিন চলতে পারে না। জোতদাররা কি আর চুপচাপ বসে থাকবে? ওরাও প্রতিরোধ শুরু করল। বন্দুকের সামনে টিকতে না পেরে এরা পাণ্ডুয়া অঞ্চলের আদিনা মসজিদে জড়ো হয়। জোতদারদের পক্ষে এই আন্দোলনকে দমন করা ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, নিজেদের স্বার্থেই তাদের এটা করতে হয়। অল্প-পরিসরে এবং ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই আন্দোলন। নেতৃত্ব দিচ্ছিল জিতু বোটকা ও সামু। ওদের সাহস ছিল অপরিসীম। কিন্তু শুধু সাহস দিয়ে কি হয় বল? ওই সালের ১৪ নভেম্বর পুলিশ আদিনা মসজিদ ঘিরে ফেলে। সাঁওতালরা স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিল। দীর্ঘ সংঘর্ষের পর ওরা পরাজিত হয়।

আজমল রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। থাকতে না পেরে প্রশ্ন করে, জিতু আর সামু ধরা পড়েছিল?

হ্যাঁ। উপায় ছিল না। ওরা তখন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ক্ষত-বিক্ষত। সে অবস্থায় বন্দী হয়।

বিচারে কি হয়েছিল?

বিচার! আজিজের কণ্ঠে বিদ্রূপ, বিচারের তোয়াক্কা না করেই ওদের গুলি করে হত্যা করা হয়।

ওহ্!

আজমলের কণ্ঠ থিতিয়ে যায়।

তখন যারা বেঁচে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো জীবিত।

তাই? কি করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি আর? চাষবাস করে, হাঁড়িয়া খায়, নেচে-গেয়ে দিন কাটায়।

শুধু এই?

আজিজ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, না, শুধু এই নয়। ওরা আরেকটি সংগ্রামের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে। ওরা অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে পিছিয়ে থাকে না।

এখন ওরা কোথা থেকে আসছে?

চণ্ডীপুর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সাঁওতালরা ওদের কাছে পৌঁছে যায়। হরেক এসে আজিজের হাত ধরে, অন্ধকারে চিনতে না পারলেও ঠিক বুঝেছিলেন যে, আজিজ ভাই দাঁড়িয়ে আছে।

কেমন আছো মাতলা?

মাতলা ঘাড় নাড়ে। ও একটু চাপা স্বভাবের লোক। এখানে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, তবে বয়স কত বোঝা যায় না। কালো পেটানো শরীরে সবকিছু আড়াল হয়ে থাকে। লোকে বলে, মাতলার অসুখ হয় না, এমনকি সর্দি-কাশিও না।

আজিজ হরেকের ঘাড়ে হাত রাখে, জোয়ান মরদ ও, কোনো কিছুতে ভয় পায় না। ওর সাহসের তুলনা হয় না। শিকারের হাত পাকা। ক্ষেতের কাজের অবসরে তীর-ধনুক নিয়ে বনে-বাদাড়ে ঘুরবে।

বিকেলে দুটো ঘুঘু মেরেছি আজিজ ভাই। আপনার জন্য কষিয়ে রেখেছি। কাল তো হবে না। পরশু গিয়ে খেয়ে আসবেন।

আবার আমার জন্য কেন? তোর তো—

আমার তো বাড়িভরা লোকজন আছেই। সব সময় তো কিছু না কিছু শিকার হয়। আমরা সব সময় খাই। আপনি কেবল লজ্জা করেন।

না, না, লজ্জা কিসের! তোর ঘরে রান্না খেতে পেলে তো আমি বর্তে যাই।

দলটি পথ ছেড়ে মাঠে নামে। মাঠ দিয়ে কোনাকুনি চলে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছুবে। মাতলা আগে আগে হাঁটছে, বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। মাঝখানে আজিজ, আজমল, হরেক, টুটু। পেছনে অন্য ছেলেরা। হরেক ওর শিকারের গল্প করছে, হা-হা হাসিতে ভরিয়ে দিচ্ছে চারপাশ। ওরা সবাই ওর কথা উপভোগ করে। মনে হয়, ধানের নাড়া কুট্‌কুট্ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেসে আছে ঝিঁঝিঁটের শব্দ। আজমল হঠাৎ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মনে হয়, ভোলাহাটের কথা। অন্ধকার রাত, কয়েদ চাচা আর কুতুবের কথা। এমন রাতে ওরা ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে, তবে এমন হা-হা হাসিতে ভরিয়ে তোলে না চারপাশ। ওদের মনের ভেতরে আলো নেই, ওরা বিষাদময়। আজমলের মন খারাপ হয়, কিন্তু কুতুব বিষণ্ণ থাকে, কয়েদ চাচা তো ভয়াবহ, ওদের বোঝার সাধ্যি কারো নেই।

পেছনে থেকে শুক্রু মাডাং হেঁড়ে গলায় গান ধরে। কথা বোঝে না আজমল, কিন্তু সুর ওকে স্পর্শ করে। হরেকের কথা থেমে যায়। ফিসফিসিয়ে বলে, শুক্রু মাডাং চমৎকার গায়। গলা ভালো নয়, কিন্তু সুরে যাদু আছে। প্রাণভরে গান শুনতে শুনতে আজমল আবার ফিরে আসে রামচন্দ্রপুর হাটে। সাঁওতালরা এখন ওর কাছে লোক, যাদের প্রাণে মাটির টান প্রবল। আজিজ বলে, এই মাটি ওদের জন্ম-জন্মান্তরের। আমাদের মতো ভিনদেশী পূর্বপুরুষের অহঙ্কার ওদের নেই। এই মাটি আমাদের চাইতে ওদের বেশি আপনার!

তাই ঠিক, নেংটি-পরা কালো কুচকুচে চোয়াল-ওঠা চেহারা একেবারে আদিম, শুক্রু মাডাং-এর গান শুনে আজমলের নিজেরও এই বিশ্বাস জন্মায়। ও এতদিন আজিজের কথা উড়িয়ে দিয়েছে। আসলে আজিজ যা বলে, অনেক ভেবে-চিন্তে বলে। মালদহ কলেজ থেকে বিএ পাস করে ও অনেক কিছু শিখেছে। গভীরভাবে ভাবতেও পারে। রমেন মিত্রের সঙ্গে মিলে ওর ধার আরো বেড়েছে। ও নিজে ম্যাট্রিকের পর আর পড়াশোনা করতে পারেনি। বাপ ওকে জোর করে রেশম ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ইয়াসিন বসনির ধারণা, বেশি পড়াশোনা করে লাভ নেই, বরং উপার্জনের পথ ধরলে সংসারে গুছিয়ে বসা যায়। উপার্জনই পুরুষ মানুষের বড় কৃতিত্ব।

আজমল কষ্টের হাসি হাসে। শুক্রু মাডাং একটার পর একটা গান গায়। বেশির ভাগই করুণ সুর, বুকের গভীরে গেঁথে যায়। সেই সুরে নিজের জন্য খুব দুঃখ হয় আজমলের। ও ভেবে দেখল, আজিজের সঙ্গে ওর অনেক ব্যবধান। বড় কিছু করার সাধ্য ওর নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

ভোরে যখন ঘুম ভাঙে, তখন চড়া রোদে চোখ ধাঁধিয়ে যায় আজমলের। বটের পাতার ফাঁকে খাড়া সূঁচলো রশ্মি ঠিক ওর চোখের ওপর এসে পড়ে। ও হাতের তালুতে চোখ মুছতে মুছতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। এই অপূর্ব সুন্দর গাছটি কাল রাতে দেখা যায়নি। সবুজ পাতার ফাঁকে লাল গোটায় ছেয়ে আছে বিশাল বট। নানা রকম পাখি ঠুকরে খাচ্ছে লাল ফল—আশেপাশে অনেক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দু-একটা ঝরে পড়ে আজমলের মাথার ওপর। আজিজ নিঃসাড় ঘুমুচ্ছে—বাকিদেরও ঘুম ভাঙেনি। আজমল বড় করে হাই তোলে। রাতে জমিদার-গিন্নি লুচি, নিরামিষ আর মিষ্টি খাইয়েছে। এঁটো কলাপাতা টেনে নিয়ে যাচ্ছে কুকুর—ঢোল-মাদল-মন্দিরা-খঞ্জনি পড়ে আছে একপাশে। সাঁওতালরা ঢোল বাজিয়ে, বাঁশি শুনিয়ে, গান গেয়ে পার করে দিয়েছে রাতের তিন ভাগ। সে কী জমজমাট আসর! গাঁয়ের লোক এসেছিল অনেক। ওরা যে যার মতো ঘরে ফিরছে। জমিদার-গিন্নি ওদের বৈঠকখানায় ঘুমুতে বলেছিল। আজিজ রাজি হয়নি। এই বটগাছের নিচেই ও স্বস্তি পায় বেশি—এজন্যই সাঁওতালরা ওকে ভালোবাসে। ও গভীর আন্তরিকতায় ওদের সঙ্গে মেশে। শুক্রু মাডাং হাঁ করে ঘুমুচ্ছে—মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে বলে উঁচু দাঁত কেমন বিশ্রী দেখাচ্ছে। মাতলা গুটিসুটি শুয়ে আছে—হাঁটু জোড়া বুকের কাছে জড়ো করা। হরেকের মাথার নিচে ডান হাত, পা ছড়ানো, খোলা গা, পায়ের আঙুলগুলো ছড়ানো। দেখতে বাজে লাগে। টুপটাপ গোটা পড়তে থাকলে আজমল উঠে দাঁড়ায়। ও একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাখি দেখে। বুলবুলি আর হরিয়াল ও চেনে—বাকিগুলোর নাম জানে না। প্রত্যেকটা কী যে সুন্দর! ও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। ধূসর রঙের পিঠ, হলুদ বুক, ঠোঁটটা চিকন লম্বা, লেজ খানিকটা বাড়ানো। পাখিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমলের মনোযোগ কাড়ে। ও গাছের চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাখি দেখে। তখন ওর ভেতর দুঃখ বাড়ে, আজিজের পক্ষেই সম্ভব এমন গাছের নিচে রাত কাটানো, ও ভাবতেই পারত না। আর আজিজ যা করে বা বলে, সেটা ওর জীবনে একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। এই পাখি দেখাটা তেমনি। তবু ওর দুঃখ বাড়ে, আজিজের ওপর নির্ভরশীল হতে ওর ইচ্ছে করে না, তবু হতে হয়। এই হওয়াটা এত অনিবার্য যে, স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আজিজ ওর ওপরে এবং স্বতন্ত্র। আজমল ইচ্ছে করলেই আজিজকে ছুঁতে পারে না।

একটু পর মাতলা উঠে আসে, সঙ্গে সুখবিলাস। ওদের মাথার পট্টি গলায় ঝুলছে। প্রচুর ঘুমের কারণে চোখ ফোলা, চোখে পিচুটি। হলুদ দাঁত বের-করা সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে দৃষ্টি। দুজনের থ্যাবড়া নাক ফুলে ফুলে ওঠে। ওরা ওর কাছে এসে দাঁড়ায়।

কি করছেন বাবু?

পাখি দেখছি। এটা কি পাখি বল তো?

হাঁড়িচাছা। তবে হরিয়ালই বেশি।

হবেই। অশথ-বটই তো হরিয়ালের আড্ডা। জান না, এদের প্রধান খাবার ফল।

মাতলা আর সুখবিলাস মাথা নাড়ে। তারপর ওরা দুজন মাঠের দিকে নেমে যায়। আজমল বুঝে ফেলে যে, ওরা এখন ঝোপের আড়ালে যাবে। ওদের তলপেট ভারি হয়ে উঠেছে। পরক্ষণে হরিয়ালের ডাকে ও সচেতন হয়ে ওঠে। পাখিগুলো কু কু করে আস্তে আস্তে শব্দ করে, খুব মিষ্টি ডাক, যেন শিস বাজাচ্ছে। আজমল গুনে দেখল, প্রায় ষাটটার মতো পাখি আছে, বেশিও হতে পারে। এগুলোর গায়ের রং সবুজ বলে পাতার সঙ্গে মিশে থাকে। ভালো করে লক্ষ্য না করলে বোঝা যায় না। অবশ্য বুক আর গলার রং হলদেটে। পা দুটো ছোট, কিন্তু তারও রং হলদেটে লাল। এই পাখির মাংস সুস্বাদু বলে আশিক আলি গুলতি দিয়ে শিকার করে। প্রায় নেশার মতো ঘুরে বেড়ান বনের ধারে। নিশানাও ভালো। দু-চারটে না নিয়ে ফেরে না। আজমল অনেকদিন আশিক আলির সঙ্গে শিকারে গেছে। ওর মায়া হয় পাখিগুলোর জন্য। পাতার আড়ালে লুকিয়ে বনের ফল খায়, নিরিবিলি থাকে, লোকালয়ে আসে না, তবু মানুষের হাত থেকে ওদের রেহাই নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর দিকে তাকিয়ে থাকার সময় আজমলের কপালের ওপর আধা-খাওয়া ফল এসে পড়ে। ও চমকে ওঠে। শুনতে পায়, আজিজ ওকে ডাকছে। ও আনমনে হাঁটে। হরিয়াল বড় অগোছালোভাবে বাসা বানায়। আশিক আলি হাসতে হাসতে বলে, কতকগুলো খড়কুটো জড়ো করলেই ওদের বাসা হয়। শাদা রঙের ডিম পাড়ে। জানিস, অনেক সময় খড়কুটো ঠিকমতো সাজানো থাকে না বলে ফাঁক দিয়ে ডিম পড়ে ভেঙে যায়। আজমল বিড়বিড় করে, তবু তুমি ওদের মাংস খেতে ভালোবাসো কুত্তার বাচ্চা। তোমার দিলে মায়া নেই।

কিরে তুই পাখিতে একদম ডুবে গেলি দেখছি?

এত অপূর্ব যে ভাবতেই পারি না।

চল, হাত-মুখ ধুয়ে নিই। এখন গেটের কাজ শুরু করব। তড়িঘড়ি শেষ করতে চাই না। এমন গেট বানাব, রমেনদা যেন চোখ ফেরাতে না পারেন।

আজমল হেসে ওর ঘাড়ে হাত রাখে। রোদ ঝলমলে দিন। জমিদার বাড়ির মাথায় সোনালি আলো। ভেতর থেকে এক ঝাঁকা মুড়ি আর গুড় নিয়ে বেরিয়ে আসে রমেশ। আজিজ হেসে বলে, ওদের মগ ভর্তি কড়া চা দিও রমেশদা। নইলে ওদের শরীর গরম হবে না।

রমেশ হেসে ঘাড় নাড়ে। আজ বৌদি আসবে। যা বলবেন, তাতেই মা রাজি। মার খুশি যেন ধরে না।

খুশি আমাদের সবার।

আজিজ আজমলকে নিয়ে পুকুরঘাটে যায়। পুকুরটা বেশ খানিকটা দূরে, এটা সবার ব্যবহারের জন্য। ঘাটে পা ডুবিয়ে বসে আজমল চোখে-মুখে পানি দেয়। অপর পাড়ে ঘন বেত ঝোপ, অনেকটা দেয়ালের মতো হয়ে আছে। এপাশ থেকে ওপাশের লোক দেখা যায় না। আজমলের মনে হয়, আছিয়ার পুকুরপাড়ে ভেরেণ্ডার গাছ গায়ে-গায়ে লাগানো। কিন্তু এত ঘন নয়, নিচের দিকটা কাণ্ড বলে ফাঁকা। সে ফাঁকে বাতাস বয়ে যায়। অকস্মাৎ তেতো রসে ভরে যায় জিভ। সকালবেলা এমন একটা নাম ও মনে করল, যে কারণে সারাটা দিন খারাপ যাবে। আহ্ অত সুন্দর পাখি দেখার পর কি করে আছিয়া ওর মনে এল, ভাবতেই নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে ও। তার পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। প্রচণ্ড বাসনা যে, ধুয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাক গ্লানি। কতকগুলো সময় এমন ভালো-মন্দের মিশেলে তৈরি হয় যে নিজেকে করুণা করা ছাড়া তখন আর কিছুই করার থাকে না। ও ডুব দিয়ে জলের ওপর মাথা ওঠালে দেখতে পায়, পাড়ে দাঁড়িয়ে হরেক। ওর কুচকুচে কালো শরীরে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে। ও ভাবে, হরেক পাথরে গড়া ছেলে। শরীর এবং মনের জোর একই সমান্তরালে। এমন ছেলে ও কমই দেখেছে। এমন আরো দেখতে চাই, হাজার হাজার দেখতে চাই, এই আশা নিয়ে ও আবার জলের নিচে ডুবে যায়। বুঝতে পারে না, কেন এমন আশা করল। কত কিছুই যে ও না বুঝে করে! জলে সাঁতরে ওর অবসাদ কেটে যায়। ও শুনেছে, মাতলার কোনো ভয়-টয় নেই, ভীষণ সাহসী লোক। জোতদারদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার, ওর পেছনে অনেক লোক, ডাকলে সব সাঁওতাল এগিয়ে আসে। আজমল গামছা দিয়ে গা মোছে বাঁধানো সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে। মাতলা জলে নেমে গেছে, সাঁতরে একদম মাঝ পুকুরে। আজিজ ওকে বলেছে, নাচোলের কম্যুনিস্ট পার্টির লোকেরা অনেকদিন ধরে সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করছে। আরো দশ বছর আগে থেকে ওদের সঙ্গে ওঠা-বসা, থাকা-খাওয়া, উৎসবে যোগ দেয়া ইত্যাদি করে ওরা সাঁওতালদের কাছের লোক হয়ে গেছে। পার্টির সভায় ওরা উপস্থিত থাকে। ওরা এখন অনেক সহজ। শহরের মানুষের প্রতি যে ভয়ের ভাব ছিল, সেটা দূর হয়েছে। ওদের সঙ্গে রমেন মিত্রের পরই সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা আজিজের। আজমল চুল ঝাড়তে ঝাড়তে ওপরে উঠে আসে।

কিরে হয়ে গেল?

হ্যাঁ। তুই নামবি না?

যাচ্ছি।

আজিজ আর হরেক লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওরা হুটোপুটি করে জলের বুকে আলোড়ন তোলে।

লঞ্চঘাটে এসেছে অনেকে। এসেছে কৃষ্ণ গোবিন্দপুর হাই স্কুলের শিক্ষক কামারপাড়ার ফণীভূষণ মাস্টার, শিবগঞ্জের অজয় ঘোষ ও মাণিক ঝাঁও, মল্লিকপুর থেকে কেরামত আলি, তাঁতিপাড়া থেকে নিয়াজ বিশ্বাস, ধুমিহাটপুর থেকে হেফাজ মাস্টার, মহারাজপুর থেকে শোয়েব সরকার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চড়াগাঙ্গা থেকে জিতেন, ভগীরথ আরো অনেকে। তাছাড়া শেখ আজাহার, পাত্রানু, নকুল কর্মকার, ওয়াজেদ মোড়ল সব তো আছেই। মাতলার নেতৃত্বে ঢোল বাজছে, চারদিকে হৈ-হল্লা, কারো কথা তেমন শোনা যায় না। অবশ্য যে যার মতো কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আলাপ সেরে নিচ্ছে। পার্টির সদস্যরা অনেকদিন পর অনেকে এক জায়গায় হয়েছে। কথা কারো ফুরোতে চায় না। নদীর ঘোলা জল পাড়ে আছড়ে পড়ে। আশপাশে বড় গাছ নেই বলে ছায়া নেই। কেউ রোদ গায়ে মাখে না, নদীর বাতাসে ঘাম হয় না। সবাই উৎফুল্ল। লঞ্চের ভেঁপু শোনা যাচ্ছে।

পানি কেটে এগিয়ে আসছে লঞ্চ। সাঁওতালরা মাথার লালপট্টি খুলে হাত উঁচু করে দোলাতে থাকে। সুখবিলাস আর ভগীরথ ঢোল বাজাচ্ছে। শ্যামল, ছিপছিপে লম্বা, জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো বাঁকিয়ে ছেড়ে দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারে। শহরের মেয়ে, তাও আবার মফস্বল শহর নয়, খোদ কলকাতার, জড়তা নেই, কিন্তু কৌতূহল প্রচণ্ড। মাথায় ঘোমটা, কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, সাঁওতালদের লালপট্টির রঙে রং। গভীর কালো চোখ অনুসন্ধিৎসু, গ্রাম-বাংলার বিস্তীর্ণ মাঠ, লঞ্চঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য মানুষ ওর চোখে একাকার হয়ে যায়। মনে মনে নিজেকে সাহস দেয়, আমি পারব। এ সবকিছুর মধ্যেই নিজের বিশ্বাস খুঁজে নেব। কোনো দিন দেখিনি, তবু তো সবই আপন মনে হয়। কেউ আমার নিজস্ব ভুবনের বাইরে নয়। ফুলের মালায় ভরে উঠেছে ওদের গলা। ফণী মাস্টার রমেনকে জড়িয়ে ধরে। হাসতে হাসতে বলে, দুজনকে মানিয়েছে বেশ। একদম মানিকজোড়।

সুখবিলাস আর ভগীরথের ঢোল থেমে গেছে। সানাই বাচাচ্ছে অতুল, মালদহ থেকে ওকে নিয়ে এসেছে ভুপেন। বাতাসের করুণ স্পর্শ বুকে নিয়ে ইলা মিত্র গরুর গাড়িতে উঠে বসে। ওরা রমেনকেও উঠিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রমেন রাজি হয়নি। গাড়ির পেছনে ওরা হাঁটছে। সবশেষে ঢোল বাজিয়ে নাচতে নাচতে আসছে সাঁওতালরা। ওদের ফুর্তি আর ধরে না। উপলক্ষ পেলে ওরা বুক উজাড় করে আনন্দ প্রকাশ করে। বেশ বড়সড় একটা মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে লোক জমে যায়। কেউ কেউ সে মিছিলে যোগ দিয়ে হাঁটতে থাকে।

ছাউনির মধ্যে ইলার বুক খচ্ করে ওঠে। এতক্ষণে ফেলে-আসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনটা ওকে তাড়িয়ে ওঠে। ওর চোখে জল এলে আঁচলের খুঁট দিয়ে মুছে ফেলে। দুপাশের মাঠ ওর সামনে খবরের কাগজের পৃষ্ঠার মতো খুলে যায়। নিজেকে দেখতে পায় ওখানে। কত অসংখ্য ছবি ছাপা হয়েছে সেসব পৃষ্ঠায়। '৩৬ থেকে '৪২ পর্যন্ত খেলাধুলোয় ওর নাম ছিল প্রথম সারিতে। অ্যাথলেটিক্স ছিল প্রিয় বিষয়। দৌড়, ঝাঁপ, লাফ—আরো কত কী! ভারতের অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের রেকর্ড ভেঙেছে শীর্ণকায়া বাঙালি মেয়ে। ভাবতেই গা শিরশির করে ওঠে। গৌরবময় দিনগুলো এখন বুকের খাঁচায় বন্দী। ও অস্বস্তি তাড়াতে পারে না। বারবার মনে হয়, মাঠের খেলা শেষ করে এবার জীবনের খেলা শুরু। পারব তো? নিজেকে প্রশ্ন করে। বুকের খচ্‌খচি কমে না। এখন আর সবুজ মাঠে নরম ঘাসের ওপর দৌড় নয়। দৌড় গ্রামের এই এবড়ো-থেবড়ো রাস্তায় এবং এসব মানুষের সঙ্গে। এগিয়ে গেলে হবে না, এদের সাথে নিয়েই এগুতে হবে। গাড়ির দুলুনিতে ওর আত্মবিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে, আমি পারব। পরাজিত হতে আমি জানি না। খেলা যেভাবেই হোক না কেন, জয়ী হওয়াটাই প্রথম কথা।

গভীর কালো চোখ দীপ্র হয়ে ওঠে। মুখ বাড়িয়ে দেখে ধু-ধু প্রকৃতি, শোনে, ভেসে আসা মানুষের কথা। তখন জীবনের বাঁক-বদলের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি ওর বুকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অস্বস্তি কেটে যায়। মানুষটি ওর মনের মতো হয়েছে। হয়তো এমনটিই চেয়েছিল, হয়তো এমনই। কোনোদিন স্বপ্নের ভেতর এমন আকাঙ্ক্ষাই প্রবল ছিল। তখন লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যায়। গভীর ভালোবাসায় রমেনের বুকে মুখ রাখতেই সে বলেছিল, স্বপ্নগুলো এক হবে ইলা, তোমার আমার দিনগুলোয় বিরোধ থাকবে না, আমরা আমৃত্যু এমনই থাকব। এমন গাঢ় স্বরে কেউ কথা বললে, তার উত্তর হয় না। ও চোখ বুজে ঘাড় নেড়েছিল। এই মুহূর্তে সংকোচের সঙ্গে প্রচণ্ড ভালোলাগা ওকে আলোড়িত করে। ও বুঝে ফেলে যে, মনের মতো সঙ্গী পাওয়া জীবনের খেলায় সবচেয়ে বড় জয়। ওকে আর ঠেকাবে কে? ও গভীর পরিতৃপ্তিতে ছইয়ের গায়ে হেলান দেয়।

এবড়ো-থেবড়ো রাস্তায় গরুর গাড়িতে শরীরে ব্যথা হয়। সেজন্য নরম বিছানা করে দেয়া হয়েছে। ও পা ছড়িয়ে বসে। মাঝে মাঝে মাথা ঠুকে যায় ছইয়ের সঙ্গে। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নেয়। একটু সাবধান হলেই এই ঠোকাঠুকি এড়ানো যায়। বড় ইচ্ছে করে, একবার মুখ বাড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমেন মিত্রকে দেখতে। সম্ভব নয়, একেবারেই না। ও এখন একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে এসেছে। আগে এটাকে নিজের করে নিতে হবে। হুট করে কোনো কিছু করে সবটাই নষ্ট করা উচিত নয়। মাঠের মধ্যে একঝাঁক ছাতারে দুপায়ে লাফিয়ে পালাচ্ছে। এলোমেলো দাঁড়িয়ে আছে তালগাছ। ঘন পাতার মাথা ওকে বাবার কথা মনে করিয়ে দেয়। বাবা অমন ঝাঁকড়া চুলের মানুষ, অমন ঋজু, একরোখা এবং ঝুলে-থাকা বাবুইয়ের বাসার মতন বুকে ধরে রেখেছিলেন ওদের। এসব দৃশ্য ওর কাছে নতুন। ন্যাঙটো ছেলেটাকে গরুর বাছুরের লেজ ধরে ছুটছে দেখে ও হাসি চাপতে পারে না। কলাগাছ কিংবা ফণীমনসা বা বাঁশঝাড়ের আড়ালে দুচোখে বিস্ময় নয়ে তাকিয়ে আছে গাঁয়ের মেয়ে। কাউকে দেখে মনে হয় বিবাহিত, কাউকে কুমারী। এখন থেকে এদের সঙ্গেই ওর নিত্যদিনের ওঠাবসা। না, মন খারাপ হয় না। সে পাট ও কলকাতাতেই চুকিয়ে এসেছে। আর একজন মানুষ তো আছেই, যে ওর মন-খারাপ উড়িয়ে দেবে, ভরিয়ে রাখবে বিষণ্ণ সময়।

বিয়ের রাতে রমেন বলেছিল, আমরা দুজন আমাদের মতো করে একটা সময় তৈরি করে নেব। সেসময় আমাদের পরিচর্যায় পুষ্ট হবে।

তুমি কি রাজনীতির কথা বলছো?

সব মিলিয়েই সবকিছু ইলা। আমাদের জীবন কোনো কিছু থেকে আলাদা নয়।

জানি।

এই জানাটাই ওর জীবনে প্রধান। ইলা দাঁতের নিচে শাড়ির কোনা চিবোয়। আর কত পথ? আর কত দূর যেতে হবে? সাঁওতালদের বাজনা থেমে গেছে। ওরা এখন নীরবে হাঁটছে। গাড়ি চৌরাস্তায় এসেছে। পথের মোড়ে বিশাল একটা গাছ। ও নাম জানে না। গাছ, পাখি ও কমই চেনে। এসব চেনার সুযোগ হয়নি, সময়ও ছিল না। অ্যাথলেটিক্সের অনুশীলনে, পড়ার বইয়ে, রাজনীতিতে ডুবিয়ে রেখেছিল নিজেকে। এখানকার এই শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে কিইবা করার আছে। পারবে কি কিছু করতে? নিজেকে ধমকায় ও, বারবার আমি কেন এক জায়গায় ফিরে আসি? আমার কিসের দ্বিধা?

তখন গাড়ি থেমে যায় এবং পাশ থেকে রমেন ছইয়ের ভেতর মুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢোকায়, তোমার অসুবিধা হচ্ছে না তো?

ও মাথা ঝাঁকায়, একটুও না।

রমেন হেসে ফেলে, কেমন লাগছে?

খুব ভালো।

একটু পর আমরা পৌঁছে যাব।

সরে যান রমেন। ইলা নির্ভাবনায় চোখ বোজে। করোটি ভেদ করে চলে যায় একটি বাক্য, একটু পর আমরা পৌঁছে যাব। বাক্যটি অনবরত ওর মগজে ঢোকে—ঢুকতেই থাকে। ও বুঝতে পারে, লক্ষ্য ঠিক থাকলে মানুষ সেখানে পৌঁছেই যায়। রমেনের সুদর্শন কান্তি ওর চোখে জড়িয়ে থাকে। ও ইচ্ছে করেই চোখ খোলে না, পাছে যদি মুছে যায় সবটুকু আবেশ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে যায়। বিয়ে-বাড়ির খাওয়া ফুরুতেই চায় না। লুচি, পাঁঠার মাংস, তরকারি, আমড়ার চাট্‌নি, মিষ্টি, দৈ খেয়ে ডাব্বুস হয়ে যায় পেট। সাঁওতালরা বটতলায় বিশ্রাম নেয়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সবাই, কেউ বসে, কেউ শুয়ে। বটের নিরিবিলি ছায়া হঠাৎ করে ওদের বিয়ে বাড়ির কোলাহল থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আজমল আর আজিজও ওদের সঙ্গে। দুজন মাথার নিচে হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে গল্প করছে।

বৌদি দারুণ, নারে আজিজ?

আজিজ লম্বা করে হ্যাঁ বলে।

এমন মেয়ে আমি একটাও দেখিনি।

চুপ কর আজমল। তোর কেবল আদিখ্যেলেপনা। কেন, মালদহে দেখিসনি, বুঝি?

শহরের মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এমনটি নয়।

কেমন?

বোঝাতে পারব না।

আজমল হাত উল্টিয়ে ওঠে বসে।

বৌদি তোকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে দেখছি।

আজিজ শব্দ করে হেসে উঠে। আজমল হাই তোলে। ওর বেশ আয়েশ লাগছে। ও আজিজের কথার জবাব দেয় না। ও বুঝতে পারে না, কোনো কোনো মানুষ ওকে এমন করে পেয়ে বসে কেন? ইলা মিত্র ওর মাথার মধ্যে স্থির হয়ে গেছে। আমৃত্যু তাকে আর সরানো যাবে না। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, সময়ে-অসময়ে, ঘুমে-জাগরণে করোটির প্রান্তে সোজা দাঁড়িয়ে থাকবে। অদ্ভুত আচ্ছন্নতার ভেতর দিয়ে সে ছায়া অস্পষ্টতায়-স্পষ্টতায় ওকে আলোড়িত করবে। ও বুঝতে পারবে না, কেন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন হয়? এমন হওয়া উচিত কি না? এমন আর একটি মানুষ হরেক। বারবার ভেসে ওঠে, মিলিয়ে যায়, ভেসে যায়, ভেসে ওঠে—কিছুতেই মুছে যায় না। আজমল উঠে বটগাছের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। দুহাত বরে বটের ফল সংগ্রহ করে। ও কি করবে, বুঝতে পারে না। সন্ধ্যায় হ্যাজাক জ্বালিয়ে গানের আসর বসবে। আসলে সে সময়টার জন্য ও উন্মুখ হয়ে আছে।

একটু পর দেখে, অন্যদের বৈঠকখানায় রেখে রমেন মিত্র এগিয়ে আসছেন। পথের ক্লান্তি কেটে গেছে, তাকে বেশ সতেজ দেখাচ্ছে। একমুখ হাসি নিয়ে সাঁওতালদের মাঝে এসে দাঁড়ান। হরেকের পিঠ চাপড়ে দেন, ঠিকমতো খেয়েছিস তো হরেক?

হ্যাঁ, এমন খাওয়া কেউ ছেড়ে দেয়?

ভালো, এজন্যই তো তোরা আমার এত প্রিয়। পেট ভরে খাবি, মন খুলে গান করবি, প্রাণভরে কাজ করবি।

আজিজ পাশ থেকে ফোঁড়ন কাটে, একবেলা পেটে ভরে খেলেই বুঝি হবে রমেনদা?

কেন? একবেলা হবে কেন? প্রত্যেকবেলা যাতে পেট ভরে খাওয়া যায়, তার জন্যই তো আমরা লড়ছি। আমরা সাফল্য অর্জন করবই।

সাঁওতালরা মাথা নাড়ে। রমেনের কথা ওরা সবসময় মনোযোগ দিয়ে শোনে।

মাতলা, সন্ধ্যায় গানের আসর হয়ে গেলে আমরা বসব। কথা আছে।

সে কি রমেনদা, আজ কেন? আজ বৌদি এলেন। আজ কোনো বসাবসি নেই।

রমেন মিত্র হেসে ফেলে।

তাতে কি? তোমার বৌদি এসব নিয়ে কিছু মনে করবেন না।

বৌদি পারবেন তো আপনার এই রাজনীতি মেনে নিতে? শোনো, এখন তো '৪৫। '৪৩ সালে যখন তোমার বৌদি বিএ সম্মান ক্লাসের ছাত্রী, তখনই কলকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য হয় এবং একই বছর কম্যুনিস্ট পার্টিরও সদস্য হয়। এরপরও পারবে না বলে মনে হয় তোমার?

বাপ্‌স এত কথা তো জানা ছিল না আমার। আজিজ লাজুক ভঙ্গিতে হাসে। আজমল হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর কাছে পুরো ব্যাপারটাই চমকপ্রদ। এত ওপর থেকেও ভাবতেই পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে হয় জীবনসঙ্গী পছন্দ করতে আমি ভুল করিনি। তোমাদের ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। পার্টির কাজ কোনো অবস্থাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

আমি এসব বোঝাতে চাইনি রমেনদা?

রমেন ওর ঘাড়ে হাত রাখে, তুমি বোঝাতে চাইবে কেন আজিজ? আমি তো জানি, তোমার মতো কর্মী হয় না। আমারই উচিত নিজেদের মধ্যে যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয়, সেটা দেখা। কারো মনে কোনো দ্বিধা থাকুক, এটা আমি চাই না।

ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে অন্য সাঁওতালরা। রমেন সবার সঙ্গে কথা বলে, শুক্র মাডাং আজ গান গাইবি না?

ও হেসে মাথা নাড়ে।

শুক্রর গান ছাড়া কি আসর জমে? সুখবিলাস যা অপূর্ব মাদল বাজায়!

বৌদি আসরে আসবে তো? আজ সব গান বৌদির জন্য।

হ্যাঁ আসবে। যাই, ওরা আবার সব বসে রয়েছে।

রমেনের সঙ্গে আজিজ এবং আজমলও যায়। তখন বটগাছের নিচে বসে ওরা মৃদু শব্দে ঢোল বাজায়। নিজেরা নিজেদের মধ্যে কথার ঝড় তোলে। এসব কথার সবটাই ওদের নিজেদের ভাষায়।

সন্ধ্যায় সাঁওতালদের অনুষ্ঠান আগে, পরের অংশে হবে আলকাপ। আজ হবে আলকাপ ফার্স, আলকাপ খ্যামটার চাইতে ফার্সই বেশি ভালো লাগে আজমলের। খ্যামটা রাধা-কৃষ্ণের গান, কিন্তু ফার্সের মধ্য দিয়ে কৌতুক করে কাইপ্যা।

আজকের কাইপ্যা কে আজিজ?

সতীশ সরকার। এ অঞ্চলে ওরই নাম-ডাক বেশি। তুই কি শুনেছিস ওর আলকাপ?

না।

খুব মজার। হাস্যকৌতুক যার ওপর নির্ভর করে, সে তো কাইপ্যা, কিন্তু ওর দলের অন্যরাও দারুণ! আসর মাতিয়ে রাখে। দেখবি, যত রাতই হোক, একটি লোকও কিন্তু আসর থেকে উঠবে না।

আমি নিজেও আলকাপের ভক্ত। তুই কাকে কি বলিস?

আজিজ হাসিতে ভরিয়ে দেয় আজমলকে। বাড়ির সামনে খোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশের নিচে আসর বসেছে। দুজন মাঝামাঝি জায়গায় চটের ওপর বসে, হ্যাজাকের আলো থেকে একটু আড়াল হয়ে বাঁশের খুঁটিতে হ্যাজাক ঝোলানো হয়েছে চার-পাঁচটা। এর মধ্যে চারপাশে পোকা জমে গেছে। সামনে যারা বসেছে, তাদের মাথার ওপর পোকা উড়ে আসে। শুক্র মাডাং-এর গান শুরু হয়েছে। কথা বোঝে না কেউ, কিন্তু সুর ওদের যাদু করে রাখে। সঙ্গে বাঁশি বাজাচ্ছে চিতোর। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে মগ্ন হয়ে শোনে আজমল।

আজিজ ফিসফিসিয়ে বলে, একদিন ওদের উৎসবে ওদের পাড়ায় তোকে নিয়ে যাব, দেখবি উৎসবের কী ধুম! নিজেদের মধ্যে ওরা একদম বুনো হয়ে যায়। তখন কোনো সীমানা টানে না। সে উত্তেজনায় গা ঢেলে দিতে দারুণ লাগে।

আজমল কথা বলে না। ওর চেতনার রন্ধ্রে বাঁশি ঢুকে যাচ্ছে। ওর মনে হয়, ঐ উত্তেজনার চাইতে বাঁশি ভালো, এই মগ্নতা ভালো। এরপর মাদল বাজিয়ে নাচে ওরা সাত-আটজন। তালে তালে সে কী উন্মাদনা! গরম হয়ে ওঠে আসর। একটু আগের বাঁশি তলিয়ে যায় কোথায়? আজমলের খারাপ লাগে, ঐ বাঁশির জন্য ওর বুকের অতৃপ্তি ফুরোয় না। সাঁওতালদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেও সে রেশ জেগে থাকে।

আধ ঘণ্টার বিরতির পর শুরু হয় আলকাপ। আসরের ভেতর থেকে কাইপ্যা একটা কাগজ হাতে উঠে আসে। পরনে ধুতি-ফতুয়া, গলায় গামছা, উস্কুখুস্কু এলোমেলো চুল, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মতো ভঙ্গি। চিঠিটা উঁচু করে ধরে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, "ওগো আমার ভালোবাসা আমাকে পত্র লেখ্যাছে। ম্যালাদিন পরে ভালোবাসার মধ্যেই হাঁর কাছে আইসো, হাঁর পরাণ আর মানে না।"

কাইপ্যা একটু পায়চারি করে স্বগতোক্তি করে, "হামারো পরাণ আর মানছে না। হামি এখনি ভালোবাসার কাছে যাব। ভালো কাপড় গতরে নাই। তার লাইগ্যা কি হাঁর ভালোবাসা হাঁকে হ্যাকারত কোরবে?"

তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে চুল ফেলে কপালের ওপর, 'কক্ষণো কোরবে না।" হাঁটতে শুরু করে আস্তে-ধীরে। দুচক্কর ঘুরে বসে পড়ে এক জায়গায়। ভাবখানা এমন যেন, এসে গেছে ভালোবাসার বাড়ি। তারপর উঁচুস্বরে ডাকে, "ভালোবাসা, ও ভালোবাসা, তুমি কুন্ঠে গেল্যা? হামি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইস্যাছি। জলদি কৈর‍্যা বদনাত কৈর‍্যা পানি লিয়্যা আইস্যো, আমি এ-নিম গাছটার তলাতে বস্যাছি।"

এমন সময় বাড়ির মালিক লাঠি হাতে বেরিয়ে আসে। ওকে দেখে লাফিয়ে উঠে কাইপ্যা বলে, "ওগো মাগো হাঁকে আইজ বুঝি সাবাড় কৈর‍্যা দিবে। ভালোবাসার কাছে আর বুঝি যাইতে প্যারব না।"

বাড়ির মালিক লাঠি উঁচু করে, "কুন শালারে, ভালোবাসা ভালোবাসা মার‍্যাছে?"

কাইপ্যা রুখে দাঁড়ায়, "কেনে কি হোয়্যাছে, হাঁর ভালোবাসা কে হামি ডাকছি, তাতে তোমার কি?"

বাড়ির মালিক খেপে যায়, "কি এ্যাত বড় আস্পর্দা? হাঁর বাড়ি আইস্যা তুমি তোমার ভালোবাসাকে ঢুঁড়ছো? তোমার ভালোবাসা ঢুঁড়া বাহির করছি?"

কাইপ্যা হাত জোড় করে, "শুন, শুন তুমি যে এ্যাকবারে রাইগ্যা গেলা? মানুষের কি ভুলচুক হয় না নাকি?"

বাড়ির মালিক নরম না হয়ে বলে, "তা হয় হয়, যাতে আর না হয়, তার লাইগ্যা এই খুটবাইড়্যা হাতে কৈর‍্যা লিয়া আইন্যাছি?"

কাইপ্যা বিনীত স্বরে বলে, "দোহাই ভাই, তোমার দোহাই লাগে, হাঁকে আর বাড়ি মাইরো না। আর বাড়ি মারলে মৈর‍্যা যাব।" বাড়ির মালিক রুষ্ট হয়েই বলে, "ভদ্রলোকের বাড়িত আইস্যা যাতে আর কুনুদিন ভালোবাসাকে না ঢুঁড়ো, তার লাইগ্যাতে এই খুটবাইড়্যা লিয়া আনছি।"

বাড়ির মালিক লাঠি উঁচিয়ে ধরলে কাইপ্যা দুহাতে সে হাত চেপে ধরে। শ্রোতারা প্রবল হাসিতে ভেঙে পড়ে। কাইপ্যার কথা অনেকে শুনতে পায় না। ও বলে চলে, "লেরে ভাই লে, হৈলো। মাথা ঠাণ্ডা কৈর‍্যা বৈসো। এই লাও ভাই, হাঁর কাছে খুবি ভালো বিড়ি আছে।"

দুজনে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বসে। বাড়ির মালিক বিড়ির জন্য হাত বাড়ায়, "বিড়ি আছে দাও। খবরদার কুনুদিন যেন আর ভুল না হয়।"

কাইপ্যা গদ্‌গদ স্বরে বলে, "তা তো হলোরে ভাই, কিন্তু তুমি কি হাঁর ভালোবাসাক দেখ্যাছো?"

বাড়ির মালিক রস করে, "তোমার ভালোবাসা কেমন কহ তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাইপা বিগলিত হয়ে যায়, "ভালোবাসা? হেঁ-হেঁ সুন্দর হৈতে চোখ গালা। এ্যাকেবারে যাকে কহে মাঞ্জা খানটা মিহি। চুল গালা পাছার ওপর পড়ে।"

বাড়ির মালিক উৎসাহিত হয়ে ওঠে, "ওহে মনে পৈড়্যাছে, মনে পৈড়্যাছে। তুমি এই সোজাহা খাটা ধৈর‍্যা নাক বরাবর চৈল্যা যাও। গেলেই যে-বাড়িটা পন্থমে পড়বে, সেইট্যাই তোমার ভালোবাসার বাড়ি।"

কাইপ্যা উঠে দাঁড়ায়, "হ্যাঁ, হ্যাঁ এ্যাবারকার চিনহ্যাছি। তুমি বিড়ি চুয়ো। হামি এ্যাবারকার চলনু।"

বাড়ির মালিক ওর হাত ধরে, "আরে ভাই, বৈস বৈস, ব্যালা পড়লে যাইও।"

কাইপ্যা পা বাড়ায়, "উ সব আর শুনব না, হামি চলনু।" বাড়ির মালিক আড়ালে চলে যায়। কাইপ্যা, শ্রোতার মাঝখান দিয়ে আবার সামনে আসে, "হ্যাঁ এট্যাই খাঁটি হাঁর ভালোবাসার বাড়ি। ঐ তো ঐ হাঁর ভালোবাসা কাঁকালে কলসি কের‍্যা নদীতে পানি আনতে যাইছে। ভালোবাসা, ও ভালোবাসা, তাকিয়্যা দ্যাখো, তোমার কেঠা আইস্যাছে।"

কলসী কাঁখে জল আনতে যায় মেয়েরূপী একজন ছেলে। ও মাথার ঘোমটা সরিয়ে তেড়ে ওঠে, "কী মরার ব্যাটা ভালোবাসা ঢোলাইছেরে? হামি বুড়া মানুষ, তিনকাল যায়্যা এ্যাককাল আছে, আর হামাক ভালোবাসা ঢোলাইছে?"

কাইপ্যা দাঁতে জিভ কাটে, "ছি, ছি, তোবা তোবা—এটা যে হাঁর মাসী লাগছে? মাসী গো, এট্যা তোরি বাড়ি? তা ক্যামন আছিস মাসী?"

শ্রোতারা হাসিতে ভেঙে পড়ে। চারদিকে করতালি বাজে। মাসী মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, "কেমন আছিরে মরার ব্যাটা? তোর কি চোখে ছানি পড়্যাছে? কুন্‌টা তোর ভালোবাসা আর কুন্‌টা তোর মাসী, তাই চিনিসন্যা?"

কাইপ্যা হেসে বলে, "নাগে মাসী, কিছু মনে করিস ন্যা। ঐ রাস্তায় এক শালার সাতে চুকামুখি হৈয়্যা গেছিলো। শ্যাষে ঠগাবার লাইগ্যা ঐ শালায় নাক বরাবর যায়্যা হাঁর ভালোবাসাকে ঢুঁড়তে কোহাচ্ছিলো?"

মাসী অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলে, "তোমার কুহুবার কথা তো শুননু। এখন কহা তোর বাপ মা ক্যামন আছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাইপ্যা যাবার জন্য পা বাড়ায়, সে অবস্থায় বলে, "উসব কথা তুই এখন হামাকে পুছ করিস ন্যা তো মাস।

হামি আর বসবো না।"

মাসী অন্তরালে চলে যায়। কাইপ্যা গান ধরে :

তাইরে নারে নারে নারে নাম
তাইরে নারে নারে নারে নাম

হঠাৎ ভালোবাসার সন্ধান পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে চোখের ওপর হাত দিয়ে মাথা উঁচু করে তাকায়, হ্যাঁ, ঐ হামার ভালোবাসা! এ্যাবারকার আর ভুল হৈছে না। দেখি ডাকছি : ভালোবাসা, ও ভালোবাসা, একবার ঘুর‍্যা দ্যাখো তোমার কেটা আইস্যাছে। আরে রাগ কেনে করছো, কথা কেনে কহিতে চাইছো না?"

তারপর নেচে-নেচে গান শুরু করে :

কি দোষ আমি কোরলাম গো
বদন খুলি কথা বলো না

এক কোনা থেকে মেয়েরূপী এক পুরুষ এগিয়ে এসে গান গায় :

মিছামিছি প্রেম করো না
ভালোব্যাসি ক'গো।
তুমি দিও ন্যা যন্ত্রণা

কাইপ্যা ওর কাছে এসে নাচে, মেয়েটিও নাচে।

কাইপ্যা গায়,

ওকি দোষ করিলাম গো
বদন খুলে কথা বলো না
সদায় থাকি মনের দুঃখে
তোমার বিরহে
ওগো ভুলিতে পারি নে
তোমারে বলে।

মেয়ে :

তুমি ভালো যদি বাসো
কেন কান্দাইছে হামারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ্যাত দিন পর কেনে তুমি
এলে মোর দ্বারে?

কাইপ্যা :

না হে রে দু'নয়নে
বনে বনে বেড়াইছি ফিরে
সাথের সাথী কাইর‍্যা হামি
যাইব গৃহে।

মেয়ে :

কৃষ্ণ নামের মালা তোমার
পরিলাম গলে
হতভাগীর লাও মিনতি
যেও না ফেলে।

পুরুষ :

বৃন্দাবনের কথা তোমার
মনে পড়ে না
বদন তুলে কথা বলো না।

AMARBOI.COM

তারপর দুজনে কিছুক্ষণ একসঙ্গে নাচলে আসর শেষ হয়। তখন মধ্যরাত। হ্যাজাকের চারপাশে অসংখ্য পোকা জমেছে, প্রচুর পুড়েছে। শ্রোতারা সবাই খুশি। অনেকদিন পর গাঁয়ে এমন আসর বসেছে। আজমল বটতলায় ফিরে এসে বলে, একদিন আলকাপ খ্যামটা শুনব রে আজিজ।

ঠিক আছে, আবার একটা আসর বসাব।

আসর করে গান এবার আর শোনা হবে না। কালই যাব ভাবছি। পথে আবার মল্লিকপুর একদিন থাকব, নইলে ছমির মামা রাগ করবে।

কালই যাবি?

যাই। বাবা আবার খেপে উঠবে। যা রগচটা মানুষ।

দিলি মন খারাপ করে।

বটতলায় সাঁওতালরা এর মধ্যে ফিরে এসেছে। ওরা ঘুমুবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোড়জোড় করছে। কেউ কেউ শুয়ে পড়েছে। আজমলের মাথার ওপর বটের গোটা ঝরে। কি যেন পাখি ডাকে, বুঝতে পারে না। আজমলেরও মন খারাপ হয়ে যায়। এখানে থাকা মানেই সবকিছু ভুলে থাকা, ভোলাহাট মানেই পুরনো গর্ত, ইঁদুরের মতো মাটি কামড়ানো।

হরেক ওদের দুটো কাপড়ের পুটুলি দেয়। কালকে ওরা মাথার নিচে দিয়ে ঘুমিয়েছিল। মাতলা শুয়ে পড়েছে। হয়তো ঘুমিয়েও গেছে। ফিসফাস কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর কেউ জেগে নেই। আজমল শুয়ে পড়ে। বটের পাতার ফাঁকে দেখা যায় মাথার ওপর জ্বলজ্বলে আকাশ, তারা ফুটে আছে। ও প্রাণপণে ঘুমুতে চায়। আজিজের সঙ্গে ঠিক হয়েছে, খুব ভোরে উঠে দুজনেই বাড়ি ফিরবে। বেলা ওঠার আগেই রওনা হয়ে যাবে আজমল। বাকি রাতটুকু না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় ও। আধো-অন্ধকারে ঠেলে তোলে আজিজকে। দুজনে মাঠ পেরিয়ে চলে আসার সময় আজমল বলে, কারো কাছ থেকে বিদায় নেয়া হলো না।

আজিজ হাই তুলে বলে, কেউ কিছু মনে করবে না।

তোর ঘুম এখনো কাটেনি দেখছি?

হ্যাঁ, আরো কিছুক্ষণ ঘুমাতে পারলে ভালো লাগত।

ও দুহাত ওপরে তুলে শরীর বাঁকিয়ে নেয়।

ভোরের এই বাতাস চমৎকার! এজন্য আব্বা খুব ভোরে উঠে বাড়ির সামনে পায়চারি করে। মুখোমুখি দেখা না হয়ে গেলেই হয়।

ভয় পাস?

একটুও না।

আমি পাই।

আজমল গভীর করে শ্বাস টানে।

আমি ভেবে দেখেছি ভয় পাওয়া আমার স্বভাব। কখনো কোনো কারণ ছাড়াও ভয় পাই। এমন হয় কেন বল তো?

আজিজ হাত উল্টে বলে, তোর নার্ভ উইক।

কথা বলতে বলতে দুজনে আম-বাগান পেরিয়ে আসে। রাতে না ঘুমুনোর জন্য আজমলের মাথা ভার। ও আজিজের কথা গভীরভাবে ভাবে। আজিজ ঠিকই বলেছে। ও অনেক কিছু পারে না, অথচ সেজন্য ওর আবার দুঃখবোধ আছে। ইচ্ছে করলেই এসব ভাবনা ও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে না। বাড়ির সামনেই ওরা আজিজের বাবার মুখোমুখি হয়। খুঁটিওয়ালা কাঠের খড়ম পরে বাসার সামনে পায়চারি করছে। গেঞ্জির ওপর দিয়ে লুঙ্গি, বাঁধা, বিশাল ভুঁড়ি বেরিয়ে আছে। রাতে ঘুম হোক আর না হোক, চোখ জোড়া সবসময় লাল থাকে। আজও রক্তচক্ষু মেলে ওদের দেখে। আজমল থমকে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়। ওর মামা সালামের উত্তর দেয় না। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে, বেশ ফুর্তি করে আসা হলো? ওরা দুজনে নিশ্চুপ। কবে বাড়ি যাবি? আজমল ঢোক গিয়ে বলে, আজই। শুনলাম সুতোয় বেশ লাভ করেছিস? জী, আজমল আবারো ঢোক গেলে। ওর হাঁটু কাঁপে থরথর করে। বেশ, ওর মামার গম্ভীর কণ্ঠ বাতাসে মিলিয়ে যায়। দুজনে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতর ঢোকে। পেছনে কাঠোর খড়মের খট্‌খট্ শব্দ জেগে থাকে।

অত ভোরে গরম ভাত ছিল না, পান্তা খেয়েই ওকে রওনা করতে হয়। থলির মধ্যের টাকাগুলো কোমরে বেঁধে নেয়। এখান থেকে মল্লিকপুর ও হেঁটেই চলে যাবে। ধীরে-সুস্থে গেলে দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাবে। ওখানে এক রাত থেকে পরদিন ভোলাহাট। এভাবেই প্রতিদিনের গণ্ডি থেকে বেরুতে হয়, বেরিয়ে খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া পাখির মতো মগডালে গিয়ে বসতে পারে। এই মগডালে বসার জন্য ও আকুল হয়ে তাকে। চৌরাস্তা পর্যন্ত এসে ও নিজেই আজিজকে নিষেধ করে, আর আসতে হবে না। যা ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে নে। আজিজ হাসে, ঘুমের কথা তুই ভুলিসনি দেখি? আজমল ওকে জড়িয়ে ধরে, যাইরে। আবার কবে আসবি? জানি না। আজমল মুখ ঘুরিয়ে বলে। তারপর হাঁটতে আরম্ভ করে। কোনার মহুয়া গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে আজিজ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। আজমল দূর থেকে হাত নাড়ে। তারপর পথের বাঁকে মিলিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

মল্লিকপুরে ও যখন ছমির আলির বাড়িতে পৌঁছে, তখন ছমির আলি উঠোনে দাঁড়িয়ে কাজের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। আজমলের মনে হয়, ছমির আলির স্বাস্থ্য কিছুটা ভেঙেছে, ঈষৎ ক্লান্ত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আজমলকে দেখে খুশি হয়ে ওঠে। দ্রুত এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে।

কতদিন পর দেখা? কেমন আছো?

ভালো, আপনি ভালো তো?

ছমির আলি এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলে, হ্যাঁ, ভালো।

এই দ্বিধা আজমলের দৃষ্টি এড়ায় না। বুড়োর কি ভাঙার পালা এলো? নইলে এই পরিবর্তন কেন?

কোথা থেকে এলে? বাড়ি থেকে?

না, রামচন্দ্রপুরহাট।

বুড়ো একগাল হাসে, রমেনের বিয়ে খেয়ে এলে বুঝি?

আজমল মাথা ঝাঁকায়।

চলো বিশ্রাম নেবে। থাকতে হবে কিন্তু কয়েক দিন।

না, না কালই চলে যাব। অনেকদিন বাড়ি ছাড়া।

ও।

ছমির আলি অকস্মাৎ চুপ করে যায়। বুক-ফুঁড়ে নিঃশ্বাস পড়ে।

রতন কেমন আছে? মামী?

দেখবে নিজের চোখে। আগে গোসল সেরে খেয়ে-দেয়ে নাও।

ও বুঝতে পারে, সংসারে বড় ধরনের গোলমাল হয়েছে। নইলে ছমির বুড়োর এমন করার কথা নয়। ওর মন খারাপ হয়ে যায়। এই বুড়োকে ও এমন দেখতে চায়নি। এমন দেখা উচিত নয়। পরক্ষণে হেসে ফেলে, উচিত-অনুচিত দিয়ে কি দিন যায়? দিনগুলো বড় নির্মম, কেড়ে রাখে মেলা

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু। ছমির বুড়ো আসলেই বুড়ো হয়ে গেল। কোনো রকমে গোসল সেরে খেতে বসলে ও অবাক হয়, চিংড়ি মাছ দিয়ে ডাঁটা-চচ্চড়ি আর ডাল, ওর জন্য একটা ডিম ভাজা হয়েছে।

আপনি খেয়েছেন মামা?

হ্যাঁ। তারপর একটু থেমে বলে, এখন আর খাওয়া-দাওয়া ভালো লাগে না। ওরা নিজেরা বুদ্ধি করে যা রাঁধে, তাতেই আমার হয়ে যায়। আজমলের মনে হয়, ওর গলায় ভাত আটকে যাচ্ছে। এই ছমির বুড়োকে ও দেখতে আসেনি।

মামীকে খাইয়েছেন?

বুড়ো কথা বলে না। দ্রুত হাতে ওকে কিছু তরকারি উঠিয়ে দেয়। ওর ভীষণ খিদে ছিল। গপ্‌গপিয়ে অনেক ভাত খেয়ে ফেলে। খাওয়া শেষে ছমির বুড়ো বলে, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

না। আজমল আপত্তি করে। এই অবেলায় ঘুমুব না। নিজেকে খুব স্বার্থপর লাগছে। আগে মামীকে সালাম করে আসি।

সালাম করবে?

ছমির আলি ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ওকে ডাকে, এসো। ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই কেঁপে ওঠে ওর বুক। শূন্য চৌকি, বিছানায় পাতা নেই। ও বুড়োর মুখোমুখি হয়, মামী?

বুড়ো ওপরে হাত তোলে, মুখে কিছু বলে না। আজমল আবার চৌকির দিকে তাকায়। বহু ব্যবহারে আম কাঠ কালো হয়ে গেছে। মাঝখানে ফাঁক হয়ে আছে। ওর মনে নেই যে, এখানে কি রঙের বিছানা পাতা ছিল। ও বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, মনে হয়, ছমির আলি বুড়ো হয়নি, ও ভুল বুঝেছে। এখনো মৃত্যু নিয়ে প্রচণ্ড কৌতুক করার ক্ষমতা ওর আছে। বুড়োর সবটাই ব্যতিক্রম। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েনি। নির্বিকারভাবে ওকে আপ্যায়ন করেছে। কেমন করে সম্ভব?

দেখছো কি?

আজমল উত্তর দেয় না।

ভাবছো আমার চোখে পানি নেই কেন?

না তা নয়। রতন কোথায়? ভাবী, ছেলেমেয়েরা?

দেখবে এসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছমির আলি ওকে নিয়ে রতনের ঘরে আসে। ও একা, আশেপাশে কেউ নেই। চৌকির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রতন। হাড্ডি ক'খানা বিছানার সঙ্গে লেগে গেছে, কোটরগত চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। ওদের সাড়া পেয়ে ফিরে তাকায় না। আজমল ছমির আলির হাত চেপে ধরে, কি হয়েছে রতনের?

পঙ্গু হয়ে গেছে।

ভাবী কোথায়?

ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছে।

এই অবস্থায় রতনকে একা রেখে? ওকে কে দেখছে?

আমি দেখছি।

আজমল রতনের মুখের ওপর ঝুঁকে ডাকে, রতন? সাড়া নেই। একইভাবে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ছাদে।

ও কথা বলে না?

ইচ্ছে হলে বলে। ওর বুকে যখন আগুন জ্বলে ওঠে, তখন ও আমাকে গালাগাল করে, অভিশাপ দেয়।

দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ঘরের বারান্দায় পাতা কাঠের বেঞ্চির ওপর বসে। বুড়োর উরুর ওপর দুহাত। আজমল মুখের দিকে তাকায় না। ভাবে, হয়তো ওখানে কিছু দেখবে, যে দেখা ওর জন্য ভালো হবে না, যে দেখার জন্য অনুতাপ হবে সারা জীবন। ওর গলা বন্ধ হয়ে থাকে, বুঝি কথা বললে ঝরঝর কান্না বেরিয়ে আসবে। ওর ইচ্ছে করছে, এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে। চুম্বকের মতো এক অসাধারণ শক্তি ওকে কাঠের বেঞ্চে জাপটে ধরে রাখে। ওর সাধ্যি নেই নড়ার। তখন বুড়োর গলা ঘড়ঘড় করে ওঠে, রতন আমার মতো হতে পারে না কেন এজন্য ওর বউ ওকে খুন করতে চেয়েছিল। আজমল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আচমকা বুড়োর মুখের দিকে তাকায়। এমন কিছু শুনবে ও ভাবতেই পারেনি। ওর শরীর শিরশির করে। একজন মানুষের জীবনে এতকিছু পাওনা হয়? কি অপরাধে এই মানসিক পীড়ন?

সেই একই ভঙ্গিতে ঘড়ঘড়ে গলায় বুড়ো গল্প বলতে শুরু করে, একদিন বারান্দায় বসে আছে, শুনতে পাই, রতন আর তারাবানু তারস্বরে ঝগড়া করছে। এমন ঝগড়া ওদের প্রায়ই হয়। এসব আমি গায়ে মাখি না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানারও চেষ্টা করি না যে কি হয়েছে। আমি জানি যে আমি যেমন বাবার স্নেহ পাইনি, তেমন বাবা হতেও পারিনি। রতন আমার বশ নয়। ও ওর মতো চলে, আমার ধার ধারে না। আমিও ওর জন্য তেমন কোনো টান অনুভব করিনি, যে টান দিয়ে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। আমি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি সব সময়। পরক্ষণে চিৎকার শুনে চমকে উঠি আমি। দৌড়ে গিয়ে দেখি, তারাবানু ধারালো বটি বসিয়ে দিয়েছে রতনের কাঁধে। আমি পৌঁছতে পৌঁছতে আরেকটা কোপ পড়ে পিঠে। ওর একটাই কথা, তোমাকে নিয়ে আমার জীবনে শান্তি হলো না। তুমি তোমার বাপের মতো হতে পারো না?

রতন উঠোনে পড়ে গোঙাচ্ছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। তারাবানু ঘরে চলে গেছে। ছেলেমেয়েরা আমার কাছে দৌড়ে আসে।

ও দাদু, মা বাবাকে খুন করে ফেলেছে।

আমি হাঁকডাক ছুটোছুটি করে প্রথমে শেয়ালমুথার পাতা ছেঁচে ক্ষতস্থানে লাগাই। তারপর গরুর গাড়ি যোগাড় করে হাসপাতালে রওনা করি। গাড়িতে রতনের চোখ উল্টে গোক শাদা হয়ে যায়, কালো মণি ঠিকরে বেরুতে চায়, তখনো ও পুরো অজ্ঞান হয়নি। ক্ষিপ্র হাতে আমার কব্জি খামচে ধরে। গোঙানির মতো অস্ফুট স্বরে বলে, শকুন মরেও না।

জানো, ঐ কথা শুনে আমার একটুও দুঃখ হয়নি, ওর জন্য আমার মনের মধ্যে ব্যাকুলতার জন্ম হয়। ওর মাথা আমার কোলে। ক্ষত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। মনে হয়, আমার জন্য আমার বাবার হয়তো এমন ব্যাকুলতা ছিল, কিন্তু কোনোদিন প্রকাশ পায়নি। বাবা আমাকে ভালোবাসতো, এটা ভাবতেই প্রচণ্ড সুখ হয় আমার। তখন আমি নিজের মধ্যে ডুবে যাই। মমতায় রতনের কপালে হাত বুলাই, ওর মুখে যন্ত্রণার ধ্বনি, যেন আমাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি বৌকে ভালোবাস না ছমির আলি?

বাসি।

শান্তিকে?

বাসি।

কেমন করে?

সারা জীবন আমিও ভেবেছি কেমন করে? কিন্তু দেখেছি সম্ভব, একদম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভব। একজনকে বুকের গভীরে লুকিয়ে রেখে অন্যজনকে জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে। দুজনই আমার কাছে সমান প্রিয়।

এই বিশ্বাসে স্থির হয়ে আমি স্বস্তি পাই। আমার বুকের ভার নেমে যায়। আমি ঠিক করি, সুস্থ হয়ে গেলে পুরো সংসার ওর হাতে তুলে দেব, যদি তারাবানুর সুখ হয়।

কিন্তু দু মাস পর ওকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলাম ঐ অবস্থায়। ও এখনো আমাকে ঘৃণা করে। আমি এখন কি করি বলো তো? আমি তো চাই, ছেলে আমার মতো হয়ে ওর স্ত্রীকে সুখী করুক, নিজেও সুখী হোক। ও কি আবার স্বাভাবিক হতে পারবে?

কাজের লোকটি কি যেন জানতে এলে বুড়ো ওর সঙ্গে উঠোনে নেমে যায়। আজমল একা একা বসে থাকে। ও কিছু ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। ওর ভীষণ দুঃখ হয়। ইচ্ছে করে, ছমির আলির বুক চিরে দেখতে? কি হচ্ছে ওখানে? কেমন ঐ জায়গাটা? শাদা, কালো, না লাল? সমান, এবড়ো-থেবড়ো, না পাহাড়ি? না কি সমুদ্র ওটা? যত পচা-গলা ওর মধ্যে তলিয়ে যায়? সমুদ্র আজমল দেখেনি। বইয়ে পড়া একটা ধারণা থেকে ও ছমির আলিকে সমুদ্রই ভেবে নেয়। একজন মানুষের জীবনের এই ওলোট-পালোটে ও অভিভূত হয়। ছমির আলি কাজ শেষ করে আবার ফিরে আসে। আজমল তড়িঘড়ি করে বলে, কাল সকালে আমি রওনা করব।

না।

বুকের গভীর থেকে গাঢ় স্বরে উচ্চারণ করে ছমির আলি। না, তুমি যেতে পারবে না। দুটো দিন আমার সঙ্গে থাকো।

আশ্চর্য মিনতিভরা কণ্ঠ। আজমল দেখে, বুড়োর চেহারায় নতুন পলি পড়েছে। বুড়োর নরম, মোলায়েম দৃষ্টিতে অবারিত সরষে ক্ষেতের হলুদ ছায়া, ওখানে ফসলের অপেক্ষা নেই, আছে সমর্পণ। হলুদ ফুলের রেণুতে মাখামাখি হয়ে যায় আজমলের দৃষ্টি। ও চোখ ফেরাতে পারে না।

কি, থাকবে না?

আজমল মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলে থাকব। ওর মনে হয়, বুড়োর এখন ওকে খুব প্রয়োজন।

ছমির আলি খুশি হয়ে উঠোনে নেমে যায়। ওর এখন অনেক কাজ। আজমল বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায়। বাবার কথা ভুলে যায় ও। মল্লিকপুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে সোজা যে রাস্তাটা ভোলাহাটের দিকে গেছে, তার দুপাশে অসংখ্য তুঁতগাছ। রাস্তার পরে তুঁতক্ষেত, মাটি লাল। এই রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়িতে করে জোহরা শ্বশুরবাড়িতে গেছে। জোহরার কথা মনে এলো কেন? ও কি একবার জোহরার শ্বশুরবাড়িতে যাবে? দেখবে কি, কেমন আছে? বড় ইচ্ছে হয়। পরক্ষণে নিজেকে শাসন করে, না থাক। জোহরা কুতুবকে পায়নি। ওর দৃষ্টিতেও হয়তো হলুদ সরষে ফুলের ছায়া ভাসে। ঐ ছায়া ও দেখতে চায় না।

ও ঘুরে-ফিরে বারান্দায় এসে বসে। দেখে, ছমির আলি রতনের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে। একটু পর শুনতে পায় চিৎকার, না, আমি খাব না। কে তোমাকে ভাত আনতে বলেছে? বুড়ো শকুন।

আজমল রতনের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। সারা ঘরে ভাত ছিটনো, থালা-বাটি মেঝেতে উল্টে পড়ে আছে। ছমির আলি নত মুখে বেরিয়ে আসে। আজমলকে দেখে ফিকে হাসে, দেখো, ও কেমন করে আমার কলজেটা খুবলে খাচ্ছে!

আজমল দৃঢ় কণ্ঠে বলে, কেউ খুবলে খেতে পারবে না। ওটা তো সমুদ্র।

ছমির আলির দৃষ্টি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সেখান থেকে প্রখর আলো বিচ্ছুরিত হয়। আজমলের মনে হয়, এটাই সত্যি, আর সব মিথ্যে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

আজমল বেশিক্ষণ নিজের মধ্যে রাগ ধরে রাখতে পারে না। প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে দেখেছে, বড় জোর সাতদিন, তারপর আপনা থেকে থিতিয়ে যায়। কিছুটা দার্শনিক ভাবনায় আক্রান্ত হয়ে ভাবে, মানুষকে ক্ষমা করে দিলেই স্বস্তিতে থাকা যায়। আজিজ বলে, প্রবল জেদ না থাকলে বড় কিছু করা যায় না। কে জানে, হয়তো সত্যি। ও কখনো বড় কিছু করতে চায়নি বলে এদিকটা ভেবে দেখেনি। ও খুব সাধারণ, নিরীহ, গোবেচারা। শুধু বাবার প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ আছে। ওর ধারণায়, লোকটা জন্মগতভাবে অসৎ, হারমিপনা মজ্জাগত। না, কোনো আক্রোশ থেকে আজমলের এ উক্তি নয়। অনেক ভেবে-চিন্তেই ও এ সিদ্ধান্তে এসেছে। মানুষকে ও দোষ-ত্রুটি মিলিয়েই বিচার করে এবং ভালো করেই বোঝে, কেউ এর উর্ধ্বে নয়। ফেরেশতা হওয়া যেমন কঠিন, ইবলিশ হওয়াও তেমনি। দুই ক্ষেত্রেই মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে। প্রচণ্ড খারাপ হওয়ার পরও মানুষের কোথাও না কোথাও শুভবুদ্ধি থাকে, এটা আজমলের বিশ্বাস। কিন্তু বাবা সম্পর্কে এমন একটি সিদ্ধান্তে এসে ও কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছে। কখনো ভাবে, এমন সিদ্ধান্তে না এলেই হতো, কখনো ভাবে, যা ভেবেছে, এটাই ঠিক। নিজের সঙ্গে এই দ্বন্দ্ব ও ওর স্বভাব। আজিজের অনেক বকুনি খেয়েও কাটিয়ে উঠতে পারে না।

পলুঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেঘ দেখে আজমল, এমন নিকষ কালো মেঘ অনেক দিন দেখেনি। বৃষ্টি নামলে নামতেও পারে। ওর অভিজ্ঞতায়, এমন কালো মেঘের উড়ে যাবার আশঙ্কাই বেশি। কেমন টুকরো টুকরো হয়ে দ্রুত সরে যায়, তারপর ছাতলা-পড়া রঙ ছড়িয়ে থাকে আকাশজুড়ে। আজও কি এমন হবে? ও এক পা বারান্দার নিচে নামিয়ে হাতের তালুতে চোখ আড়াল করে আকাশ দেখে। সময় মতো কোনো কিছু বুঝতে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারলে ওর শরীর ভার লাগে। ঘাড়ের রগে টান পড়ে। আজমল দাঁতে আঙুল কামড়ে ধরে রাখে। ও এখন ঘরে ফিরবে। অথচ বুঝতে পারে না যে পলু-ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করবে কি না। বৃষ্টির সময় ঘরের দরজা-জানালা খোলা থাকলে পোকার ক্ষতি হবে। সাত-পাঁচ ভেবে ও বারান্দার ওপর বসে পড়ে। একটু পরই আকাশ থেকে দ্রুত মেঘ সরে যায়। বৃষ্টি বোধ হয় হবেই না। আসলে এখন তো অগ্রহায়ণী বন্ধের সময়। বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বৃষ্টি আজমলের ভালো লাগে না, ওকে মনমরা করে দেয়। একমাত্র আনন্দ, যদি আকাশে রংধনু ওঠে।

এখন ওর হাতে কাজ নেই। একটু আগে তুঁতের কচি পাতা কুচিকুচি করে পলুর ডালার ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে। ও চিকন কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচায়। দুপুরে শোল মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছে। ঢেকুরের সঙ্গে সেই গন্ধ উঠছে। এ এক বিশ্রী অবস্থা, কী যে বাজে লাগে! অথচ ঢেকুর না উঠলে খুব অস্বস্তি হয়, বুক জ্বলে, পেট ভার থাকে। মাছগুলো গতকাল নিজেই ধরেছিল। বড় বড় দশটা, অনেকদিন বৃষ্টিতে এমন খ্যাপ ওঠেনি। খাওয়ার সময় খুব আয়েশ করে খেয়েছে, এখন কেমন বমির ভাব হচ্ছে। ও বারান্দায় পায়চারি করে। নিজের ওপর রাগ হয়। অতগুলো মাছের টুকরো না খেলেই পারত। ঘরে ওর দুজন মা, দুজনেই ওকে বেশ যত্ন করে। ও বোঝে, সংসারের বড় ছেলে বলেই এই যত্ন, ভালোবাসা থেকে নয়। সত্যি কি তাই? কেন ভাবছে, ভালোবাসা থেকে নয়? ভালোবাসা থেকেও তো হতে পারে? কেন ও এত ছোট চিন্তা করছে? আসলে মানুষকে খুব ছোট করে দেখতে ওর ভালো লাগে না। মানুষের নীচতা ও দীনতা ওকে কষ্ট দেয়, যে কষ্টে ওর বিশ্বাস নির্বাপিত হয়ে আসতে চায়। এজন্য ও এসব বাজে ধারণাগুলো পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। ওর দুজন মা কখনো ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। এটুকুই ওর বড় করে দেখা উচিত। নিজেকে এই ছোট চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য ও বারান্দা থেকে নেমে আসে। আকাশে মেঘ একদম নেই, হালকা রোদ চারদিকে। সন্ধ্যা হতে এখনো অনেক দেরি। ও হাঁটতে হাঁটতে তুঁতের জমিতে আসে। বড় একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কালো রঙের দু-চারটে টুসটুসে পাকা ফল পেড়ে মুখে পোরে। ছোট্ট এই ফলগুলো খেতে ওর মাঝে-মধ্যে ভালোই লাগে। মুখে দিলে গলে যায়, ছেলেবেলার লজেন্স খাবার মতো অনুভূতি। সব মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে বোধহয় একধরনের বালক থাকে। যত বয়সই বাড়ুক, সে কখনো হারিয়ে যায় না। ও মুঠিতে বেশ কতকগুলো ফল নিয়ে গাছের ফাঁকে হাঁটে। দুপাশে সারি করে লাগানো গাছগুলো বেশ খানিকটা বেড়ে উঠেছে। পাতা বেশি পাওয়ার জন্য ওর বাবা বেশির ভাগ জমিতেই তুঁতের ঝোপ চাষ করে। ও গাছ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে হাঁটে। লক্ষ্য করে, কোনো পোকার আক্রমণ হয়েছে কি না। না, পাতাগুলো সতেজ-সবুজ, পোকা লাগেনি। পোকা না লাগলেই স্বস্তি, নইলে লোকসান যেমন, তেমনি খাটুনিও বেড়ে যায়। আর মাস দুয়েক পর জমিতে সেচ দিতে হবে। পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত মাসে অন্তত একবার জমিতে সেচ দিতে হয়, দিলে পাতার ফলন ভালো হয়। সেচের কথা ভাবতে ভাবতে ও জমির শেষ মাথায় আসে। এখন অঘ্রাণ, এই সময়টা ভালো। শীত নামলে গাছে ছত্রাক জাতীয় রোগ হয়। তখন পাতার গায়ে, বিশেষ করে নিচের দিকে, শাদা-শাদা পাউডারের মতো মড়ি পড়ে। পাতাগুলো খুব তাড়াতাড়ি হলদে হয়ে যায়। এখন থেকে এই রোগ ঠেকানোর কথা ভাবতে হবে। আগেভাগে এসব না ভাবলে হয় না, ওর মাথার ভেতর নানা কিছু কাজ করে। গুছিয়ে কাজ করা ওর স্বভাব, এলোমেলো কোনো কিছু ওর পছন্দ নয়। গন্ধক মেশানো চুন, তুঁতিয়ার পানি কিছুই ঘরে নেই। এগুলো কিনতে হবে। ছত্রাক মারতে হলে এগুলো সবচেয়ে উপকারী। উপকারীও আজমলের হাসি পায়। এই শব্দটি ওর একটুও ভালো লাগে না। জীবনের কত কিছুই তো উপকারী। উপকারী জিনিস ছাড়া কি জীবন চলে? যেমন আছিয়া ওর বাবার জীবনে এক ভয়ানক উপকারী বস্তু। এই বস্তুটি ছাড়া বর্তমানে ওর বাবা অচল এবং নিষ্ক্রিয়। এবং এই একই কারণে ওর সঙ্গে বাবার সম্পর্ক অত্যন্ত শীতল। অবশ্য এই শীতলতা ওর দিক থেকে যতটা প্রবল, ওর বাবার দিক থেকে ততটা নয়। কারণ ও যা বিশ্বাস করে, ওর বাবা তা করে না। ওর ধারণার সঙ্গে বাবার ধারণার কোনো মিল নেই এবং সে অনেক কিছু হেসে উড়িয়ে দেয়। আজমলের মতে, কিছু কিছু প্রয়োজন থাকে, যা প্রতিটি মানুষেরই জোর করে খারিজ করে দেয়া উচিত। নইলে সামাজিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ইত্যাদি অনেক মৌল বোধ নষ্ট করে। এসব নষ্ট হলে একত্রে বসবাস অর্থহীন। ও নিজস্ব ধারণায় মানুষের শ্রেণীবিভাগ করে, সে অনুযায়ী ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে। রিপুতাড়িত মানুষ ওর কাছে সবচেয়ে নিচু স্তরের। এই স্তরে ওর বাবা পড়ে। মানুষ অশিক্ষিত হয়, দারিদ্র্যপীড়িত হয়—ইত্যাদি আরো অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে স্খলিত হলে তার মেরুদণ্ড সোজা থাকে না। ও এমন বাবা চায়নি, যাকে নিয়ে গর্ব করা যায় না, বলা যায় না, আমার বাবার মতো মানুষ হয় না। যার এমন বাবা নেই, তেমন ছেলের সুখ কোথায়? তাই ওর বুকের ভেতর প্রচণ্ড দুঃখ আছে। এই দুঃখকে ও টিয়াপাখি বলে। যখন দুঃখের দহন ভালো লাগে, তখন মনে হয়, সুন্দর, লাল-ঠোঁট এবং সবুজ মসৃণ পালকের মতো সুন্দর। অথচ চরম নিষ্ঠুরতায় অনবরত ঠুকরে গেলে ওর বুক ঝাঁঝরা হয়ে থাকে। ও দুঃখ ভুলতে চায়।

ওর বাবা ইয়াসিন। ভোলাহাটের সবাই ইয়াসিন বসনি বলে জানে। এলাকার সবচেয়ে বড় রেশম চাষি। ষাট বিঘা জমিতে তুঁত চাষ করে। সবচেয়ে ভালো গুটি হয় তার ঘরে। আর সুতোর তুলনা হয় না। প্রচুর সুতো চলে যায় মুর্শিদাবাদে। মহানন্দার এপার-ওপার, ছোট নদী, এপার থেকে তাকালে ওপারের সবকিছু চোখে পড়ে। আর গিলাবাড়ী সড়ক? ওটা ইয়াসিন বসনির কেনা। যা বলে, তা-পানে। ইয়াসিন বসনির অভাব নেই বলে প্রয়োজন আকাশ-সমান। মেটা মেটাতে যে কোনো পথই অবলম্বন করতে পারে। ছেলে-মেয়ের মান-সম্মান তোয়াক্কা করা না করা তার কাছে কিছু না। আছিয়ার সঙ্গে তার গোপন সম্পর্কের কথা আর গোপন নেই, ভোলাহাটের নারী-পুরুষ কমবেশি সবাই জানে। আজমল এই ব্যাপারে রুষ্ট, কখনো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাবার সামনে এসব বলার সাহস নেই। ওর যত যন্ত্রণা নিজের সঙ্গে, যত পীড়ন নিজেকেই। ও চুপচাপ, নিরীহ গোবেচারা ছেলে। নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণা আছে, সেগুলো লালন করতে ভালোবাসে এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চায়। কখনো প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খায়, নিজের ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়। যন্ত্রণায় দিন গড়ায়, উপায়হীন দিন। এই নিরুপায় জীবনযাপন করতে হয় বলে কখনো ওর পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কোথায় যাবে? ও জানে না, কোথায় যাওয়া যায়? ভেবে পায় না যে বৃত্ত ভাঙার সাহস কি ওর আছে? ও একজন কর্মঠ যুবক, গাঁয়ের কেউ কেউ ওরে ভালো স্বাস্থ্যের জন্য ওকে বলে, কোয়ান মরদ। এতকিছু সত্ত্বেও ওর পালানোর সাহস নেই। জীবনকে ও তছনছ করে ছিঁড়েখুঁড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলতে পারে না। ও এতই গোবেচারা যে বড় কিছু ভাবতে গেলে ওর মাথা ঝিমঝিম করে। সেই ভাবনার সঙ্গে যদি অন্য ভাবনার সংঘর্ষ হয়, তবে ও একদম দুর্বল হয়ে যায়। ভাবনার বাহ্যিক প্রকাশে বিড়ম্বিত, বিব্রত হয়। তাই সংঘর্ষে না গিয়ে ও নিজস্ব বিশ্বাস আঁকড়ে রাখতে ভালোবাসে। ও ইয়াসিন বসনির ছেলে, এটাই বড় পরিচয়, চাইলেই হুট করে কিছু করতে পারে না। অন্যেরাও ইয়াসিনের ভয়ে ওকে সাহায্য করতে আসে না। ফলে প্রায়ই নিজেকে একা ভাবে। ও হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর আসে। এখান থেকে তুঁতের জমিকে একটা বিশাল সবুজ সমুদ্রের মতো মনে হয়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে অনেক সময় দুঃখ কেটে যায়। একঝাঁক সাতভাই পাখি আলের ওপর কিচিরমিচির করছে। ধূসর রঙের এই পাখিগুলো এই এলাকায় প্রচুর। পাখিগুলোর ডাকাডাকিতে ও বিরক্ত হয়। একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলে পাখা ঝাপটে উড়ে যায়। কয়েকটা একটু দূরে গিয়ে আবার আলের ওপর ফিরে আসে। গলা উঁচিয়ে ওকে দেখে। অকস্মাৎ এই ক্ষুদ্র জীবনগুলোর মাঝে নিজেকে বড় বেমানান মনে হয়। মন খারাপ হয়ে যায় এই ভেবে যে ও সব জায়গাতেই বেমানান। ও হাঁটতে আরম্ভ করে। ওর এই চুপচাপ থাকা, কিছুটা দার্শনিক উদাসীনতা, সব মানুষের জন্য একধরনের মোহের কারণে ওর বাবা ওকে পছন্দ করে না। তার মতে, পুরুষ মানুষ হবে পুরুষের মতোই, জওয়ানকিতে ভরে থাকবে শরীর এবং মন। যেমন কাজ করবে, তেমন ফুর্তি করবে। কিসের পিছুটান, কিসের বাজে ভাবালুতা? জড়িয়ে পড়বে যেমন অনায়াসে, ছিঁড়বে তেমনি সহজে। পুরুষ মানুষ নিজের রাজ্যে হবে রাজা, নইলে কিসের তার পৌরুষ? এই দর্শন আজমল বিশ্বাস করে না। নিজের প্রতি এই এতটা ভাবনাকে ও অন্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে। ও সবাইকে নিয়ে থাকতে চায়। দরকার হলে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে হলেও। বাবার সঙ্গে এখানেই ওর বিরোধ। তবু এই মিলহীন জীবনযাপন ওর জীবনে অবধারিত। বহুবার ভেবেছে, পালিয়ে নাচোল যাবে ওখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। মামাদের কাছে দুবার কথাটা বলেছিল, কিন্তু দুমামার কেউই এতে রাজি নয়। বিশেষ করে ছোট মামা বেশি। সে ভীষণ বৈষয়িক, তার হিসেবে চুলচেরা ফাঁক নেই। বলে, 'বাপের অতবড় সম্পত্তি রেখে এখানে থাকা চলবে না। আমাদের কথা না শুনলে তোমার কপালে দুঃখ আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা।' মামারা ওকে যত আদরই করুক, বাবার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে দিতে রাজি নয়। তার ওপর ঘরে নিজের মা নেই। জন্মের সময়ই মা মারা যায়। বারো বছর পর্যন্ত ও মামার বাড়িতে বড় হয়েছে। তারপর বাবা ওকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। ও আসতে চায়নি, কিন্তু মামারা জোর করে পাঠিয়েছে। ওর ছোট মামার ধারণা, এমনিতেই মা না থাকলে, ছেলেমেয়েরা বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যায়, তার ওপর একদম কাছে না থাকলে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারায় সাংঘাতিক বিপর্যয় হয়ে যেতে পারে। ওর মামা নাসির আলি পাকা জোতদার, জমি তার প্রাণ। প্রতিবছর কিছু না কিছু জমি বাড়ায়, নইলে তার স্বস্তি থাকে না। সবার সঙ্গে মেজাজ করে, বড় ভাই মকবুল এবং শেফালির সঙ্গেও। শেফালি তার স্ত্রী, দুজনের ভালোবাসার বিয়ে। জমির ব্যাপারে ওর ছোট মামা কেন যে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে, এটা আজমলের মাথায় ঢোকে না। শেফালিও সমানে মুখে মুখে জবাব দেয়, বাঁধে তুমুল ঝগড়া। তখন পাড়া বাড়ি চুপ হয়ে যায়, যেমন চুপ হয়ে থাকে নাচোলের বর্গাচাষিরা প্রভাবশালী জোতদার নাসির আলির দাপটে। কিন্তু এখন শেফালির মতো সবাই মুখ খুলতে শিখেছে, শুরু হয়েছে অসন্তোষ। তাই ওর বাবা তেভাগা আন্দোলনের ঘোরবিরোধী। এসব নিয়ে আজমল অবশ্য বেশি ভাবে না, এসব ভাবে আজিজ, ও একদম ভিন্ন ধাতুর ছেলে। ওখানকার আরো আকর্ষণ ইলা মিত্র, মাতলা সর্দার, জমিদার বাড়ির আমবাগানের শীতল ছায়ায় ঘুরে বেড়ানো, রাতে যাত্রা শোনা এবং কৃষক আন্দোলনের প্রস্তুতি। এসবের মধ্যে জীবনকে ছড়িয়ে দিলে ওর দুঃখ কমে। তবে ছোট মামার ভয়ে ওর যখন-তখন যাবার সাহস নেই। মাঝে-মধ্যে আজিজ খবর পাঠালে হুট করে চলে যায়, দুচার দিন থেকে চলে আসে। বর্গাচাষিদের পক্ষে আজিজ কাজ করে, মনেপ্রাণে চায়, তেভাগা আন্দোলন সফল হোক। ও ওর বাবাকে ঘৃণা করে। বলে, একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। চাষিরা যদি ওদের বাড়ি আক্রমণ করে, তবে চাষিদের সঙ্গে মিশে যাবে। ছারখার করে ফেলবে বাড়িঘর। হাজার জনকে কষ্ট দিয়ে ও একা সুখে থাকতে চায় না। আজিজের কথা শুনলে আজমলের ভয় করে। ওর সব সাহস উবে যায়। ও বুঝতে পারে, কথা বলার সময় আজিজের চেহারা অন্যরকম হয়, ও হিংস্র এবং নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। মানুষকে এমন হতে দেখলে ওর কষ্ট হয়। নিজের ভেতর জোর পায় না। এই পড়ন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকেলে নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে ওর আজিজের কথা মনে হয়। অনেক দিন ও কোনো খবর পাঠায়নি, কেমন আছে? বর্গাচাষিদের সঙ্গে কি বেশি ব্যস্ত? না কি মাতলা সর্দারের সঙ্গে সাঁওতাল এলাকায় রয়ে গেছে? আজিজের ক্ষমতা আছে। ও সবকিছু অবলীলায় ছেড়ে দিয়ে নিজের বিশ্বাসের রাস্তায় নেমে যেতে পারে। ও বাবার সম্পত্তির তোয়াক্কা করে না। ও আজিজের মতো হতে পারে না। ওর গায়ে যত শক্তিই থাক, মনের দিক থেকে ভীরু। আজিজ খুব ভালো ছেলে, খুব। ও হাঁটতে হাঁটতে আছিয়ার বাড়ির পেছন দিকের পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়ায়। জায়গাটা ওর ভালো লাগে। চারদিকে ঘন সবুজ কচুবন আছে, পাতাগুলো কালচে হয়ে উঠেছে। কখনো এখান থেকে সাপ বেরোয়, বেশির ভাগই ঢোঁড়া, আজমলের ভয় করে না। পুকুরের অপর পাড় থেকে আছিয়ার ভেরেণ্ডা গাছের এলাকা শুরু। আছিয়ার সঙ্গে ওর বাবার সম্পর্কের কথা শুনলে ওর ছোট মামা হেসে উড়েয়ে দেয়। বলে, বেটাছেলের এসব থাকে। না থাকলে পুরুষ মানুষ কি? তোমরা বেশি কথা বলবে না। বেশি বুঝতে চেয়ো না।

মামার এসব কথা আজমলের পছন্দ না। নাসির আলি রেগে উঠলে ওর বুক জুড়ে অভিমান হয়। এই প্রচণ্ড অভিমান কাটাতে ওর সময় লাগে। ইয়াসিন বসনির প্রথম পক্ষের ছেলে ও, নানীর আদরে ভালোই দিন কাটছিল। বাবার কাছে আসার পেছনে মামার তাড়াও কম ছিল না। তার ধারণায়, ঘরের ছেলে ঘরে না ফিরলে যদি সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায়? কেননা এর মধ্যে ইয়াসিন বসনির ঘরে আরো দুজন স্ত্রী এসেছে। দুজনের ঘরে বারোজন ছেলেমেয়ে। এই পর্যন্ত আজমলের কোনো দুঃখ ছিল না। ওর দুঃখ ইয়াসিন বসনির সঙ্গে আছিয়ার সম্পর্ক। ও বুঝে উঠতে পারে না যে, একজন মানুষের কত প্রয়োজন থাকতে পারে? নিজের মায়ের কোনো স্মৃতি ওর থাকার কথা নয়, তবু মনে হয়, ওর মা মরে গিয়ে একটা সম্মানজক অবস্থানে চলে গেছে। ইয়াসিন বসনির দেয়া অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভেরেণ্ডার গাছ-ঘেরা আছিয়ার বাড়িতে রাতের অন্ধকারে না যেতে পারলে ইয়াসিন বসনির রেশম ব্যবসা জমে না। পলু পোকায় মহামারী লাগে, তুঁত গাছে পোকা ধরে, মুগা সুতো কাটা হয় না। আজমলের ধারণায় অবস্থাটা এমন। আছিয়া সুন্দরী, শ্যামলা, টানা চোখ। কেড়ে রাখে হৃদয়। ভোলাহাটের বাজারের সেরা জিনিসগুলো ইয়াসিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসনির চাই, সুতরাং বিধবা আছিয়াকে তার হতেই হবে। ও এই প্রসঙ্গ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পুকুরপাড় ছাড়িয়ে রাস্তায় নেমে আসে। ওর এই এত বয়সে ও দেখেছে, ওর বাবা কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেনি। এটা তার একটা বড় গুণ। এজন্যই ওর মনে হয়, আছিয়ার বাড়ির ভেরেণ্ডা গাছগুলো অত্যন্ত জোরালো এবং সতেজ হয়ে বাড়ে। ঐ বাড়ির মাটিতে কি ভিন্ন রস আছে, না কি আজমল ঐভাবে দেখে? এটা তো সত্যি, কোথাও কোথাও ভিন্ন ভিন্ন বস্তু আলাদাভাবে প্রাণ পায়? যেমন নাচোল থানার রামচন্দ্রের হাটে গেলে ওর মনে হয়, নিজস্ব জায়গায় এলো। আর এই ভোলাহাট থানার ঝাউবনা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েও নিজেকে উদ্বাস্তু মনে হয়। কেন এমন হয়? কেন নিজের বাসস্থানে পরবাসী লাগে? সন্ধ্যা হয়েছে। হাতের বাঁয়ে থানা রেখে ও সামনে এগোয়। সরু রাস্তার দুপাশে ঘর। ছোট ছোট ইটের ঘর। এখনকার ইটের চাইতে একদম আলাদা। কত বছর আগের ইট কেউ জানে না। লোকে বলে, এই এলাকা গৌড়ের শহরতলি। সে-জন্য এমন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এক সময় রেশমের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল।

বাজারে আশিক আলির সঙ্গে দেখা হয় আজমলের, সম্পর্কে চাচা, ওর পছন্দের মানুষ। দেখা হলেই বিগলিত হয়ে যায়।

বাপু কোথায় যাচ্ছো?

আশিক আলি হলুদ দাঁত বের করে হাসে। হাসিটা বড় আন্তরিক মনে হয় আজমলের। আশিক আলি আজমলের চাইতে তিন-চার বছরের বড়। কাছাকাছি বয়সের কারণে কিছুটা বন্ধুর মতো। অবলীলায় মনের কথা বলে, প্রবল আবেগে কেঁদে ফেলে। নিজের দুঃখের কথা না বলে স্বস্তি পায় না। আজমল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, কোথায় আর যাব চাচা, যাচ্ছি বাপের গোয়ালে।

গোয়াল কেন?

খৈল-বিচালি খাবার জন্য।

দুজনে হো-হো করে হাসে। আশিক আলির সঙ্গে ও এমনই রসিকতা করে। অনেক সময় খিস্তিখেউড়ও চলে।

বাজার করবেন চাচা?

হ্যাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাচী কি কিনতে বলেছে?

ইলিশ মাছ, পেঁয়াজ।

ওহ্, মাছের দো-পেঁয়াজি হবে বুঝি?

আশিক আলি আবার হলুদ দাঁত বের করে হাসে, অকৃত্রিম সে হাসি। আজমল বিদায় জানিয়ে ভিন্ন রাস্তায় বাড়ির পথ ধরে। ও গোয়ালে ফিরছে কেন? ও কি একটা গরু? মানুষ কি গরু হয়? হয়, ও নিজে নিজেই সিদ্ধান্তে আসে। বাবা এখন ওর শ্রম দোহন করছে এবং ও নির্বিকার দাঁড়িয়ে থেকে সে দোহনের সুযোগ দিচ্ছে। নাকের সামনে মুলোর মতো ঝুলে আছে সম্পত্তি। বাবা মরার পর পাবে। ওর ছোট মামা নাসিরের হিসেবে একটা বড় রকম দাঁও। কিছুতেই হাত ছাড়া করা চলবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

বাজার পেরিয়ে আসতেই রাস্তা কিছুটা ফাঁকা। ভাঁট ফুলের গন্ধ আসছে, তীব্র এবং নাক-ঝাঁঝালো। হাঁটতে ওর ভালো লাগছে। ইচ্ছে করে, গলা ছেড়ে গান গায়, কিন্তু লজ্জায় পারে না। অন্ধকার পথঘাট, আশপাশে তেমন কেউ নেই, তবু ওর লজ্জা করে। কিসের লজ্জা? কাকে লজ্জা? মনে হয় নিজেকেই। নিজের ভেতরটা খুলে ধরার সাহসের অভাব। এজন্যই ওর বাবা ওর ওপর বিরক্ত। ওকে দিয়ে নাকি কিচ্ছু হবে না। ও রেশমের চাষ বোঝে, চমৎকার গুটি বানায়, চক্‌চকে সুতো ওঠে, তবুও ওরে বাবা সন্তুষ্ট নয়। ইয়াসিন বসনি সব সময় ওর মধ্যে পৌরুষের অভাব দেখতে পায়। এ লজ্জা নাকি একজন পুরুষের সবচেয়ে বড় লজ্জা। আজমল তোয়াক্কা করে না। ওর দর্শন ভিন্ন, ও ভিন্নভাবে বাঁচতে চায়। একথা ইয়াসিন বসনি কোনো দিনই উপলব্ধি করবে না।

ও জমিদার রামেশ্বরের বাড়ি পেরিয়ে আসে। এখন বাড়িটায় আগের জৌলুস নেই। তবু এই পুরনো এবং বর্তমানে ম্রিয়মাণ বাড়িটা ওর ভালো লাগে। কতকাল আগের তৈরি কে বলবে? চত্বরে বসে থাকলে একসময়কার রাজধানী গৌড়ের গন্ধ যেন ওর নাকে এসে লাগে। সেই সময় কী প্রসিদ্ধ ছিল জায়গাটা? জমিদার রামেশ্বর কিছুটা ভিন্ন ধরনের মানুষ ছিল। বইয়ের নেশা ছিল, প্রায় হাজার দুয়েক বই ছিল। প্রায়ই মহানন্দার পাড়ে দাঁড়িয়ে ওর বয়সী ছেলেদের গৌড়ের গল্প শোনাতো। মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্ত নাকি লিখেছিলেন, 'সুলতান হুসেন শাহ্ নৃপতি তিলক', তিনি ছিলেন গৌড়ের সুলতান। এমন করেই ইতিহাস চোখের সামনে ভেবে ওঠে, চোখ বুজলে সব দেখা যায়। বিজয়গুপ্তের লাইনটা রামেশ্বর প্রায়ই বলতেন, আজমলের ভালো লাগে। ও ভুলতে পারে না। জমিদার বাড়ি পেরিয়ে ও যখন আমবাগানের অন্ধকারে নামে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনো ঐ লাইনটা সুর দিয়ে গাইতে থাকে। তাতে অন্ধকারের ভয় কেটে যায়, গা-ছমছম করা ভয়। সেই সময় জমিদাররা যে যত সোনার পাত্র ব্যবহার করতো, সে তত ঐশ্বর্যবান বলে বিবেচিত হতো। আজমল অন্ধকারে হেসে ওঠে। মানুষের কত প্রতিযোগিতা। আসলে এসব প্রতিযোগিতা আছে বলেই এক সময় গৌড় দবদবা-রমরমা হয়ে উঠেছিল। এসব প্রতিযোগিতা আছে বলেই এক সময় গৌড় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কী বিচিত্র নেশা মানুষের! এখনকার এই জরাজীর্ণ গৌড় ওকে কষ্ট দেয়। রামেশ্বরের কাছে শুনেছে, ভোলাহাট গৌড়ের শহরতলি ছিল। ওর ইচ্ছে করে ইতিহাসের সেই সময়টাই চলে যেতে। হাঁটতে হাঁটতে ও বজরার টেকে আসে। জায়গাটা দিনে সরগরম থাকে, রাতে একদম ফাঁকা হয়ে যায়। দুটো বিশাল বটগাছ আছে নদীর পাড় ঘেঁষে। ও মোটা শেকড়ের ওপর বসে। নদীর বুক থেকে জলের বয়ে যাওয়ার শব্দ আসছে। শীতকালে নদীটা সাঁতরে ওপারে চলে যাওয়া যায়। ওপারে মালদহের ইংরেজ বাজার। ওপারের কোলাহল শোনা যায়, গাড়ির হর্ন বাজে। ও ঢাল বেয়ে নদীর কাছে নেমে যায়। পানিতে পা ডুবিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নেয়। চারদিকে যা ধুলো! কিছুক্ষণের মধ্যে জিভ চিকচিক করে। ভারি বিশ্রী ব্যাপার। ধুলো ও একদম সইতে পারে না, শরীর খারাপ করে। ও প্রাণভরে মুখে পানি দেয়, জুড়িয়ে যায় শরীর। সারা দিন পর এতক্ষণে ওর ভালো লাগতে শুরু করে। ও গুণগুনিয়ে বিজয়গুপ্তের লাইনটা গায়। তারপর লুঙ্গির নিচের অংশ দিয়ে মুখ মুছে নেয়। বটতলায় ফিরে আসতেই দেখতে পায়, কে যেন বসে আছে। প্রথমে অন্ধকারে ও চিনতে পারেনি, গা ছমছম করে উঠেছিল। আকস্মিক কোনো কিছুতে ওর ভীষণ ভয় করে, সাহস সঞ্চয় করতে সময় লাগে। প্রথম ধাক্কায় কখনোই ওর বুদ্ধি কাজ করে না। কুতুব কথা বললে ওর কাঁপুনি কমে, আজমল ভাই আমি কুতুব। আপনাকে দেখে এখানে এলাম।

ও কুতুবের কাছে এসে বসে, কি করছো?

কিছু না। আজকের হাওয়া খুব ঠাণ্ডা, না?

হ্যাঁ।

আমাদের এই নদীটাও ভালো।

আজমল কথা বলে না। এই লোকটাকে ও বুঝতে পারে না। ওর চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার কথা বলতে চায়, কিন্তু মুখে কথা নেই। আগে শেখ মুন্সীর গম্ভীরার দলে ছিল। চমৎকার গাইতে পারতো। জোহরার বিয়ের পর থেকে আর গায় না। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। টুকটাক কাজ করে। যা জোটে, তা-ই খায়। না পেলে উপোস করে।

আজমল ভাই?

বলো।

বাড়ি যাবেন না?

যাব।

তুমি যাবে না?

না।

কেন?

এমনি।

কোথায় থাকবে?

বাজারের ঐ চালার নিচে।

বিছানা?

লাগে না।

আজমল আর কথা বলে না। ও জানে, জোহরার বিয়ের পর কুতুব আত্মপীড়ন শুরু করেছে। এই পীড়নই এখন ওর সবচেয়ে বেশি কাম্য। ওকে উপদেশ দিলে ব্যঙ্গের হাসি হাসে। ওর সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ওর নিজেরই তো ছোট বোন জোহরা। বাবার জেদের কাছে বশ মেনে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে। ইয়াসিন বসনির মুখের ওপর কথা বলবে কে? কেমন আছে জোহরা? কুতুবকে ছাড়া কি ওর দিন কাটবে? আজমল আপন মনে হেসে ওঠে। মানুষ অভ্যাসের দাস, মানুষ সব পারে। আর না পারলে তো মরণ আছে। আর কিছু না হোক, ওটাকে তো ও নিজের হাতে বরণ করে নিতে পারে। ওখানে বাধা দেবার কিংবা শাসন করার কারো ক্ষমতা নেই।

হাসেন কেন আজমল ভাই?

আজমল উত্তর দেয় না। কুতুবের ঘাড়ে হাত রাখে। ওকে আপন ভাবতে ইচ্ছে করে। কোনো না কোনো মানুষ থাকে, যাকে যুক্তি ছাড়াই কাছে টানার ইচ্ছে হয়। ও এটুকু বোঝে যে, অনেক বাসনাই যুক্তির কাছে পরাস্ত হয়, হৃদয় মানতে চায় না। কুতুব এখন এমন অবস্থা অতিক্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে। ইয়াসিন বসনির মেয়েকে বিয়ে করার মতো সামাজিক অবস্থান ওর নেই, কিন্তু হৃদয় যদি এতকিছু বুঝতো?

আজমল ভাই?

বলো।

কয়েদ চাচার অসুখ। স্কুলঘরের বারান্দায় শুয়ে আছে। আমি দেখে এলাম। যাবেন দেখতে?

যাব।

যাব বলেও ওঠে না আজমল। ছেলে-বুড়ো সবারই কয়েদ চাচা, সে এক আশ্চর্য লোক। সারাদিন এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। কখনো ঝাউবনা, নয়তো তাঁতিপাড়া কিংবা ধর্মপুরা, অথবা আলিসাহসপুর, নয়তো যাদুনগর তাকে দেখা যায়। ভোলাহাট থানার কোথায় থাকেন না তিনি? কে না চেনে তাঁকে? কবে থেকে তিনি এই অঞ্চলে আছেন, কেউ জানে না। সারা দিন চুপচাপ, হাতে একটা থালা। কারো কাছে চান না, কেউ দিলে খান। দশটা কথা জিজ্ঞেস করলে একটা কথার উত্তর দেন। লোকে বলে, তিনি কামেল দরবেশ, ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। আজমল অনেক সাধাসাধি করেছে। কিন্তু কখনো প্রশ্নের জবাব পায়নি। তবে মানুষটি তার প্রিয়। যখন বজরার টেকে নদীর ধারে বসে থাকেন, ধু-ধু শূন্য দৃষ্টি, অসম্ভব শুকনা শরীর, লম্বা ময়লা নখ, দাড়ি-চুল সম্বলিত চোয়াল-ওঠা চেহারায় তাঁকে ঋষি-পুরুষ বলে মনে হয়। আজমলের বুক ছলকে ওঠে, ও অভিভূত হয়। কৈশোরে ও অনেকদিন কয়েদ চাচার পেছনে পেছনে ঘুরেছে, বুকে আকাঙ্ক্ষা গিজগিজ করতো, যদি চাচা ওকে কোনো অলৌকিক কথা বলেন। কিন্তু ওর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। মানুষটি পাগল নন, কখনো পাগলামি করেন না। ভিক্ষুক নন, কখনো কারো কাছে হাত পাতেন না। সংসারে থেকেও তিনি আশ্চর্য রকমের সন্ন্যাসী। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, মানুষটির বুক খামচে ধরে ঢাকনা উপড়ে ফেলতে। কেন এত নিশ্চুপ? কেন কথা ফুরিয়ে গেল? তাঁর কি কোনো প্রচণ্ড রকমের ক্ষত আছে? যে ক্ষত এখন কুতুব লালন করছে? জোহরাকে ভালোবাসার খেসারত কি কুতুব দেবে আরেকজন কয়েদ চাচা হয়ে? নাকি কয়েদ চাচা কোনো অপার্থিব বস্তু পেয়ে নির্বাক হয়ে গেছেন? ঐ মানুষটিকে জানতে হবে? আজমল মনে মনে এমন আশা পোষণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুতুব যাবার কথা বলে আর ওঠে না। হয়তো বসে থাকতে ওরও ভালো লাগছে।

কুতুব?

বলেন।

জোহরার জন্য—

আজমল ভাই, কুতুব ওকে থামিয়ে দেয়, এসব কথা বলবেন না।

আজমল দ্রুত উত্তর দেয়, না বলব না, বলতে চাই নে।

কুতুবকে ও দুঃখ দিতে চায় না। বরং কুতুবের আপত্তিতে ওর লজ্জা হয়। ওর কি অধিকার আছে কুতুবের গোপন ক্ষতে হাত দেবার? এমনই হয়, এমনই। এসব পুতিগন্ধ নিঃশ্বাস নিয়েই মানুষের প্রতিদিনের জীবন। ও নিজে, কয়েদ চাচা, আশিক আলি, ইয়াসিন বসনি, আছিয়া—কেউই এর বাইরে নয়। মহানন্দার বুকে কলধ্বনি, মহানন্দা বয়ে যায়। আকাশে ভাঙা চাঁদ। সামনে অন্ধকার। বটগাছে রাত-জাগা পাখির ডাক। এই বজরার টেকের চরাচর জুড়ে কেবলই ক্ষত এবং ক্ষতের বিস্তার।

কুতুব?

বলেন।

শ্বশুরবাড়িতে জোহরা ভালো নেই।

আমি জানি।

দুজনে আবার চুপ। মাসখানেক হলো জোহরার বিয়ে হয়েছে। আজমল কেন আবার জোহরার কথা বলল, ও জানে না। ও কি কুতুবকে সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছে? কুতুব সহজভাবে উত্তর দিল। কোনো আপত্তি করেনি। ও কি সান্ত্বনা ঠাঁই খুঁজছে? দুজনের অবচেতনে এমনটি ঘটে। মানুষের সচেতনতার অন্তরালে কী আশ্চর্য প্রবহমান ধারা। কোথায় যে কেমন করে টেনে নিয়ে যায়, বোঝা মুশকিল।

আজমল ভাই, চলেন যাই?

চলো।

দুজনে উঠে পড়ে। মহানন্দার লঞ্চের ভেঁপু শোনা যাচ্ছে, ওটা আসছে রোহনপুর থেকে। একটু পরই মানুষে ভরে যাবে বজরার টেক। রাতে ওটা ঘাটেই থাকবে। সকালে আবার ছাড়বে। সে জন্য যাবার যাত্রী নেই। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বাজার ছাড়িয়ে আসে। আজমল একবার ভাবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ রাতে ও ঘরে ফিরবে না। পোলোডাঙা চলে যাবে। ওখানকার মাসুদ বসনি ওর ভীষণ বন্ধু, গেলে আসতে দেয় না। থাকাটা ওরও পছন্দ। কুতুব ওর পাশেপাশে হাঁটছে। ও কুতুবের ঘাড়ে হাত রাখে, কুতুব একটা গান গাও।

না, কুতুব চাপা স্বরে আপত্তি করে, গান ভুলে গেছি।

না, ভোলোনি।

হ্যাঁ, ভুলে গেছি।

ওর স্বর উঁচুতে উঠলে আজমল আর কথা বাড়ায় না। কুতুবকে এখন ওর মতো ভাবতে দিতে চায়। কুতুব কুতুবই থাকুক, আজমল ওর চিন্তার ভুবনে নষ্ট বাতাস ছড়াবে না। বাজারের মিটমিটে কুপির আলো পেরিয়ে এলে আবার অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে। অন্ধকার চিত্রির হয়ে যায় কুতুবের সামনে। ওর কেবলই মনে হয়, সোনা মসজিদের মতো কারুকাজ ছিল জোহরার শরীরে। যে সোনা মসজিদের সামনে বিস্ময়, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো পর্যটক, যার অসাধারণ শিল্পকর্ম কিংবদন্তী হয়েছিল গৌড়ের ইতিহাসে, সে গৌড় এখন কুতুবের হৃদয়ে অমন পেটানো নিকষ কালো শরীর হয় না। গৌড়ের সবাই কি সোনার কালো দেয়াল বুঝেছিল? বোঝেনি, এ সৌন্দর্য সবাই বোঝে না। যে বোঝে, সে তলিয়ে যায়। কুতুব তলিয়ে গেছে। ও আর উঠতে পারছে না। হঠাৎ করে হোঁচট খায় ও। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে টনটনে ব্যথা হয়, ও উপেক্ষা করে। ওর কেবলই রামেশ্বর জমিদারের কথা মনে হয়। মানুষটি গৌড়ের ইতিহাস চমৎকার বলতো। ওদের মতো অনেকেরই বালক-বয়স, বিনিসুতোর মালা। ছিঁড়তে পারে না, গেঁথে থাকে বুকে। ওদের বয়সের ছেলেরা রামেশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। একসঙ্গে হলে তার গল্প করে। বসবাসের জন্য মানুষটি মালদহে চলে গেলে ওরা খুব কেঁদেছিল। খুব কাছের কাউকে হারানোর বেদনা ছিল ওদের বুকে।

আজমল ভাই?

বলো।

দিনের বেলা হলে আপনাকে নিয়ে সোনা মসজিদে যেতাম।

বড় ভালো জায়গা কুতুব।

হ্যাঁ, মসজিদের দেয়ালে হাত দিলে আমার কলজে ঠাণ্ডা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল হো-হো করে হাসে। জোহরার সঙ্গে ঐ দেয়ালের মিলটুকু আজমলের জানার কথা নয়। ও এমনিতেই হাসে। ও কি করে জানবে পর্যটক কুতুবের বিস্ময়ের কথা।

কুতুব?

বলেন।

জোহরা আমার বোন। আমি জানি, ও তোমাকে ভালোবাসতো। বিয়ের দিন আমার পায়ে ধরে কেঁদেছিল। সে কী কান্না! খালি তোমার কথা বলে।

আজমল ভাই, ভাঁটফুলের গন্ধ আসছে, চমৎকার না?

হ্যাঁ, চমৎকার!

আজমল থিতিয়ে যায়। কুতুব কি ওকে ভালোবাসার ঘ্রাণের কথা বলল? তীব্র সুগন্ধিময় ঘ্রাণ? এ ঘ্রাণ হারালে কি সোনা মসজিদে যাবার ইচ্ছে হয়? বারান্দায় শীতল হাওয়ায় শুয়ে থাকার সাধ হয়, নাকি সবুজ চাপালে?

স্কুলের অন্ধকার বারান্দায় কয়েদ চাচা নিথর পড়ে আছে। চারদিকে মশার ভনভন। তাঁর কোনো সাড়াশব্দ নেই। আজমল মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে, চাচা, ও চাচা?

শব্দ নেই, শুধু নিঃশ্বাসের ওঠা-নামা। কুতুব কপালে হাত রাখে।

মাগো মেলা জ্বর?

আজমল দেখলো, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

চাচা? ও চাচা?

কোনো সাড়া নেই। দুজনে চুপচাপ বসে থাকে। কি করবে বুঝতে পারে না। আজমলের খারাপ লাগে। কৈশোরে এই মানুষটির জন্য ও ভাত তরকারি চুরি করে কলাপাতায় করে নিয়ে আসতো। যেদিন বেশি খিদে থাকতো সেদিন ঐ ভাত দেখলে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো কয়েদ চাচার। ঐ পাতায় রেখেই গপ্‌গপিয়ে খেয়ে ফেলতো। আবার কোনোদিন ফিরেও চাইতো না, পড়ে থাকতো, পরে কুকুরে খেয়ে ফেলতো। এই মানুষটিকে বোঝা যায় না বলেই কি এর প্রতি ওর তীব্র আকর্ষণ? কয়েদ চাচা কি স্বর্গের নিষিদ্ধ ফল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল ভাই, এখন কি করবেন?

বুঝতে পারছি না।

ও কপালে হাত রাখে, চুলে বিলি কেটে দেয়। এই মানুষটির জন্য কিছু করার আকাঙ্ক্ষা ওকে ব্যাকুল করে, কিন্তু কিছু করার নেই। কুতুব পাশে পড়ে-থাকা কয়েদ চাচার শূন্য থালাটি উঁচিয়ে নিয়ে নেমে যায়। কাছের ডোবা থেকে পানি নিয়ে আসে। হাত ভিজিয়ে কপাল মুছিয়ে দেয়, মুখ মুছিয়ে দেয়।

আপনি বাড়িতে যান আজমল ভাই।

তুমি?

আমি, এখানে থাকব, চাচাকে দেখব।

আজমল জানে, কুতুবের এই সিদ্ধান্ত বদলাবে না। ওকে ঘরে ফেরার অনুরোধ করে লাভ নেই। ও নিঃশব্দে অন্ধকারে নেমে আসে। ওর গা শিউরে ওঠে, কুতুব এমন একটা জীবনের দিকেই কি পা বাড়াচ্ছে? এখন যেমন অসুখ, ক্ষুধা, কষ্ট কোনো কিছুই কয়েদ চাচাকে স্পর্শ করে না, পাথরের মতো পড়ে থাকে তার অনুভূতিহীন শরীর, কুতুব একদিন এমনই হতে চায়। এই ধারণা আজমলকে সাংঘাতিক অস্বস্তিতে ফেলে। বাড়ি ফেরার বাকি পথ ও এই অস্বস্তি উড়াতে পারে না। বারবার আতঙ্কিত হয়, শিহরিত হয় এবং পরিশেষে ইয়াসিন বসনির ওপর প্রচণ্ড ক্রোধ ওকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। জোর করে জোহরাকে বিয়ে দেয়া হয়েছে। ইয়াসিন বসনি ওর বাবা, ওর ছোট বোন জোহরার বাবা হারামজাদা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের আচরণই মানুষকে বিভিন্ন অভিধায় চিহ্নিত করে। ছেলে যখন বাবার চরিত্র বিশ্লেষণ করে ভালো কিছু পায় না, তখন সে অত্যন্ত নিরুপায় এবং অক্ষম যন্ত্রণায় তড়পায়। এই যন্ত্রণা স্থায়ী গরম শলাকা, নিরন্তর পোড়ায়। ওর হঠাৎ মনে হয়, ইয়াসিন বসনির মুণ্ডুটা শরীর থেকে ফেলে দিলে ওর ক্রোধের উপশম হতে পারে। ও এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়, এটা বোধহয় করা উচিত? যে ব্যক্তি নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখে না, সে কেন অন্যের জীবন তছনছ করে? আজমলের শরীর চিড়মিড়িয়ে ওঠে। চণ্ডাল রাগে বেহুঁশ হয়ে ও তখন বাড়ি পৌঁছে দেখে, আজিজ বসে আছে। ওকে দেখে আজমলের রাগ মুহূর্তে উবে যায়। আজিজ মানেই নাচোল, আজমলের মুক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর জন্য বসে আছি। কাল সকালে আমার সাথে রামচন্দ্রপুর হাট যাবি। অনেক কথা আছে।

আজমল আনন্দে কথা বলতে পারে না। শুধু আজিজের ঘাড়ে হাত রেখে বলে, কতদিন পর তোর সাথে দেখা। তুই না হলে আমার মন খুলে কথা বলাই হয় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

পাকা রেড়ির ফল বেশ করে রোদে শুকিয়ে ঢেঁকিতে কুটে নেয় আছিয়া। এই করতে দুপুর গড়িয়েছে। তাড়াহুড়া করে কুটা গুঁড়ি সামান্য পানি মিশিয়ে চুলোয় বসিয়ে দেয়। জ্বাল দিলেই তেল পানির ওপর ভেসে ওঠে। রেড়ির তেলের হালকা গন্ধ ভীষণ ভালো লাগে আছিয়ার। নিজের হাতে এই তেল তৈরি করতে আনন্দ পায় ও। নিজের তৈরি জিনিস দিয়ে ঘরের আঁধার দূর হয়। কজনই বা এমন পারে? ওর ধারণা, যে নিজের ঘরের আঁধার দূর করতে পারে, সে সব পারে। ওর মজুত তেল প্রায় শেষ। আর দু-এক সন্ধ্যা ঘরে বাতি দিতে পারবে। বড় লোহার কড়াইয়ের মধ্যে যখন তেল ভেসে ওঠে, ও উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে। রেড়ির তেল, মুগা সুতা বা এণ্ডির চাদর শুধু ওর ব্যবসা নয়, ও এখনো ততটা ব্যবসায়ী হয়নি। কিছু কিছু জিনিস ও নিজের জন্য রেখে দেয়। সেটা ওর একলার, যেখানে আর কারো ভাগ নেই। যেমন এই তেল ভেসে ওঠা এবং রেড়ির ফুল ফোটা, দুটোই ওর প্রিয়। রেড়ির ফুল মসুর ডালের ফুলের মতো ছোট। ডাঁটার সঙ্গে থাকে পুষ্পদল, গাঢ় সবুজ রঙের পাঁচ মাথাওয়ালা তারার মতো। তার ওপরে ঠিক মাঝখানে উজ্জ্বল সোনালি রঙের পুষ্পরেণু। রেণুগুলো এমনভাবে থাকে যে, এর নিচের সবুজ রঙের তারার সবগুলো কোণ দেখা যায়। কী যে সুন্দর! গাঁয়ের মেয়েরা সবাই মিলে ওগুলো নাকফুলের মতো নাকে লাগিয়ে রাখতো। এখনো ওর ইচ্ছে করে কিশোরী আছিয়া হয়ে ফুল পরতে। পিছিয়ে আসে বয়স নেই মনে করে। এই বয়সটা একটা যন্ত্রণা, কখনো ইচ্ছে করে এই বয়স উড়িয়ে দিতে, ধানের খোসার মতো বাতাসে ছেড়ে দিতে। একজনের সব ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা যদি অন্যেরা জানতো, কী যে হুলুস্থুল ঘটে যেতো! তেলের কড়াই চুলো থেকে নামাতে নামাতে ওর হাসি পায়। আগুনের আঁচে ওর শ্যামলা মুখে রক্তিম আভা, বিন্দু বিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাম জমেছে কপালে, চিবুকে। মাথায় ঘোমটা নেই, খোঁপা ভেঙে চুল লুটিয়ে আছে পিঠের ওপর। ঘাড়ের পাশ দিয়ে চুল লেপ্টে আছে ঘামের সঙ্গে। মনে হয়, আছিয়া প্রস্ফুটিত হয়েছে। এটি একটি বিশেষ ক্ষণ, এই ফুটে-ওঠা সব সময় হয় না। আছিয়ার ঘন কালো ভুরুতে ঈষৎ কুঞ্চন, ও ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে। পরিশ্রমের কাজে ওর ঠোঁট এমনই থাকে। চক্‌চকে তেলের আস্তর ঘন হয়ে আসছে, ও আপন মনে হাসতে হাসতে ভাবে, ও এখন একজন মধ্যবয়সী নারী, রেড়ির তেল বা ফুলের সৌন্দর্য এখন ওর জন্য নিষিদ্ধ। বরং এক বোতল তেল আলাদা করে উঠিয়ে রাখলে প্রয়োজনমতো বাতের রোগী ইয়াসিন বসনির শরীরে মালিশ করে দেয়া যায়। অকারণ সৌন্দর্যের চাইতে, এখন প্রয়োজনটাই প্রধান। ও তেলের কড়াই নামিয়ে আলাদা এক জায়গায় রাখে, ঠাণ্ডা হলে শিশিতে তেল ভরবে। ছোবড়াগুলো রোদে শুকিয়ে পরে আগুনে পুড়িয়ে ক্ষার করে রাখবে। দরকার মতো ঐ ক্ষার দিয়ে কাঁথা, চাদর, শাড়ি সেদ্ধ করে কেচে নেয়, চমৎকার পরিষ্কার হয়। ও একটা কচু ডালা দিয়ে কড়াইটা ঢেকে রাখে।

দক্ষিণ দিকের চালার নিচে সুতা-কাটনি মেয়েরা বোটা, টাকনি, লাটাই গুছিয়ে রাখছে, ওদের যাবার সময় হয়েছে। রেশম গুটিগুলো আছিয়া নিজের হাতে জ্বাল করে দিয়ে। ওরা কেবল সুতো ওঠায়। চারজন মেয়ে ওর সঙ্গে কাজ করে। সারা দিনে ফুরসত নেই ওর। কলাপাতা পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে রাখতে হয়। সেই ছাই গুটি সেদ্ধ করে। সেদ্ধ করার সময় সামান্য একটু গোবর দিয়ে দেয়, ভালো ফল পাওয়া যায়। জ্বাল দেয়ার ফলে এণ্ডির গুটি ফুলে উঠলে আঁশগুলো আলগা হয়। কড়াই নামানোর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা দ্রুত সুতো কাটে। সুতো কাটায় হরমুন সবচেয়ে ভালো। তাঁতিদের কাছে ওর সুতোর চাহিদা বেশি। ওরা গুছিয়ে চালাঘর থেকে নেমে আসে।

আছিয়া বুবু যাই।

ও মাথা নাড়ে বাকিরা বেরিয়ে যাচ্ছে। হরমুন কিছুদূর গিয়ে ফিরে আসে। আঁচলে হাত মোছে, কিছু একটা বলতে চায়।

কিছু বলবি?

সেরখানেক চাল দেবেন আছিয়া বু'? ছেলেটা মোটা চালের ভাত খেতে চায় না। অসুখ থেকে উঠে মুখে রুচি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছিয়া হিসেব করে দেখল, ওর সপ্তাহের টাকা পেতে এখনো তিন দিন বাকি। ইতস্তত করে ওকে সেরখানেক চাল দিতেই হয়। হরমুনকে ওর প্রয়োজন। টুকটাক একটু-আধটু খাতির না করলে হয় না। রাঙানি দেয়ার লোকেরতো অভাব নেই। তাছাড়া হরমুন নিজেও ওর কদর বোঝে বলেই আছিয়ার ওপর সুযোগ নিতে ছাড়ে না। হরমুন চলে গেলে ও বরই গাছের ছায়ায় গোসল করতে বসে। ইঁদারা থেকে বালতি করে পানি উঠিয়ে বড় বড় চাঁড়িতে ধরে রেখেছে তাহের। এই জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা। গরমের দিনে মনের সুখে গোসল করা যায়। ও বেশিরভাগ সময়ই আগুনের ধারে কাজ করে। শরীর তেতে থাকে, ঘামের উৎকট গন্ধ অস্থির করে তোলে। তাই আছিয়া পানি পেলে কষ্ট ভোলে। রেড়ির তেলের সলতের মতো সারাক্ষণ বুক জ্বলে। ইয়াসিন বসনির সঙ্গে সম্পর্ক যে সবসময় স্বস্তি দেয় তা নয়, ভীষণ নিঃসঙ্গতাও ভালো লাগে, নইলে গ্লানিকর মনে হয়, নিজের ওপর ক্রোধ জন্মায়। ওর গোসলের জায়গার চারদিকে রেড়ি গাছের ডাল দিয়ে বেড়া করা আছে। ও মগে উঠিয়ে শীতল পানি উদ্দ্যোম শরীরে গড়িয়ে দেয়।

জমিরুদ্দিনের চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী ও। ওর ছেলেপুলে হয়নি। এর আগে তিনটে বিয়েতেও কোনো সন্তান নেই। জমিরুদ্দিন ছেলের আশায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। ওর প্রথম দুই বউ মারা যায়। তৃতীয় বউকে তালাক দেয়। তৃতীয় বউয়ের অন্য জায়গায় বিয়ে হলে সেখানে দুই ছেলে হয়। জমিরুদ্দিন এতে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আছিয়ার ঘরেও সন্তান না হওয়াতে মনে মনে দমে গিয়েছিল। ভাগ্যকে দোষ দিয়ে গালাগালি করতো, কখনো গভীর নিঃশ্বাস ফেলে চুপ মেরে থাকতো। আছিয়ার কিছুই করার ছিল না। জমিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর আছিয়া সবকিছু পেয়ে যায়।

চার বিঘা জমির ওপর বাড়ি। চারদিকে রেড়ি গাছ দগদগিয়ে বাড়ে, ছোটখাটো বনের মতো। যত্ন-আত্তি নেই, অযত্ন-অবহেলায় বাড়তেই থাকে। জমিরুদ্দিন চালাক লোক, অল্প খরচের এই ব্যবসা ধরে রেখেছিল। দুই তিন মাসের মধ্যেই গাছগুলো একজন বড় মানুষের মাথার ওপর উঠে যায়। দুই মাস বয়স থেকেই ফল ধরা শুরু করে এবং চার-পাঁচ মাসের মধ্যে বীজ পেকে যায়। বড় অল্প পরিশ্রমে আনন্দদায়ক গাছ, আছিয়ার সঙ্গী। ও ঘুরে ঘুরে তদারক করে, বীজ সংগ্রহ করে, পলুর পাতা কাটে। জমিরুদ্দিন ওর কাজে খুশি ছিল, পুরোপুরি নির্ভর করতো। মারা যাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস দুয়েক আগ থেকেই লোকটা কেমন উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। কোনো কিছুই খেয়াল করতো না। শুয়ে-বসে সময় কাটতো। তারপর হঠাৎ করে একদিন মরে গেল। ওরা বুঝতেও পারল না যে, কি হয়েছিল। আছিয়ার তখন বয়স চল্লিশ। বৈধব্যের জন্য এ-বয়সটা খারাপ। না নতুন করে শুরু করার সময় থাকে, না ফুরিয়ে যায় কামনা-বাসনা। কেবলই খাঁ খাঁ করে বুক, উথাল-পাথাল হা-হুতাশে আগুন হয়ে যায় সময়, নিরন্তর পোড়ায়। আছিয়ার এখন তেমন অবস্থা।

ও তড়িঘড়ি জল ঢেলে উঠে পড়ে, বেলা গড়িয়েছে। ভাত খেয়ে একটুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর আবার পলুঘরে ঢুকতে হবে। অবশ্য দুজন মুনিষ আছে পলুঘরের জন্য, তবু নিজে না দেখলে স্বস্তি হয় না। কাপড় বদলে বেরিয়ে আসে ও। সিতারা গুটি জ্বাল করার কড়াই মাজছে, কালিতে মাখামাখি হয়ে গেছে ওর হাত। আছিয়া এক পলক দেখে বড় ঘরে আসে। চুল আঁচড়ায়, মাথায় সুগন্ধী তেল দেয়। ইয়াসিন বসনির পছন্দের তেল, নিজেই হাট থেকে কিনে আসেন। চুল বেয়ে পানি ঝরছে, ও গা করে না। ভিজে যাচ্ছে পিঠের কাপড়। ও রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে খেতে বসে। সব সময় একা একাই খায় ও। যেদিন ইয়াসিন থাকে, সেদিনও ইয়াসিনকে খাইয়ে দিয়ে তবে নিজে খায়। আজকে খেয়েদেয়ে কাজের লোকদের জন্য বেড়ে রেখে চলে আসে বড় ঘরে। ইঁদারার ও-পাশে সিতারা তাহেরের সঙ্গে মসকরা করছে। হাসির শব্দ শুনতে পায় ও। উপেক্ষা করে উঠোন পেরিয়ে আসে। জোয়ান ছেলেমেয়েদের এইটুকু স্বাধীনতা থাকতে হয়। ও চৌকিতে শুয়ে দুচেখের পাতা এক করে। না, ঘুমুনো চলবে না, শুধু কিছুক্ষণের জন্য শরীরটাকে ছেড়ে দেয়া।

ইয়াসিন বসনির মতো অভিজাত রেশম ব্যবসা নয়, রেড়ির পাতায় রেশম কীট পোষে। বনে-জঙ্গলে কুলের গাছ ও রেড়ির গাছে এই পোকাগুলো আপনা-আপনি জন্মায়, এগুলো রেশম পোকার অন্য প্রজাতি। আছিয়ার বাবার এই ব্যবসা ছিল। শৈশব থেকে এসব দেখে এবং নিজের হাতে করে ও পোক্ত হয়ে উঠেছিল। তাই জমিরুদ্দিনের সংসারে এসে ওর কোনো অসুবিধে হয়নি, বরং আগ্রহভরে নিজেকে এসবের সঙ্গে জড়িয়েছে। জমিরুদ্দিন অলস লোক, জুয়া খেলেই বেশির ভাগ সময় কাটায়, ছেলেপুলে নেই বলে সংসারের টান তেমন প্রবল নয়। এ কারণে ব্যবসার হালও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরতে হয় আছিয়াকে। এই পরিশ্রমে জমিরুদ্দিন এত খুশি ছিল যে, পুনরায় বিয়ের কথা ভাবেনি। আছিয়া আর যাই হোক, প্রবল প্রতাপে সংসার করেছে, বাকি তিনজনের মতো সতীনের জ্বালা সহ্য করেনি। জমিরুদ্দিন জানতো, রেশম পোকার অবস্থা কিছুটা নাজুক। ঠিকমতো যত্ন না নিলে কিংবা কোনো অনিয়ম হলে, অসুখে দ্রুত মরে যায়। কিন্তু আধাবুনো এণ্ডি পোকা এতটা নাজুক নয়। অবহেলা-অযত্নে ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ঠিকমতো খাওয়া দিলেই পোকা থেকে রেশম পাওয়া যায়। এই সোনালি সুতো আছিয়ার সারা জীবনের স্বপ্ন। শৈশব থেকেই তো দেখে আসছে, কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে এখন মধ্যসীমায়, তবু এই সোনালি সুতোর নেশা ওর কাটল না। ইদানীং আজমলের ঠাণ্ডা স্থির চাউনি দেখলে ওর মনে হয়, একটা রেশম কীট ঐ দৃষ্টির মধ্যে গুটিয়ে আছে। ওর চারপাশে হাজার সুতোর টোপ। একসময় ঐ সোনালি সুতো ওর কাছে ফাঁস হয়ে যায়, যেন গলার চারদিকে জড়িয়ে গেছে, ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। আজও তেমন একটা অস্বস্তি ওকে তাড়া করলে ও উঠে বসে। যেন আজমলের ঠাণ্ডা স্থির চাউনি কড়িকাঠে ঝুলে আছে। ও ছটফটিয়ে বাইরে আসে, বুক ধড়ফড় করে। বারান্দায় পাটি টেনে বসে। কিছু ভালো লাগে না। জীবনের মাঝবেলায় এসে সোনালি সুতো এমন কালো, শক্ত দড়ির মতো হয়ে যাবে, ও কি তা ভেবেছিল? অনেক কিছুই জানার বাইরে থাকে, অনেক কিছুই জেনেশুনে অজানা করে রাখতে হয়। জমিরুদ্দিন মরে গিয়ে আছিয়াকে এমন একটা অবস্থায় রেখে গেছে।

ও পলুঘরে আসে। গতকাল পাকা পলু চন্দ্রকিতে উঠিয়েছে। পাঁচ-সাত দিনে পোকার মাথা সরু হয়ে যায়। সুতো কাটবার সময় হলে মাথা উঁচু করে সঙ্কেত দেয়। এই সময়টায় খুব ভালো লাগে আছিয়ার, পোকার জন্য মায়া বাড়ে, তখন ও ব্যবসা ভোলে। ও তো জানে, কিছুদিনের মধ্যেই পোকাগুলো বাঁধা পড়বে নিজের সুতোর আবরণে। প্রকৃতির কী যে নিয়ম। রেশমি সুতোর অন্তরালে নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনে। এমন একটা জীবন কি ওর চারদিকে বেষ্টন করে আছে? ওর ভীষণ ভয় করে, বুকের ধুক্‌পুকানি কমে না। পাকা পলু ও নিজের হাতে চন্দ্রকিতে ওঠায়, কাজের লোকদের ওপর নির্ভর করতে পারে না। ওরা হেলাফেলা করে কাজ করে, গুরুত্ব বোঝে না। পাকা পোকার সাথে কাঁচা পোকা বা অস্বচ্ছ পোকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রকিতে দিলে সুতোর গুণগত মানে তারতম্য হয়ে যায়। চন্দ্রকিতে কোনো কাঁচা পোকা পড়ে গিয়ে সুতো কাটা শুরু করে দিলে, তাকে পাকা করবার জন্য গাঁয়ের অন্য পলু চাষিরা ঐ পোকার নিচে জ্বালানো কুপি ধরে রেখে সামান্য উত্তাপ দিয়ে পোকাকে তাড়াতাড়ি পাকানোর ব্যবস্থা করে। পদ্ধতিটা আছিয়ার পছন্দ নয়। ও আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যায়। প্রতিদিনই ও খেয়াল রাখছে। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই গুটি পূর্ণ আকারের হয়ে যাবে। ঘরের দরজা বন্ধ করে আছিয়া বারান্দায় আসে। পলুঘরের ভেতরটায় আলো-আঁধারি, খর আলোয় এলে হঠাৎ করে সবকিছু ঝাপসা লাগে। ওর মাথা ঝিমঝিম করে। ও জানে, একটি পূর্ণ আকারের গুটি বানাতে পলু পোকাকে প্রায় এক লক্ষ পাক ঘুরতে হয়। ছোটবেলায় বাবা ওকে শিখিয়েছে এটা। এই চক্রাকার ঘোরা কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয় মাঝে মাঝে। ওর নিজের মনের মধ্যে এমন একটা পোকা আছে। যেটা কখনো শক্ত এবং কালো হয় মরে যায়, কখনো সজীব প্রজাপতি হয়। পাকা পলুগুলো গুটির ভেতর প্রজাপতির আকার ধারণ করে। সময়মতো গুটির ভেতরের পোকাগুলোকে না মেরে ফেললে ওগুলো গুটি কেটে উড়ে যায়। যেমন উড়ে যায় মানুষের প্রজাপতি মন। কারো কি তাকে ধরে রাখার সাধ্যি আছে? উড়ে যায় বলেই তো এত দুঃখ-যন্ত্রণা, এত সুখ-আনন্দ। আছিয়ার শরীর শিরশির করে। পোকা প্রজাপতি হলে সুতো আর লম্বা থাকে না, সেটা ছেঁড়া টুকরো হয়। ওর হাসি পায়। মন ফুটো হলে কি অমন হয়? অমন টুকরো টুকরো? হয় বোধ হয়, আছিয়ার স্থির বিশ্বাস, হয়। হলে ক্ষতি নেই, তাতে জীবনযাপন নষ্ট হয় না। বরং জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বাড়ে। কিন্তু সুতো নষ্ট হয়, ওটা আর কোনো কাজে লাগে না। তাই প্রজাপতি গুটি কেটে বেরুনোর আগেই ওগুলোকে তাপ দিয়ে কিংবা কয়েক ঘণ্টা রোদে শুকিয়ে মেরে ফেলা হয়। এই পোকার আঁশ কিছুটা মোটা, খসখসে। রেশমের মতো চকমকে চিকন নয়। আছিয়া উঠোনে নামে। আজ হলো কি? মনটা বড় বিক্ষিপ্ত। কিছুই ভালো লাগছে না। আজমলের ঠাণ্ডা চোখের চাউনি আজ ওর পিছু পিছু ফিরেছে, ওকে ঘায়েল করে রাখছে। আছিয়ার আজ বড় খারাপ দিন।

তখন উঠোন পেরিয়ে কুতুব ঢোকে। কুতুব ওর চাচাতো বোনের ছেলে। কুতুবকে নিয়ে ওর মা বিধবা হলে ওরা আছিয়াদের বাড়িতেই ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেবেলায় কুতুব ওর খুব ন্যাওটা ছিল। জমিরুদ্দিনের সঙ্গে বিয়ের পর এ বাড়িতেই প্রায় থাকতো এখন কালে-ভদ্রে আসে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছিয়ার অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, কুতুবের বুকে ঝড়। জোহরার সঙ্গে ওর প্রেমের ব্যাপার সবাই জানে। জোহরাকে জোর করে অন্যত্র বিয়ে দিয়েছে ওর বাবা, বাউণ্ডুলে কুতুব তার জামাই হবার উপযুক্ত নয়, সে জন্য অনেকে ইয়াসিন বসনিকে গাল-মন্দ করে। তাতে ওর দুঃখের কমতি হয় না। ওর যা ক্ষতি হয়েছে, তা কে পুষিয়ে দেবে? ও এক সময় আছিয়ার স্নেহের কাঙাল ছিল, এখন ও এসবের ধার ধারে না। বুক জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গেলে এই বাড়িতে আসে, ছায়াচ্ছন্ন এই বাড়ির স্নিগ্ধতায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে যায়। ইয়াসিনের সঙ্গে আছিয়ার সম্পর্ক ও সহ্য করতে পারে না, ঘৃণায় রি রি করে। তবু এখানে না এসে পারে না। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ওপর ওর আক্রোশ নেই, যতক্ষণ না তা অপরের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কুতুব বারান্দায় উঠে জলচৌকি টেনে বসে পড়ে।

বাপজান কেমন আছো?

কুতুব কথা বলে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকে। আছিয়া চমকে ওঠে, খুনির দৃষ্টি কি এমন? না কি ও আজমলের মতো ঠাণ্ডা স্থির চাউনিতে সর্বনাশ করতে চায় আর একজনের শান্তির? কুতুবকে নিয়ে বেশি কিছু ভাববার অবকাশ ওর নেই, যার কোনো সীমানা নেই, তাকে নিয়ে ভাবলে কি সমস্যার সমাধান হবে? কেবল ওর দৃষ্টিতে আছিয়ার বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কুতুবের মুখে কথা নেই, ও ভাবছে, আছিয়ার মুখ জোহরার মতো, শ্যামলা কিন্তু বর্ষায় বেড়ে-ওঠা রেড়ি পাতার মতো সতেজ, প্রাণবন্ত। জোহরার তুলনা হয় না, কারো সঙ্গেই না।

আছিয়া অপেক্ষা করে কুতুবের জন্য। ওর ধারণা, কুতুব কিছু বলতে এসেছে। ও সময় নিচ্ছে, নিজেকে প্রস্তুত করার সময়, কত সময় কুতুবের প্রয়োজন? ভোলাহাট থানার গ্রামগুলোর সব মাটি দিয়ে কুতুব গড়ে তুলুক এক বিশাল প্রতিমা।

কুতুবের পায়ের লম্বা নখের দিকে তাকিয়ে থাকে আছিয়া। অনেক দিন ওটা কাটা হয়নি। ময়লা ঢুকে কালো হয়ে আছে। তখন কথা বলার জন্য চোখ তুলে তাকায় ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

পায়ে হেঁটে মাত্র মিনিট পাঁচেকের পথ, তবু গরুর গাড়িতে আসা-যাওয়া করতে হয় ইলাকে। উপায় নেই, গাঁয়ের বিধান। ওর শাশুড়িও আপত্তি করেছে, সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়েছে, তাঁর নিজের কথা। প্রায়ই শাশুড়ির কাছে জমিদার বাড়ির বিধি-নিষেধ, অতীতের হাঁক-ডাক, বিত্ত-বৈভবের গল্প শুনতে হয় ওকে।

বুঝলে বৌমা, আমি একবার স্টিমারে করে বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। অমনি সারা গ্রামে রটে গেল যে, জমিদার গিন্নির মুখও তাহলে দেখা যায়? আমার ভাসুর তো রেগে আগুন, তিনি আদেশ দিলেন, আর কোনোদিন যেন ঘরের বৌ সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্টিমারে না ওঠে। যেই কথা, সেই কাজ। এরপর থেকে আমাকে সবসময় নৌকোয় যাতায়াত করতে হয়েছে। সেই বাড়ির বৌ হয়ে তুমি হেঁটে গিয়ে স্কুলে মেয়ে পড়াতে যাবে, তা কি হয় মা?

ইলা অনুগত পুত্রবধূর মতো মাথা নাড়ে, ঠিকই বলেছেন মা। আমি গরুর গাড়িতেই যাব। তবে স্কুলটা তো হোক। মেয়েরা শিক্ষিত না হলে সমাজের উন্নতি হয় না মা?

সেতো আমিও বুঝি। তবে রয়েসয়ে করা ভালো।

ইলা মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়। তখন ভুপেন পেছনের পুকুর থেকে ধরা আধ মণ ওজনের রুই মাছ নিয়ে ঘরে ঢুকলে জমিদার-গিন্নি তড়িঘড়ি উঠে যায়। ইলা দিস্তা কাগজ দিয়ে খাতা সেলাই করেছিল, সেগুলো শেষ করতে মন দেয়।

রমেনের বন্ধু আলতাফের উৎসাহে কৃষ্ণগোবিন্দপুরে মেয়েদের জন্য একটা স্কুল খোলা হয়েছে। ছাত্রী এখন পর্যন্ত তিনজন। ইলা অবৈতনিক প্রধান শিক্ষয়িত্রী। খাতা-বই ওরা নিজেরা দিয়ে দিচ্ছে। বেতনও ফ্রি। ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস, কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রীর সংখ্যা বাড়বে, না বেড়ে পারে না। ও নিজে ঘরে ঘরে যাবে, মেয়েদের টেনে বের করে আনবে। ওকে 'না' করতে পারে, এমন পরিবার কমই আছে। শাশুড়ি ওকে স্কুল পরিচালনা আর পড়াবার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু হেঁটে যাবার নয়। এর পেছনে আভিজাত্যের অহমিকা আছে। এসব সংস্কার ও আস্তে আস্তে ভেঙে ফেলবে। শাশুড়িকে জয় করা এমন কঠিন কাজ নয়। জমিদারের পড়ন্ত অবস্থা, জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন এখন তুঙ্গে, এই সময়ে কি এসব ছোটখাটো সংস্কার টিকিয়ে রাখা সম্ভব? সব অচলায়তনই ভেঙে-গুঁড়িয়ে পড়বে। ও বইখাতা গুছিয়ে রেখে রান্নাঘরে আসে। রুই মাছটা এখনো কাটা হয়নি। মাছটা একদম নিথর, রুপোলি আঁশ চমচক করছে, রক্তিম চোখ পাথরের মতো, আলো পড়লে ঝিকিয়ে ওঠে। ও উবু হয়ে বসে মাছের গায়ে হাত রাখে, মা আমি মাছটা কাটি?

এতবড় মাছ। তুমি কাটতে পারবে?

খুব পারব।

ইলা বড় বটি নিয়ে পিঁড়ি টেনে বসে।

তুমি পারবে না মা। মাছটা নষ্ট হবে।

ওর শাশুড়ি দ্বিধা করে। শাশুড়ির দ্বিধায় ওর জেদ বাড়ে। যেন এই মাছটা কাটার মধ্যে ওর অনেক সাফল্য নিহিত। এ কাজটা ওকে করতেই হবে। ও দ্রুত হাতে মাছের আঁশ ছাড়ায়। তারপর মাথাটা ধরে ঘাড়ের কাছে বিশাল এক পোঁচ দেয়। রক্তে ভরে যায় ওর হাত, রক্ত গড়ায় বটির গা বেয়ে। ও মনের আনন্দে ওটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

মাস তিনেকের মধ্যেই ও পায়ে হেঁটে স্কুলে আসা-যাওয়া শুরু করে। স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা হয়েছে পঞ্চাশ। অর্ধেক বেলা স্কুল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। বিকেলে পার্টির কাজ থাকে, লোকজন আসে। আলাপ-আলোচনা হয়, ছুটির দিনে যেতে হয় গ্রামে গ্রামে কিংবা সাঁওতাল এলাকায়। একটুও সময় নেই। কোথা দিয়ে যে দিনগুলো কেটে যায়, টের পায় না ইলা, রমেনের সঙ্গে সকালে বা রাতে দেখা হয়। যেদিন রমেন অন্যগ্রামে চলে যায়, সেদিন আর দেখাই হয় না। তবু এই জড়িয়ে পড়াই ওর কাম্য। শুধু রান্নাঘর, স্বামীসেবা কিংবা সন্তান পালন তো ও চায়নি। ও চেয়েছিল, বেড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে বেরিয়ে আসা জীবন, যে জীবনের চারদিকে অবরোধের নিগড় লোহার শেকল হয়ে আটকে থাকবে না। ওর সামনে বসে মাতলা যখন জোতদারদের শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলে, আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা দেয়, ও মনে মনে গৌরব বোধ করে। এমন মানুষই ও দেখতে চায়, যারা অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার, যারা নিজেদের পায়ের নিচে শক্ত মাটির ভিত চায়। এই এলাকার কৃষক আন্দোলনে বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। সাঁওতালদের মধ্যে মাতলা প্রাণ সঞ্চার করেছে। ও সাঁওতালি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে ওদের উদ্বুদ্ধ করে, এমনটি আর কেউ পারে না।

আজ স্কুল বন্ধ। ও মেয়েদের জন্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করছে। অল্প সময়ের কাজ, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। হরেককে আসতে বলেছে, ওকে ফণী মাস্টারের কাছে পাঠাবে দরকারি কাজে, ও এখনো এলো না। ইলা ঘরের সঙ্গে লাগানো বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ও-পাশটায় উঠোনের বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে সজি ক্ষেত, মাচানে লাউ হয়েছে অনেকগুলো। গোবিন্দ নতুন সজির আবাদ করছে। ও হাতের তালুতে থুতনি রেখে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। রমেন তিন দিন ধরে বাড়িতে নেই, কৃষক সমিতির কাজে মালদহ গেছে। কবে ফিরবে, ঠিক নেই। সামনের সপ্তাহে কৃষ্ণগোবিন্দপুরের হাটে সভা, ওকে বক্তৃতা করতে হবে। ও ঠিক করেছে, কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলবে এবং সেই সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির কথাও। ঘরে এসে কিছু কাগজপত্র নিয়ে বসে। সে সব ঘেঁটে নিজের বক্তৃতার খসড়া তৈরি করে : ১৯২৯-এর বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে রেহাই পায়নি ভারতবর্ষ, সে ধাক্কা এসে লাগে বাংলার কৃষককুলের মধ্যেও, ফসলের দাম যায় কমে। জোতদাররা এই বোঝা চাপাতে চাইল বর্গাচাষিদের ওপর। দাবি করল, ফসলের তিন ভাগের দুভাগ। বর্গাচাষিদের পক্ষে এ বোঝা বহন করা ছিল অসম্ভব। তারা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলে তাদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হতো। এ অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না। আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত কৃষককুল খাজনার বোঝা বহনে অক্ষম হলে, জমিদারি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ক্রমবর্ধমান কৃষক অসন্তোষের চাপে ব্রিটিশ সরকার ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ১৯৩৮ সালের ৫ নভেম্বর ফজলুল হক মন্ত্রিসভা এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। তাঁরা ভূমিব্যবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে তদন্ত করে সংস্কারের উদ্দেশ্যে সুপারিশ করার জন্য ক্লাইভ কমিশন গঠন করে। ১৯৩৯ সালের ২ ও ২৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় কম্যুনিস্ট পার্টি পরিচালিত প্রাদেশিক কৃষক সভা খাজনা কমানোর জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাদের আরো দাবি ছিল যে, জমিতে দখলস্বত্ব প্রতিষ্ঠা ও ফসলের দশ আনা ভাগ লাভের অধিকার স্বীকার। ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ লাভের দাবি থেকেই তেভাগা আন্দোলনের সূচনা হয়। এছাড়া প্রাদেশিক কৃষক সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে।

১৯৪০-এর ২১ মার্চ কমিশন তার রিপোর্ট দাখিল করে। কমিশনের রায় কৃষকদের পক্ষেই সোচ্চার হয়ে ওঠে। রিপোর্টে বর্গাদারদের সরাসরি সরকারের প্রজা হিসেবে গণ্য করার সুপারিশ করা হয় এবং স্বীকার করা হয় যে, ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ লাভের অধিকার ন্যায্য দাবি। এছাড়া কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদের পক্ষে কৃষক সভার দাবিকে সঙ্গত মনে করে ও তা উচ্ছেদের পক্ষে মত প্রকাশ করে। সমস্ত জমিদারি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের খাস কিনে নিয়ে রাইয়তওয়ারি প্রথা চালু করার জন্য সরকারকে সুপারিশ করে।

১৯৪০-এর ৮ ও ৯ জুন অর্থাৎ এই রিপোর্ট পেশ করার আড়াই মাসের মধ্যে কৃষক সভার চতুর্থ প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভার স্থান ছিল যশোর জেলার কেশবপুর থানার পাঁজিয়া গ্রাম। ঐ সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পাবার জন্য আন্দোলন শুরু করা হবে। ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন জেলায় তেভাগা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, খুলনা এবং আরো অনেক জায়গায় তেভাগা আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে। সেখানে আমাদের সংগ্রামী ভাইয়েরা মরণপণ লড়াই করছেন। ভাইসব, আমরাও পিছিয়ে থাকব না, আমাদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে আমরাও যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। আপনারা জানেন, আমাদের জমিতে তেভাগা প্রবর্তন করা হয়েছে।

পরক্ষণে হেসে ফেলে ও। এই ছোট ঘরকে ও বিশাল জনসভা ভেবে বসেছে। পয়েন্টগুলো টুকে নেয়ার পর ও মনে মনে পুরো বক্তৃতা সাজিয়ে ফেলে। কাগজপত্র টেবিলে গুছিয়ে রেখে আবার বারান্দায় আসে। এখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরেক এলো না? ও অস্থির পায়ে বাগানে নেমে আসে। কেউ সময়মতো কাজ না করলে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হরেকের ওপর রাগ বাড়তে থাকে।

পরদিন রমেন ফিরে আসে। ওর এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনে খুশি হয় ইলা। যত কাজের মধ্যেই ডুবে থাকুক না কেন, রমেন না থাকলে বিষণ্নতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। রমেনের হাত থেকে ব্যাগ নিতে নিতে বলে, একটা খবর দিলে তো পারতে?

বাহ্ খবর দিয়ে এলে তুমি এমন অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেতে?

তা ঠিক। খুশিটা এখন চারগুণ।

মা কৈ?

তুমি এসেছো শুনেই রান্নাঘরে গেলেন।

রান্নাঘরে কেন?

বাহ্ মার আনন্দই তো ঐটা। তোমাকে খাইয়েই মার সুখ।

রমেন মাকে ডাকতে ডাকতে রান্নাঘরে যায়। তারপর ঘরে ফিরে ইলার কপালে চুমু খায়, মিটিংয়ের সব ব্যবস্থা ঠিক তো?

হ্যাঁ, প্রায়ই। ফণীদাকে দরকার ছিল। হরেককে বলেছিলাম আসতে, কাল ও আসেনি। তাই ফণীদাকে খবর দেয়া হয়নি।

ঠিক আছে, বাকি কাজ আমি গুছিয়ে ফেলব। এজন্যই তাড়াতাড়ি চলে এলাম। এটাই হচ্ছে আমাদের এলাকার সবচেয়ে বড় জমায়েত। একে সাফল্যমণ্ডিত করতেই হবে। এর আগে জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ইজারাদারদের বিরুদ্ধে এত বড় সভা হয়নি।

আমি বক্তৃতা তৈরি করেছি।

চমৎকার!

রমেন লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরে নেয়। হাসতে হাসতে বলে, আমার চাইতে তুমি বেশি সক্রিয়। দিনে স্কুল, রাতে পার্টি, এজন্যই তোমার প্রশংসা সবার মুখে মুখে। আমার মাঝে মাঝে ঈর্ষা হয়।

সত্যি বলছো?

ইলা বিস্ময় প্রকাশ করে। রমেন মিটিমিটি হাসি লুকোতে না পেরে বলে, তবে কি মিথ্যে? একদম সত্যি। তবে হাসছো যে?

এই যাহ্, ধরা পড়ে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজনের হাসির রেশ না ফুরোতে ভুপেন ওপাশ থেকে বলে, মা খাবার জন্য ডাকছেন।

বিকেলে হরেক আসে। মুখ শুকনো, কাঁচুমাচু ভঙ্গি। ইলার সামনে দাঁড়িয়ে মাটি থেকে চোখ ওঠায় না। ইলা গম্ভীর স্বরে বলে, কাল তোমার কি হয়েছিল হরেক?

আমাকে মাফ করেন মা, কাল আসতে পারিনি। আমার গরু হারিয়ে গিয়েছিল। কাল সারা দিন খুঁজেছি, আজ অর্ধেক বেলা, তারপর পেয়েছি।

পার্টির কাজের চাইতে গরু খোঁজা জরুরি হলো? আর তোমাকে যদি কোনো দায়িত্ব দিয়েছি?

হরেক ছিটকে ওঠে, প্রচণ্ড অভিমানে বলে, এমন করে বলবেন না মা। হরেক দরকার হলে পার্টির জন্য জীবন দিতে পারে।

তারপর দ্রুতপায়ে বেরিয়ে চলে যায়। ইলা বিমূঢ় হয়ে থাকে। ও এতটা ক্ষুব্ধ হবে ভাবতেই পারেনি। ও সঙ্গে সঙ্গে ভুপেনকে ডেকে হরেককে ধরে আনতে বলে। ইলা নিজের ভুল বুঝতে পারে। এরা একরোখা, আপসহীন এদের চরিত্র। সাঁওতালগুলো এ অঞ্চলের শক্তি, আন্দোলনের প্রাণবিন্দু। এদেরকে আরো মর্যাদার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। একটু পরে ভুপেন হরেককে নিয়ে ফেরে। ইলার সামনে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে! বোঝাই যায়, ওর অনমনীয় ভঙ্গি। ইলা নরম স্বরে বলে, আমার ভুল হয়েছিল হরেক। বোস। মুড়ি খাবে? ভুপেন, যা ওর জন্য মুড়ি নিয়ে আয়। কি হয়েছিল তোমার গরুর?

মনসুর জোতদারের ক্ষেতে ঢুকেছিল। তাই ওরা বেঁধে রেখেছিল।

কি করে ছাড়ালে?

সে অনেক বাক-বিতণ্ডা করে ছাড়াতে হয়েছে। সহজে কি দিতে চায়! শেষে বললাম, আমার একটা গরুর সর্বনাশ করলে তোমাদের সবগুলো শেষ করে ফেলব। তারপর নরম হলো। শেষে মনসুর জোতদার ক্ষতিপূরণ চাইল। আমি বললাম, পারব না দিতে, আমার সামর্থ্য কৈ? ওরা গড়িমসি করে, আমিও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। একটু পর মাতলা অনেক সাঁওতাল নিয়ে ওখানে পৌছুলে আমার গরু ছেড়ে দেয়।

ইলা হেসে বলে, তাহলে তো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি কিছুই জানতে পারিনি। কিছু মনে করো না হরেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও ফিক করে হেসে ফেলে। চক্‌চক্ করে ওঠে দাঁত। বড় সরল হাসি হাসে ও। ইলা মুগ্ধ হয়ে যায়, অনুতপ্তও হয়। ভুপেন মুড়ি আর পাটালি নিয়ে আসে। ও মুড়ি চিবুতে চিবুতে বলে, আমায় কি করতে হবে মা?

ফণীদাকে আসতে বলবে। আর জমায়েত যাতে ঠিকঠাক মতো হয়, সে জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে খবর দিতে হবে।

জমায়েত নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। হাজার হাজার লোক হবে দেখবেন।

হরেকের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

শুধু সাঁওতালরা নয়, শুক্র মাডাং-এর গান নয়, শোয়েব সরকারও গান বেঁধেছে শোষণের বিরুদ্ধে। সেই গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, গোবিন্দপুর হাটে উপস্থিত হবার জন্য সবাইকে ডাকে। ও যখন গলায় বাঁধা ঢোলে বোল তুলে একমাথা ঝাঁকড়া চুলে ঝাঁকি দিয়ে গান ধরে,

বাবু তোরাই হামাদেরকে সারলি হে বাবু
তোরাই হামাদের সারলি
খেটে-খুটে হামরা উঠাই
পাট তুলা ধান
তোমারই খেয়ে পরে হোস জ্যান্তবান
ও বাবু—

তখন সে কথা স্পষ্ট করে অন্যদের। ওর পেছনে লোক জমে যায়। কখনো ওর সঙ্গে সবাই ধুয়া ধরে। গানের মিছিল চলতে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামে, গান গেয়ে মানুষের হৃদয় মাতিয়ে তোলে ওরা। শোয়েব সরকারের গান সভার কাজ করে। ও প্রতিদিনই নতুন নতুন গান বাঁধে। শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও গান বেঁধে অন্যদের শেখায়। বেশ বড় গানের দল গড়ে উঠেছে ওর। মাঝে মাঝে গানের আসর বসে। সে গানে পার্টির বক্তব্য প্রচার করা হয়। গম্ভীরা, আলকাপ গান শোয়েব ছাড়া ভোলা, ইয়াসিনও ভালো রচনা করে। রাজনৈতিক চিন্তার আলোকে সুন্দর গান রচনা করে নিতাই। কৃষ্ণগোবিন্দপুরের সভা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ওরা বিভিন্নভাবে খাটছে। গান বেঁধে একেকজন একেকদিকে যাচ্ছে। সর্বত্র সাড়া, মানুষ ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসছে। শুধু ওদের বক্তব্যই সমর্থন করছে না, সক্রিয় সহযোগিতার কথাও বলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিটিংয়ের দিন কৃষ্ণগোবিন্দপুর হাট লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। চণ্ডিপুর, কৃষ্ণপুর, কেন্দুয়া, গাসুড়া, শিবনগর, মান্দা, গোলাপাড়া, মল্লিকপুর, কালুপুর, মহীপুর সব জায়গা থেকে দলে দলে লোক আসে। পিঁপড়ের সারি মতো মানুষ চারদিক ঘিরে ফেলে—শত শত কণ্ঠে স্লোগান ওঠে : জমিদারি প্রথা উচ্ছে কর, লাঙল যার জমি তার, ইজারাদারি বন্ধ কর—গর্জন থামে না, গর্জন ভেসে যায়, গর্জন স্রোত হয়ে মহানন্দায় মিলিত হয়। বক্তৃতা করে ফণীভূষণ মাস্টার, নওয়াবগঞ্জের পার্টি সেক্রেটারি মাণিক ঝাঁও, অজয় ঘোষ। সাজানো পয়েন্টের ভিত্তিতে ইলা মিত্র ইতিহাস টেনে এমন সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বক্তৃতা করে যে, সবাই অভিভূত হয়ে শোনে। বক্তৃতা নয়, যেন সামনাসামনি কথা বলে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছে বিষয়টি। হাজার হাজার লোকের সামনে এমন করে কথা বলে যেতে পারবে, নিজেও ভাবেনি ইলা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে, মুছতে পারে না, হাত আড়ষ্ট হয়ে আছে, বুকে কাঁপুনি, কিন্তু বুঝতে দেয় না কাউকে। প্রবল করতালিতে ওর বক্তৃতা শেষ হয়। প্রশংসদৃষ্টিতে তাকায় সবাই, সাফল্যের আনন্দে ও অভিভূত হয়ে যায়। সভা শেষে এক বিশাল মিছিল গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। প্রায় শ'তিনেক মহিলা অংশ নিয়েছে। গর্জে ওঠে স্লোগান : জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ কর, লাঙল যার জমি তার—লাঙল যার জমি তার—লাঙল যার জমি তার। এসব স্লোগান হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারিত হয়, ওদের ভাঙা পাঁজর থেকে বেরিয়ে আসে নিঃশ্বাসের মতো। এসব আকুতি উচ্চারণের জন্য ওরা নিজেদের ধন্য মনে করে—সামনে একটাই আশা, যদি কোনোদিন সত্য হয়ে ওঠে লাঙল এবং জমির অধিকার।

রাতে রমেন ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

তুমি পারবে ইলা। এসব গরিব চাষির জন্য তোমার হৃদয় তৈরি হয়ে আছে।

ও কথা বলে না। রমেনের বুকে মাথা রাখলে রমেন প্রবল আবেগে ওর চুলে মুখ গুঁজে দেয়।

স্কুল নিয়ে গ্রামের মাতবরদের মধ্যে বেশ একটা অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কৃষ্ণগোবিন্দপুর হাটের সভার পর জোতদাররা আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশি সোচ্চার, ওরা জ্বলছে, কীভাবে প্রতিরোধ করবে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। নাসের জোতদার গ্রামের মুরুব্বিদের নিয়ে তার বাড়িতে সভা ডাকে। উত্তেজিত ভাষায় বলে, নারীশিক্ষার নামে শরিয়তবিরোধী কাজ-কর্ম শুরু হয়েছে গ্রামে। এটা চলতে দেয়া উচিত নয়। আপনারা কি বলেন ভাইসব? বুড়ো মজিরুদ্দিন মাথা নাড়ে, হ্যাঁ, আমারও তাই মত। তাছাড়া দেখেন আমরা তো ঘরের মেয়েদের বেপর্দা হতে দেই না। স্কুলে যাচ্ছে চাষাভুষো ঘরের মেয়েরা। বেশি বাড় বেড়েছে ওদের।

ঠিক, ঠিক। সভায় গুঞ্জন ওঠে।

কাশেম ব্যাপারি নাকি সুরে বিচিয়ে বিচিয়ে বলে, ছোটলোকগুলোর আবার বিদ্যা শেখার শখ হয়েছে? ন্যাড়ার বেলতলা যাবার শখ আর কি?

হো-হো হাসির রোল ওঠে। নাসের জোতদারের কাচারি ঘরে সে হাসির রেশ মিলিয়ে গেলে পেছন থেকে উঠে দাঁড়ায় আজিজ। ও এসেছে সভার কথাবার্তা শুনতে। কথা ছিল, ও কোনো কথা বলবে না। শুধু শুনে আসবে। কিন্তু ঐ বিদ্রূপাত্মক হাসির পর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। কিছুটা রোষের সঙ্গে বলে, কিন্তু ঐ অশিক্ষিতগুলোরই বিদ্যা-শিক্ষার দরকার চাচা। জোতদারদের কাগজে ওরা কোথায় যে কি টিপ-সই দেয়, ওরা নিজেরাও জানে না। ফলে ঋণের বোঝা বয়ে বেড়ায় সারা জীবন। লেখাপড়া শিখলে, আর কিছু না হোক, নিজেদেরটা নিজেরাই বুঝে নিতে পারবে।

চোপ হারামজাদা, হুঙ্কার দিয়ে ওঠে ওর বাবা, ঐ হিন্দুগুলোর সঙ্গে মিশে বেত্তমিজ, বেয়াদব হয়ে গেছে। ছোটমুখে বড় কথা বলতে শিখেছে। আদব-লেহাজও ভুলতে বসেছে। কোথায় কি বলতে হয়, জানিস না?

বাবার রোষের সামনে কথা বলে না আজিজ। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যেটুকু বলেছে, ওটুকুই যথেষ্ট। ঐটুকু নিয়েই ওরা পুড়তে থাকবে। ও বেশ তৃপ্তির সঙ্গে পথে নামে। ঘরে এক অস্বস্তিকর নীরবতা। ছোটোখাটো কাশি ওঠে কেবল। একটুক্ষণ থম্ ধরে তাকে নাসের জোতদার, তারপর শুরু করে রমেন মিত্রকে উদ্দেশ্য করে গালাগাল। অশ্লীল খিস্তি-খেউড়ের তোড়ে তা ঘরের সবার মুখে মুখে ফেরে, সবাই নাসের জোতদারের সঙ্গে সঙ্গে রমেনসহ অন্যদের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করে।

দুদিন পর স্কুলপ্রাঙ্গণে বিতর্কসভার আয়োজন করে ইলা মিত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েদের শিক্ষা উচিত কি অনুচিত—এ বিষয়ে আলোচনা হবে। প্রচুর লোক সমাগম হয়। ইলা নিজে কিছু বলে না, বলতে দেয় অন্যদের। নিরক্ষর ক্ষেতমজুর ওয়াজেদ মোড়ল সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয় সে সভায়। গলা ফাটিয়ে বলে, মেয়েরা স্কুলে গ্যালে শরিয়ত বেপর্দা হয় বুল্যা চেঁচাচ্ছে গাঁয়ের বড় মানুষরা। হামার কথা হলো, শরিয়তবিরোধী কাজ হয় কুন্‌টা? জোতদারের বাড়িত কাম করল্যে বেপর্দা হয় না? বাঁদীগিরি করল্যে বেপর্দা হয় না? বড় মানুষের বাড়ির লাগ্যা যে মেয়েরা মেলা দূর-দূর থ্যাকা পানি অ্যানতেছে, কৈ এর লিগ্যাতো বেপর্দার কথা উঠে না? জোতদাররা যে ম্যায়া মানুষের ইজ্জত নষ্ট করে, তা শরিয়তবিরোধী কাজ লয়? জোতদাররা হামারঘে চুষ্যা খ্যায় বুল্যা চ্যায় না হামরা কিছু জ্যানব্যার পারি!

প্রাণের আবেগে অনেক কথা বলে যায় ওয়াজেদ মোড়ল। কোনো দিন বক্তৃতা করার কথা ভাবেনি ও, এই সুযোগ ওর জীবনে এক অভাবনীয় ঘটনা। সুযোগ পেলে ও যে গলগলিয়ে কথা বলতে পারে, এই কথাই বা কে জানতো? শ্রোতারা বিস্ময়ে ওয়াজেদ মোড়লকে দেখে। বাতাসে ওর শণের মতো কয়েক গাছি দাড়ি ওড়ে, মাথায় ময়লা টুপি, গায়ে রংওঠা জামা, চেক লুঙ্গি পরা রোগা-লম্বা লোকটির মুখজুড়ে দৃঢ়তা ফুটে থাকে, এক ধরনের পরিতৃপ্তি ও সভার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। ও হাত নেড়ে কথা বলছে, কখনো হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে নিচ্ছে, মাঝে-মাঝে শার্টের হাত গুটোচ্ছে, উত্তেজনায় ওর হাঁটু কাঁপে থরথর করে, ওয়াজেদ মোড়ল ভাবে, ওর জনম আজ সার্থক হলো। প্রবল করতালির মধ্যে ও যখন বলা শেষ করে, তখন ওর কপালে ঘাম জমে থাকে, ঠোঁটে মৃদু হাসি, আজিজ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলে ও বলে, মেলা দিন পর মনের কথা কল্যাম।

ইলা ভাবে, মনের কথা বলার জন্য কি লোকগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে? ওরা এখন মুক্তির পথ খুঁজছে। ওদের আফিমের নেশা ছুটেছে। ওরা এবার বেড়া ভাঙবে।

তখন বক্তৃতা শুরু করে কায়েস মণ্ডল, কিছুটা ভীতু স্বভাবের লোক, সাত চড়ে রা কাড়ে না, সে আজ নিজের থেকে কথা বলার জন্য উদগ্রীব হয়েছে। ওর ভেতর বুনো গোয়ার্তুমি আছে, বেশি উত্তেজিত হলে গোঁ গোঁ শব্দ করে কেবল, গুছিয়ে বলতে পারে না। তবু এসব লোকজন কথা বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায়, এটাই ইলার তৃপ্তি। কায়েস মণ্ডলের গলায় তেমন জোর নেই, কথা বেধে যায় বারবার, তবু বলার চেষ্টা করছে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নেয়, একটু পর 'ভাইসব' বলে শক্তি সঞ্চয় করে। এক সময় কায়েস মণ্ডল মরিয়া হয়ে বলে, হামরা জানি শরিয়তে সুদ খাওয়া হারাম। কিন্তু হামারগ্যে চারপাশে যারা আছে, তারা সুদের টাকার পাহাড় ব্যানাচ্ছে। তাদের কি সুদ হালাল? জোতদাররা, মহাজনরা ঋণের ট্যাকার সুদ খ্যায় ক্যান? হ্যাকের মুখে কি বড় কথা ম্যানায়? ক্যাবল যত দোষ হামারঘে, হামরা হামারঘে গায়ের চ্যামড়া দিয়্যা সুদের ঢোল ব্যানাই?

কিছুক্ষণ কথা বলে বসে পড়ে কায়েস মণ্ডল, কিছুটা লজ্জিত ভঙ্গি, লুঙ্গির নিচ ফেটে গেছে বলে গিট দিয়ে রেখেছে, গায়ে গেঞ্জি, মাথার চুলে একগাদা তেল, চক্‌চক্ করছে, কায়েস মণ্ডলের নাকের ডগা ফুলে থাকে। আজিজ ওর ঘাড়ে হাত রাখতে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলে, আরো কিছু কব্যার চাচ্ছিনু, ঠিকমতো কব্যার প্যারলাম না, মনত আসে না। আজিজ ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, আর এ্যাকদিন কব্যা। হামরা আবার সভা ড্যাকমু। কায়েস মণ্ডল ঘোঁত ঘোঁত করে বলে, হ ড্যাকেন। জোতদারঘে মুখে লাথ্‌থি। পেছন থেকে কেউ সায় দেয়, হ মুখে লাথ্‌থি। শব্দটা মুখে মুখে ফেরে, লাথ্‌থি লাথ্‌থি। এই শব্দ গিয়ে আছড়ে পড়ে জোতদারদের আঙিনায়। ওরা থ' হয়ে ভাবে, ছোটলোকগুলোর বেশি বাড় বেড়েছে। ওদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

শিবদাস ঘরের দাওয়ায় বসে খৈনি টেপে, চোখে ছানি, ভালো দেখতে পায় না। যেদিকে তাকায়, সবকিছু আবছা লাগে, যেন কখনোই দিন হয় না। ছেঁড়া ধুতি হাঁটুর ওপর উঠে গেছে, মোটা রগ জেগে আছে, কালো কুচকুচে কাঠির মতো পা-জোড়ায় হাত বুলোয় শিবদাস। কাঁচা গোবরের গন্ধ আসছে। সুখিয়া বোধহয় ঘরদোর লেপা-পুছা করছে, ও অনুমান করে। সুখিয়া ওর বড় ছেলে সুচন্দর বৌ, দুজনের প্রেমের বিয়ে। জাঁহাবাজ মেয়ে সুখিয়া। কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। ওর সামনে নিরীহ সুচন্দ কথা বলতে পারে না। ছেলের জন্য শিবদাসের মায়া হয়। কেমন করে যে ওদের প্রেম হলো, ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। সুখিয়ার ছেলে-পুলে নেই। বছর তিনেক আগে ওদের বিয়ে হয়েছে। শিবদাসের ঝিমুনি আসে। সকালে সুখিয়া ওকে কলাইয়ের ডালের রুটি দিয়েছিল, শুকনো এক টুকরো মাংসও ছিল সঙ্গে। খেতে খুব কষ্ট হয়েছে ওর, দাঁতে তেমন জোর নেই। কিন্তু কোনো অসুবিধের কথা সুখিয়াকে বলা যাবে না, শুনলে ও তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, হাজারটা গাল-মন্দ করে। বেলা কত আন্দাজ করতে পারে না শিবদাস। দাওয়ায় রোদ এলে ও বুঝতে পারে যে, সূর্য মাথার ওপর। শিবদাস গুনগুনিয়ে গান গায়। যৌবনে ও খুব নাচতে পারতো, সে নাচে পাগল হয়েছিল হরমণি, চল্লিশ বছর ঘর করার পর সে আগেই চলে গেল। বয়সের এই একাকিত্ব এখন ওর আর সহ্য হয় না। ও জ্বালা জুড়োতে চায়। শিবদাস বাম হাতের তর্জনী দিয়ে চোখ চুলকোয়, তখন ঢোল বেজে ওঠে। পুজোমণ্ডপ থেকে ঢোলের শব্দ আসছে। ও চোখের ছানি উপেক্ষা করে দৌড়ে দাওয়া থেকে নামে। সুখিয়া গোবরসহ হাত চুবিয়ে দেয় মাটির গামলায়, কাদা-মাখা হাত মুছে নেয় গায়ের কাপড়ে। ও যখন বাড়ির বাইরে আসে, দেখে, একটু দূরে আমগাছের নিচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে আছে শিবদাস, চোখ গোল হয়ে উঠেছে, মুখে গোঙানি। সুখিয়ার চেঁচামেচিতে ছুটে আসে দুচারজন। পাঁজাকোলা করে শিবদাসকে ঘরে আনে ওরা।

ঢোলের শব্দে জেগে ওঠে চণ্ডিপুর। নারী-পুরুষ-ছেলেবুড়ো—সবার মধ্যে চাঞ্চল্য। ওরা ছুটছে পুজো মণ্ডপের দিকে। আগামীকাল ওদের সূর্য পুজো। বছর পাঁচেক আগে ঠিক এইদিনে হয়েছিল। আজ ওদের আত্মশুদ্ধির দিন—ওরা সবার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করবে—দেবতার কাছে চাইবে, যেন রোগ-জ্বরা থেকে মুক্ত থাকতে পারে, অভাব যেন ঘুচে যায়, ওরা যেন কোনো পাপ কাজে নিমগ্ন না হয়। যেখানে দেবতার উদ্দেশ্যে ছাগল পুজো হবে, সে-জায়গাটা গোবর দিয়ে লেপে পবিত্র করা হয়েছে। ঢোল বাজছে, ঢোল থেকে গেলে বাঁশি বাজে। ছোট ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে বসে আছে। বড়রা নতমস্তকে প্রণামের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে—নিজেকে শুদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টায় ওরা ধ্যানমগ্ন।

দুটো শাদা ছাগল নিয়ে পুজোমণ্ডপে আসে দিনু ধর, ও মাতলার ছেলে। ছাগল দুটো পুজোর জন্য মাতলার বাড়িতে বড় হচ্ছিল। শাদা ছাগল সব সময় পাওয়া যায় না বলে অনেক আগে থেকে সংগ্রহ করে আদর যত্নে এগুলোকে বড় করা হয়। দেখতে নাদুস-নুদুস ছাগল দুটো একটানা চেঁচিয়ে যায়। দিনু ধর নানাভাবে আদর করছে। একগাদা কাঁঠাল পাতা দিয়েছে। কিন্তু খাওয়ায় ওগুলোর মন নেই। এদিক-ওদিক তাকায় আর চেঁচায়। মাঠ থেকে গরু চরিয়ে ফিরে আসার পথে হরেক থমকে দাঁড়ায়, ঢোলের শব্দে বোধহয় এমন করছে দিনু, ঐ দিনের ঐ কাঁঠাল গাছের নিচে নিয়ে যায়। আমি গরু রেখে আসছি। চান করিয়েছিস? দিনু মাথা নাড়ে, এখনো করাইনি। তুই যা, আমি আসছি। দিনু ধর ছাগল নিয়ে চলে যায়। ওর খুব মন খারাপ। গত দুবছর ও নিজে ছাগল দুটো পেলেছে, আজ রাত পোহাতে ওগুলো বলি হবে ভাবতেই ওর কান্না পায়। কিন্তু কারো সামনে এ কথা বলার উপায় নেই। ও কাঁঠাল গাছের দিকে যেতে যেতে চোখের জল মোছে। কিসের পুজো, কিসের কি ভেবে মন বিদ্রোহ করে উঠতে চাইলে, ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রবলভাবে শাসন করে। এমন করলে পুজো হবে না। বড়রা জানতে পারলে ওকে মেরে ঢোল বানাবে। কাঁঠাল গাছের নিচে এসে ও পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। একমাত্র হরেকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে ও মনের কথা বলতে পারে। ও বোঝে, ও কিছুটা আলাদা। দিনু ধর দেখতে পায়, দূর থেকে হরেক আসছে।

সারা দিনে শিবদাসের জ্ঞান ফেরে না। সুচন্দ ডাক্তারের জন্য লোক পাঠিয়েছে। নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী যতটুকু পারছে, সেবা করছে। কেন্দুয়া আর ঘাসুড়ায় দুবোনের বিয়ে হয়েছে, ওদের আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছে। আর কি করবে সুচন্দ? মাথার কাছে বসে ততক্ষণ ব্যাকুল হয়ে কেঁদেছে। তাই দেখে মুখ ঝামটা দিয়েছে সুখিয়া, ঢং, বুড়ো মানুষ, মরবার সময় হয়েছে মরবে। কান্নাকাটি করে ঢং দেখানো হচ্ছে! সুচন্দ চুপ করে থাকে। ও জানে, বাবা মরে গেলে সুখিয়া খুশি হবে। খাবার একজন লোক কমে যাবে। ওর দুঃখ, বাবা সূর্য পুজো করে যেতে পারল না। ওর সংসারে ছেলেপুলে নেই। রাত-দিন দাওয়ার ওপর বসে থাকা বাবাকে ওর শিশুর মতো লাগত। ঐ শূন্য বারান্দা সুচন্দের বুকের ওপর চেপে বসে। ঢোলের শব্দ ওর বুকে হাতুড়ির মতো পড়ছে। সুচন্দ ঠিক করে, এবার পুজোয় ও সুখিয়ার জন্য প্রার্থনা করবে। ও জানত না, সুখিয়ার মনে এত লোভ, ভগবান সুখিয়া যেন ভালো হয়, নিলোভ হয়, যাতে ওর বুড়োকালের দিনগুলো শান্তিতে কাটে। যৌবনে যন্ত্রণা সহ্য করা যায়, বুড়ো বয়সে যায় না। পড়ে গিয়ে থুতনি কেটে গেছে, হাঁটু ছিলে গেছে, বুকে আঁচড় লেগেছে শিবদাসের। শিবদাসের কাটা থুতনির দিকে তাকিয়ে সুচন্দ সিদ্ধান্ত নেয় যে, বুড়োকালে সুখিয়া বেশি যন্ত্রণা দিলে ও ধুতুরার বিষ খেয়ে মরবে। ওর বেশি বাঁচার শখ নেই। বাবার গায়ে চাদর টেনে দিয়ে ও বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। রোদ চন্‌মনে দিনের শেষ। চণ্ডিপুরের ওপর দিয়ে খুশির হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, ঢোলের শব্দে মানুষের আত্মা বিশুদ্ধ হচ্ছে, ঘরে ঘরে বাড়তি খাবার রান্না হচ্ছে, সুখিয়া কি যেন রাঁধছে, তার গন্ধ আসছে, শুধু সুচন্দ একা শোকার্ত। কারো সঙ্গে ও দুঃখ ভাগ করতে পারছে না, ওর কেউ নেই, সুখিয়া ওকে বোঝে না, ও মন স্থির করতে পারছে না যে, আজ ও ঠাকুরের কাছে কি চাইবে? ও বারান্দা থেকে নেমে পাশের বাড়িতে আসে। এটা বুরং-এর ঘর, ও দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ। কী যে অসুখ, কেউ বুঝতে পারে না। ও রাত-দিন ঘরেই থাকে। ওর স্ত্রী দিনমণি অন্যের জমিতে কাজ করে যা রোজগার করে, তাই দিয়ে সংসার চলে। ওদের দশ বছরের চেলে মিসমি, ছটফট, চঞ্চল। স্বাস্থ্যে রোগা; কিন্তু বুদ্ধিমান। সুচন্দকে পেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার রকম প্রশ্ন করে। বাবার সঙ্গে ওর সদ্ভাব নেই, শরীর খারাপ বলে বাবা ওর প্রশ্নের জবাব দেয় না, ওর দুষ্টুমিতে তেমন সাড়া দেয় না, তাই সব অত্যাচার সুচন্দর ওপর। সুচন্দ ঘরে ঢুকতেই মিসমি দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে, কাকু ঠাকুর জিয়োর কাছে কি চাইবে তুমি?

সুচন্দর বুক ফুলে ওঠে, নিজেকে নির্ভার মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে বলে, তোমার মতো একটি ছেলে চাইব।

মিসমি হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে, তাহলে খুব মজা হবে। আমরা দুজনে শিকারে যাব।

দিনমণি সুচন্দকে বসার জন্য পিঁড়ি এগিয়ে দেয়। ও বসলে মিসমি ওর কোলে চেপে বসে। সুচন্দ ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে, ঠাকুর জিয়োর কাছে তুমি কি চাইবে মিসমি?

ও এক মুহূর্ত না ভেবে বলে, আমি বলব, আমার বাবাকে ভালো করে দাও ঠাকুর। আমি বাবার সঙ্গে শিকারে যাব। বুরং কাশতে কাশতে বলে, সুচন্দ, হরেককে বলো, ওকে শিকারে নিয়ে যেতে, ওর খুব ইচ্ছে।

ঠিক আছে, সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। ঠাকুর জিয়োর কাছে তুমি কি চাইবে বৌদি?

দিনমণি চুপ করে থাকে। বাজার থেকে ফেরার পথে ভোলা এক সের আলু দিয়েছিল। বিকেলে সেগুলো সেদ্ধ করেছিল, এখন ছিলে নিচ্ছে। আজ রাতে এই খেয়ে কাটিয়ে দেবে। বুরং কাশি চাপতে চাপতে বলে, ও কিছু চাইবে না ঠাকুরের কাছে।

কেন?

সুচন্দ বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যায়। সারা গ্রাম এই পূজোর জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, আর দিনমণি কি না—। তখন দিনমণি আঁচলে চোখের জল মুছে বলে, গত দুটো পুজোয় ঠাকুরকে বলেছি, ঠাকুর ওকে ভালো করে দাও। ঠাকুরের দৃষ্টি আমার দিকে তো পড়ে না?

এই নিয়ে মন খারাপ করতে নেই বৌদি।

দিনমণি মাথা নিচু করে কাজ করে যায়। বুরং বালিশে মাথা এলিয়ে দেয়। ওর একবার উঠে বসার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু ভালো লাগল না। মিসমি এর-ওর মুখের দিকে তাকায়। তারপর কথা খুঁজে না পেয়ে বলে, পিঁলচু হড়ম আর পিলচু বুড়ির গল্পটা বলো না কাককু?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর একদিন মারাংচুরো আমাদের বাবা আর মায়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের দিন সে কী ধুমধাম হলো, ঢোল বাজল, শুয়োর জবাই হলো। সারা রাত ধরে চলল নাচ-গান। পিলচু বুড়ির নাচ আর থামে না। শেষে মারাংচুরো বলল, তোমাদের একটা নতুন জিনিস শেখাব। পিলচু বুড়ি নাচ থামিয়ে মারংচুরোর কাছে এসে বসল। বিয়ের আনন্দে পিলচু হড়মের আনন্দের শেষ নেই। ও কেবল বাঁই-বাঁই ঘোরে। নতুন জিনিস বানাবে শুনে সেও দৌড়ে এসে কাছে বসে। মারাংচুরো ওদের হাঁড়িয়া বানাতে শেখায়। সে কী দারুণ মজা! তারপর রাত পোহালে মারাংচুরো চলে গেলে দুজনে সুখে সংসার করতে লাগল। সেই থেকে পৃথিবীতে মানুষ জন্মাতে শুরু করল। হাজার মানুষে ভরে গেল পৃথিবী।

আমিও বুঝি পিলচু হড়ম আর পিলচু বুড়ির কাছ থেকে এসেছি?

হ্যাঁ, তাই তো।

কী মজা!

মিসমি হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। বুরং ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, তোমাকে পেলে ও খুব খুশি হয় সুচন্দ। আমি ওর বাবা হয়েও ওর জন্য কিছু করতে পারলাম না। দিনমণিও আমার বোঝাই কেবল টেনে গেল।

বৌদির মতো কেউ হয় না।

এটুকুই তো শান্তি।

এই কথাটুকু সুচন্দের ভালো লাগে না। ওর বুকে ঈর্ষা জন্মে। দিনমণিকে দেখে ওর বুকে আকর্ষণ বাড়ে। ঐ শান্তিটুকু ও চায়। হঠাৎ করে ওর মনে হয়, বুরং মরে গেলে ও দিনমণিকে বিয়ে করতে পারে। ঠাকুর জিয়ো বুরং-এর মরণ দাও। দাঁত কিড়মিড়িয়ে ওঠে ওর। তবু শান্ত গলায় বলে, আমি যাই বুরং। তুমি ঘুমিয়ে পড়।

দিনমণি ওর পিছুপিছু উঠোন পেরিয়ে আসে।

ঘরে যাও বৌদি। তোমার ধৈর্য দেখলে আমার হিংসে হয়।

আর তো পারি না। মন যে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মুখে তা স্বীকার করবে না।

সুচন্দ দ্রুত পায়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। এই পরিবারটির সঙ্গে অনেকদিন ধরে ওর ঘনিষ্ঠতা। এই নিয়ে সুখিয়া খোঁচা দিতে ছাড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তা উপেক্ষা করে ও। কোথাও গিয়ে দুদণ্ড জিরোবার উপায় নেই। সবখান থেকে জ্বলুনি নিয়ে ফিরে আসতে হয়। কোথায় ওর স্বস্তি?

বারান্দায় পা দিতে না দিতে সুখিয়া চেঁচিয়ে ওঠে, কোথায় গিয়েছিলে? কোন মড়া পোড়াতে, নাকি মাগ-ভাতার খেলতে? আমি তো হাত পুড়িয়ে রেঁধেই রেখেছি, এসে গিললেই হয়!

সুচন্দ কোনো কথা না বলে শিবদাসের বিছানার কাছে যায়। একইভাবে শুয়ে আছে শিবদাস, কোনো সাড়া শব্দ নেই, কেবল বুকের খাঁচা ওঠানামা করে। কুপিতে তেল শেষ হয়ে এসেছে, ও আরেকটু তেল ঢেলে দিলে ওটা আবার দপ্‌দপিয়ে জ্বলে ওঠে। ঘরের কোনে খাবার সাজিয়ে রেখেছে সুখিয়া, একটানা বক্‌বক্ করে যাচ্ছে ও, কথা ফুরোয় না। ওর রান্না থেকে চমৎকার গন্ধ আসছে, খিদে পায় সুচন্দের, কিন্তু মন বিরূপ হয়ে আছে, খাবার ইচ্ছে হয় না। আজ শিবদাস ওদের সঙ্গে খাবে না। এখন পর্যন্ত একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে পারেনি নরেন। ও কেমন অসহায় বোধ করে। সুখিয়ার গলা চড়েছে। সুচন্দ চুপচাপ থাকলে ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ক্রমাগত বকতে থাকে। সুখিয়া ভাতের থালা ঠেলে দেয় ওর দিকে, খাও? সুচন্দ থালা টেনে নেয়, ও জানে, না নিলে ওই থালা ভাতসহ ওর গায়ে গড়াবে। বনমোরগের মাংস শাদা ভাতের ওপর লাল হয়ে আছে, যেন দুই রঙের ফুল ফুঠে আছে। সুচন্দ খেতে পারে না, বুকের ভেতর প্রচণ্ড কষ্ট, শিবদাস বনমোরগের মাংসের জন্য লোভীর মতো চেয়ে থাকত। সুখিয়াকে লুকিয়ে ও নিজের ভাগ শিবদাসকে দিত। ও হঠাৎ করে শিবদাসের বুকের ওপর মাথা রেখে হু-হু করে কেঁদে ওঠে। তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে সুখিয়া, ঐ বুড়ো ন্যাড়াখোড়া মরেও না। মরলে আমার জ্বালা জুড়োয়। এমন ঢং আর দেখতে হবে না। সুখিয়া নিজের ভাত রেখে উঠে আসে। হেঁচকা টানে সুচন্দকে সোজা করে দেয়।

গেল।

ও ভাতের থালা সুচন্দর সামনে তুলে ধরে। সারা দিন কষ্ট করে রান্নার পর সুচন্দর সেদিকে খেয়াল নেই, পাড়া বেরিয়ে এসে আবার বাপের জন্য কাঁদতে বসেছে। ওর বুক জ্বলে যায়। নিজের ভাতটাও ঠিক মতো খাওয়া হয় না সুখিয়ার। সুচন্দ গপ্‌গপিয়ে কয়েক গ্রাস ভাত খেয়ে এক গ্লাস পানি খায়। ভাতের থালা একপাশে ঠেলে রেখে ও বারান্দায় এসে বসে। সুখিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার রকম কথা তুলে বক্‌বকিয়ে যাচ্ছে। সুচন্দ অকস্মাৎ সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলে। ওর কেবলই মনে হয়, এই অন্ধকারের শেষে সূর্য উঠলে শুরু হবে পুজো। ও মনে মনে বলে, ঠাকুর জিয়োকে বলবে পরজন্মে দিনমণি যেন ওর বৌ হয়।

সূর্য পুব আকাশে গাঢ় লাল ছড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বলি হয় শাদা ছাগল। নারী-পুরুষ প্রার্থনা করছে। ঢোল বাজছে মৃদু লয়ে। পুরোহিতের কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। নিজেকে সুখী মানুষ মনে হয় সুচন্দর। ও কায়মনে প্রার্থনা করছে। সুখিয়া কোথায় ও জানে না। মিসমিকে নিয়ে দিনমণি এসেছে। ছাগল রান্না হচ্ছে। দেবতাকে ভোগ দিয়ে ওরা পাবে প্রসাদ। গিজ্‌গিজ্‌ করছে লোকজন। আশেপাশের গ্রাম থেকেও এসেছে অনেকে। সুচন্দ প্রার্থনার পর এক কোণে চুপচাপ বসে থাকে।

মাতলা এসে ওর পাশে বসে, কিরে, মন খারাপ?

না তো।

সুচন্দ কিছুটা বিব্রত হয়।

আজ আনন্দের দিনে এমন করে বসে রয়েছিস?

ও চুপ করে থাকে। মাতলা নিজের থেকেই বলে, বাবার শরীর খারাপ, সে জন্য? কি করবি, সবই ভগবানের ইচ্ছা।

মাতলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এ গাঁয়ের বয়সী বুড়ো শিবদাস, তার চেয়ে বেশি বয়সী কেউ নেই। পুজোর যোগাড়ে ব্যস্ত ছিল বলে বুড়োকে দেখতে যাওয়া হয়নি। মন খচ্‌খচ্‌ করছে। সুচন্দ হয়তো এজন্য ওর সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলছে না।

চল সুচন্দ, কাকাকে দেখে আসি।

বাবা তো বেহুঁশ হয়ে আছে।

ভাবিস না। দুপুরের পর গরুর গাড়ি দিয়ে নওয়াবগঞ্জ পাঠিয়ে দেব। হাসপাতালে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

নরেনকে পাঠিয়েছিলাম ডাক্তারের জন্য। ডাক্তার নাকি অন্য গাঁয়ে রোগী দেখতে গেছে। কাল দুপুর নাগাদ ফিরবে।

দুজনে হাঁটতে থাকে। মাতলার মন খচ্‌খচ্‌ করে। শিবদাসকে কোনো দিন অসুস্থ হতে দেখেনি ও। নানা ব্যাপারে ওর সঙ্গে আলাপ করলে খুব ভালো পরামর্শ পাওয়া গেছে। কোনোদিন কুপরামর্শ দেয়নি, এমনকি শত্রুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারেও না। সেই মানুষটি এখন অন্য জগতে চলে যাচ্ছে। বিছানার পাশে চুপচাপ বসে থাকে মাতলা, ঘরটা অন্ধকার, বুকের ওঠানামা ছাড়া কিছুই বোঝা যায় না। নিমীলিত চোখ, কালো পুরু ঠোঁট, মোটা নাক, চওড়া কপাল, নিয়ে শিবদাস নেতিয়ে শুয়ে আছে। মাতলা হাত ধরে, বুকের ওপর হাত বুলিয়ে দেয়, মনে মনে শিবদাসের জন্য যন্ত্রণায় ও তড়পায়। বাবার মৃত্যুশয্যায় নিজের জীবনের ব্যর্থতা ওকে প্রবলভাবে তাড়িত করে। ও ঠাকুর জিয়োকে স্মরণ করে। আর কেইবা আছে যে, ওকে মানসিক আশ্রয় দেবে?

একটু পর মাতলা বেরিয়ে এলে ও হাত চেপে ধরে।

বাবা বাঁচবে তো?

মাতলা হাত ছাড়িয়ে নিঃশব্দে বারান্দা থেকে নেমে আসে। একবারও পিছু ফিরে তাকায় না। সুচন্দ ওর সঙ্গে বেশখানিকটা এলে মাতলা বলে, তুই ঘরে যা সুচন্দ, আমি গরুর গাড়ির জোগাড়ে যাচ্ছি। বাঁচা-মরা সব ভগবানের ইচ্ছা ও ফিরে এসে বারান্দায় বসে। ঘরে ঢুকতে ওর ভয় করে। সারা বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। সুখিয়া নেই। ওর বুক ফেঠে কান্না আসে। ও হাঁটুতে মুখ গুঁজে চোখের জল মোছে।

ঘণ্টাখানেক পর গরুর গাড়ি নিয়ে ফিরে আসে মাতলা। গাড়িতে প্রচুর খড় বিছিয়ে নরম বিছানা তৈরি হয়েছে। খড়ের ওপর কাঁথা বিছিয়ে দেয় সুচন্দ। দরজা দিয়ে সামান্য আলো প্রবেশ করে ঘরে। জানালা নেই বলে বেশিরভাগ সময়ই অন্ধকার থাকে। ওরা তিন-চারজন ঢোকে শিবদাসকে কোলে করে গাড়িতে ওঠাবে বলে। মাতলা সবার আগে। কিন্তু শিবদাসের গায়ে হাত দিয়ে নথর হয়ে যায় ও। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শিবদাস।

সূর্য পুজোর দিন গাঁয়ের সবচেয়ে বয়সী বুড়োটি মারা যায়।

উৎসব শেষে আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে মাতলা—নিজের পঁচিশ বিঘা জমি চাষের পরও আধিতে চাষবাস আছে—পার্টির কাজ আছে। সাঁওতালি ভাষায় বক্তৃতা রপ্ত করার পর ব্যস্ততা আরো বেড়েছে। ইলা বলে, মাতলা আমার চাইতেও ভালো বলে। ও মনে মনে খুশি হয়, কখনো খুশি প্রকাশ করে ফেলে। দ্বিগুণ উৎসাহে জোয়ান ছেলেদের নিয়ে ঘরোয়া সভা করে। ওদের জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বোঝাতে বোঝাতে ঘৃণায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেটে পড়ে। ইদানীং শরীরটা খারাপ যাচ্ছে ওর। পায়ে গোদ হয়েছে, ব্যথা আছে, হাঁটতে কষ্ট হয়। এখনো ডাক্তার দেখানো হয়নি। ওর বউ কি যেন পাতার রস ছেঁচে খেতে দেয়। তাতে খুব একটা কাজ হচ্ছে বলে মনে হয় না। কেবলই ভাবে, শরীরের দিকে সময় দেবার সময় কৈ? পার্টির কাজ নেশার মতো ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ক'দিন পর ওকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘরোয়া পরিবেশে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ দেয়া হয়। ঠিক হয়, ওর বাড়িতে একটা ক্যাম্প করা হবে। ওখানে ছেলেদের তীর-ধনুক শেখানো হবে, পুলিশী তৎপরতার বিরুদ্ধে কিভাবে নিজেকে বাঁচাতে হবে, আন্ডারগ্রাউন্ডে কিভাবে থাকতে হবে—ইত্যাদি শেখানো হবে। ক্লাস নেবে রমেন, ফণীভূষণ, ইলা। অনুষ্ঠানে সবাইকে মিষ্টি মুখ করায় ইলা।

তোমাকে দশটা খেতে হবে মাতলা। নইলে পার পাবে না।

এত খেলে যে ভুঁড়ি ফেটে মরব। তখন পার্টির কাজ কে করবে?

তাই তো।

ইলা কিছুটা বিব্রত হলে সবাই হো-হো করে হাসে। মাতলার মনে হয়, আজ ওর জীবনের একটি পরম পাওয়ার দিন। হরেক মাতলার গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। সভায় সবারা ঠিক হয়, আর কিছুদিনের মধ্যে ধান উঠলে মহীপুরের জমিদারের গোলা লুট করা হবে। লোকটা বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

দুদিন পর গরু চরাতে গিয়ে বটের ডালে একটা ঘুঘুর দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায় হরেক। চক্‌চকে পালকে রোদ ঠিকরে পড়ছে। খয়েরি রঙে শাদা ফোঁটা-ফোঁটা দাগ, পাখিটা আপন মনে ডাকছে, কোনো দিকে খেয়াল নেই। হরেক কোমর থেকে গুল্‌তি বের করে। গরু নিয়ে এলে তৈরি হয়েই আসে ও। ওর কোমরে ছোট ছুরি, লবণ-মরিচের গুঁড়ো এবং দিয়াশলাই থাকে। ও একটুক্ষণ কান পেতে শোনে, মনটা কেমন করে ওঠে। পর মুহূর্তে শিকারি হাত নিশপিশ করে উঠলে ও গুল্‌তি তাক করে। বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ে ডানা ছাপটায় পাখিটা। ও দৌড়ে গিয়ে ধরে কোমর থেকে চাকু খুলে গলা কেটে ফেলে, তারপর দ্রুত হাতে পালক ছাড়িয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে। চার-পাঁচটা বটের পাতা কাঠি দিয়ে গেঁথে তার ওপর পাখিটা রেখে ছুরির মাথা দিয়ে চিরে নেয় গোটা শরীর, তারপর খুব করে লবণ-মরিচের গুঁড়ো মাখায়। শুকনো ডাল জ্বালিয়ে পাখিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝলসায়। পেটের যে জায়গা কেটে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করেছে, সে ফুটোয় একটা লাঠি ঢুকিয়ে ওটাকে আগুনের ওপর ধরে। এভাবে পাখি ঝলসে খেতে ওর ভালো লাগে। বাতাসে সুগন্ধ ছড়িয়ে গেলে বারবার ওর জিভে জল আসে। পাতার ওপর পাখিটা ঠাণ্ডা হবার জন্য রেখে ও পা ছড়িয়ে বসে।

দেখতে পায়, দূরে রাস্তার মোড়ে চারজন পুলিশ। ওরা এ গাঁয়েই আসছে। হরেকের আর পাখি খাওয়া হয় না। ও মাতলাকে খবর দেবার জন্য পাখিটা হাতে ঝুলিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়ুতে থাকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১

আছিয়া একদৃষ্টে কুতুবের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চেহারা ক্রূর, কাউকে হাতের কাছে পাবার জন্য উস্‌খুস করছে এমন একটা ভাব। আছিয়ার কিছুটা ভয়ও করে, মোলায়েম কণ্ঠে বলে, বাপজান, কথা বলবে না?

কুতুব আছিয়ার চোখে চোখ রেখে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলে, জোহরা গলায় ফাঁস দিয়ে মরেছে।

কুতুবের চোখের পাতা পড়ে না, মণি নড়ে না, আছিয়ার মুখের ওপর থেকে চোখ সরে না।

কুতুব?

আছিয়ার অস্ফুট আর্তনাদ ওর কানে ঢোকে না। ওর মনে হয়, সোনা মসজিদের সবুজ মখমলের মতো ঘাসের ওপর শুতে পারলে ও একটা চমৎকার ঘুম দিত। কতকাল ওর ঘুম হয় না, বড় প্রয়োজন ঘুমের। কুতুবের বুকে পিপাসা, ও বারান্দা ছাড়িয়ে উঠোনে নামে।

আছিয়া পথ আগলে দাঁড়ায়।

কোথায় যাচ্ছ?

আপনার রেড়ি বাগানে।

কেন?

গাছপালার মধ্যে ঠাণ্ডা বেশি। আমার শরীরে আগুন, জ্বলে-পুড়ে যাই কেবল।

বাপজান?

আমি যাই।

খবরটা কোথায় পেলে?

জোহরার শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে। খবর শুনে ইয়াসিন কুত্তা দৌড় দিল। থুঃ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুতুবের মুখ শুকনো, থুতু আসে না। আশ মিটিয়ে থুতু ফেলতে পারে না।

সেদিন মেয়েটার বিয়ে হলো, আর এর মধ্যে মরল?

ওর সাহস আছে, আমার চাইতে বেশি সাহস। ও আমার জন্য মরতে পারল, আমি পারলাম না। আমি কি একটা মরদ? আমি তো বলদ। মানুষের ছেলে না।

কুতুবের শরীরে হাহাকার ফেরে। আছিয়া ওর ঘৃণা দেখে, যন্ত্রণা দেখে। ভালোবাসা কি এমনই ছোবল মারা? সমস্ত মরীর, হৃদয় বিষাক্ত করে দেয়? ওর নিজের জীবনে এমন ভালোবাসার অভিজ্ঞতা হয়নি। জীবনের এই মধ্যসীমায় এসে আছিয়া কুতুবের মতো বালোবাসা পেতে চায়। আর কি সময় আছে? তীব্র ক্ষোভে কেবলই মনে হয়, জীবনে কোনো কিছুই পাওয়া হলো না।

কুতুব উঠোন পেরিয়ে যায়। আছিয়া দ্রুত ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

বাপজান, আজান পড়লে ঘরে আসবে? ঝাপ-ঝাড়ে সাপ আছে।

কুতুব মৃদু হাসে, উপেক্ষার হাসি।

আমি ভাত রাঁধব। তুমি খাবে?

খাব।

আমাকে না বলে চলে যাবে না তো?

না, যাব না। আজ রাতে আপনার এখানে থাকব।

থাক বাপজান, থাক।

কুতুবের জন্য কিছু করতে পারার খুশিতে আছিয়ার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কুতুব রেড়ি বাগানোর দিকে চলে গেলে ও দ্রুত রান্না ঘরে আসে। রেড়ির ডাল ভীষণ নরম, অল্প চাপে ভেঙে যায়। রান্না ঘরের বারান্দায় বসে শুকনো ডাল ভাঙে। এক্ষুণি রান্না শেষ করবে।

সিতারা? ও সিতারা?

আম্মা, কি কহাচ্ছেন?

আজ কুতুব আমাদের বাড়িতে থাকবে সিতারা। তুমি তাড়াতাড়ি রান্নার যোগান দাও।

সিতারা জানে, আছিয়া অনেক সাধাসাধি করে কুতুবকে রাখতে পারে না, খাওয়াতে পারে না। ওর খট্‌কা লাগে। সত্যি, কুতুব থাকবে তো? পানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনতে গিয়ে ও দেখেছে, কুতুব পুকুরপাড়ের রেড়ি গাছের ঘন ঝোপের নিচে বসে আছে। মানুষের ঐভাবে বসে থাকা দেখলে ওর ভীষণ হাসি পায়। সিতারার দুঃখের তীব্রতা কম। ও জানে, বেঁচে থাকার জন্য ভাতের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। বাকি সবকিছু বিলাস এবং আমোদ। কাজ করতে করতে বারবার আনমনা হয়ে যায় আছিয়া। রেড়ির তেল শিশিতে ভরে ওঠানো হয়েছে। ইয়াসিনের জন্য আলাদা করেছে। ছোবড়াগুলো ডালায় মেলে রেখেছে রোদে শুকুবার জন্য। মানুষের জীবনও কি এমনি? নির্যাস বের করে নিলে ছোবড়া পড়ে থাকে। জোহরা কি ছোবড়া? কুতুব কি? ওর শরীরের নির্যাসও তো শুকিয়ে গেছে? ও কেমন করে বাঁচবে? কয়েদ চাচা কি বেঁচে নেই? এটাকে কি বেঁচে থাকা বলে? ও নিজেও তো বেঁচে আছে। এটাকে কি বেঁচে থাকা বলে? তাহলে বেঁচে থাকা কেমন? আছিয়ার গলার কাছে কষ্ট দলা পাকিয়ে ওঠে। ওর অস্বস্তি বাড়ে।

সিতারা? ও সিতারা?

আম্মা।

তেলের কড়াইটা মেজে ফেলো।

য্যাই।

না থাক। তুমি জিয়োল মাছ উঠাও। কুতুবের এই মাছ পছন্দ। একবার পোলোর নিচে এই মাছের কাঁটা খেয়ে পনেরো দিন হাতে ঘা ছিল। সে কী আজকের কথা!

আছিয়া নিঃশ্বাস ফেলে। সিতারা অকারণে ঘাড় নাড়ে।

ও সিতারা, চাল ধুয়ে আনলে না? তোমাকে নিয়ে আর পারি না। কাজে মন দাও বললাম।

সিতারা বিস্মিত হয়। আছিয়া আজ যেন অসংলগ্ন বকছে। এক সঙ্গে এত কথা কখনো বলে না। এত অস্থির কেন আছিয়া? আজ কি ইয়াসিন বসনি আসবে? কিন্তু তার জন্য তো আছিয়া এত উতলা হয় না? তার আসা-যাওয়া তো এখন আর কোনো ব্যাপার নয়। আছিয়ার হাতের কাজ থেমে গেছে। উদাস চোখে তাকিয়ে আছে, যেন জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার গ্লানি ওকে বিমূঢ় করে রেখেছে।

সিতারা, আমার বাপের দাদার দাদা না মস্তবড় বসনি ছিল।

সিতারা সে কথা শুনতে পায় না। ও চালের গামলা নিয়ে কুয়োপাড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। তার আগে ও কালো কুচ্‌কুচে রঙের বড় লোহার কড়াইটা মাজবে। আছিয়ার বাপের দাদার দাদার গল্প ও অনেক শুনেছে। আছিয়া ফাঁক পেলে সে গল্প বলে, বলতে ভালোবাসে। সিতারা জানে, রূপকথার মতো সেইসব দিন। ওদের এইসব দিন কি একশো বছর পর রূপকথা হবে? ধুৎ কেমন করে? ওর হাসি পায়।

আছিয়া চুলোয় আগুন দিয়েছে, দাউ দাউ জ্বলছে আগুন, সোনার মতো রঙ। ওর বাবা বলত, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মালদহে তাদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। পলু পোকার চাষ এবং কাঁচা রেশম উৎপাদনের সুবিধার কারণে কোম্পানি এখানে কুঠি স্থাপন করে। পরে ইংলিশ বাজারে একটি বাণিজ্যিক রেসিডেন্সি খোলা হয়। সেখানে যে কারখানা ছিল, তার দেয়াল ছিল অনেক উঁচু, ডিঙিয়ে ঢোকার সাধ্য ছিল না কারো। তার প্রতি কোণে একটি করে মোট আটটি কামান বসানো ছিল। স্থানীয় লোকেরা এই রেসিডেন্সির নাম দিয়েছিল বড়ি-কুঠি। আছিয়ার বাবার দাদার দাদা ছিল এলাকার সবচেয়ে বড় রেশম যোগানদার। তার হাতে রেশম গুটি সোনা হয়ে ফুটতো। লোকে বলত, সোনার ফুলটা এখান থেকে রেশম বিদেশে রফতানির জন্য কলকাতায় চলে যেত। বিদেশ থেকে কত লোক আসত ওই বাবার দাদার দাদার হাতের কাজ দেখতে। এই কারখানায় রেশমের কাপড় বিভিন্ন রঙে রাঙানো হতো। সোনা এবং রুপোর সুতো দিয়ে তার ওপর কারুকাজ করা হতো। এই কারুকাজে আছিয়া রবাবার দাদার দাদার জুড়ি ছিল না। ঐ অসাধারণ শিল্পকর্ম দেখার জন্য লোক ভিড় করত। কখনো কারখানার গেট থেকে লোকজনকে লাঠি দিয়ে মেরে সরানো হতো। ঐ কারুকাজ কিংবদন্তীর মতো প্রচলিত হয়ে যায়। শুধু মালদহ, মুর্শিদাবাদ নয়, দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসত। সোনা-রুপার কারুকাজখচিত কাপড় রাজরানীর মতো বিরাজ করত ইউরোপের বাজারে। ওর বাবা বলত, অনেকের কাছে শুনেছে, লোকটার হাতে নাকি জাদু ছিল। যা করত, তাই ফুটে উঠত, চোখ ফেরানো কঠিন ছিল। বাবার কাছে গল্প শুনতে শুনতে সেই মানুষটিকে দেখতে বড় ইচ্ছে হতো। আছিয়ার বাবা তাকে দেখেনি, তার বাবাও না। অথচ গল্পে গল্পে মানুষটা বেঁচে আছে। আমরা কেন পারি না অমন কিংবদন্তীর মানুষ হতে? আছিয়া চুলোয় কাঠ গুঁজে দেয়। আসলে ওর কষ্ট হচ্ছে, এজন্য ও ভালো গল্প মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে মন ভালো করতে চাইছে। ও মনে-প্রাণে চাইছে চমৎকার কারুকাজময় রেশমবস্ত্র ওর জীবন আচ্ছন্ন করে রাখুক। ভালোবাসার গ্লানি নয়, ব্যর্থতা নয়, যা পায়নি তার জন্য দুঃখবোধ নয়, ও চায় নীলকণ্ঠ পাখি হতে, নীলকণ্ঠ পাখি। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সিতারার কানে সে শব্দ পৌঁছার আগে ও তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মোছে। কেউ ওকে কাঁদতে দেখেনি। সবাই বলে, আছিয়া শক্ত মেয়েমানুষ। স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরেছে, চমৎকার ব্যবসা চালাচ্ছে, কোথাও কোনো ঘাটতি নেই। আছিয়ার পলু পোকা মহামারীতে মরে না, ওর রেড়ির গাছ ফ্যাকাসে হলুদ হয়ে যায় না, সুতো নষ্ট হয় না। আজ কুতুব ওকে বিচলিত করে দিয়েছে। জোহরার মৃত্যুতে জীবনের দিকে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে বারবার। নিজেকে বড় অসহায়, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

সন্ধ্যার আজান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আছিয়ার রান্নাঘরের রান্না শেষ হয়। রেড়ির তেলের প্রদীপটা ও শোবার ঘরে চৌকাঠের ওপর জ্বালিয়ে রাখে। আছিয়া কুতুবের জন্য অপেক্ষা করে। ও এখনো এলো না। কুয়োতলায় গিয়ে হাতমুখ ধোয়। শরীরে ঘামের গন্ধ ওর একটুও ভালো লাগে না। সন্ধ্যা হলেই প্রচুর পানি ঢেলে হাত-মুখ ধোয়া ওর অভ্যেস। সবকিছু নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। রান্না রাঁধতে দেখলে ইয়াসিন রাগ করে। তৈরি খাবার চাই, কিন্তু রান্নাঘরের ঘাম নয়। আছিয়ার কখনো রাগ হয়, এ নইলে আর পুরুষ মানুষ! কিন্তু না, ইয়াসিনের সামনে রাগ প্রকাশ করার সাহস ওর নেই। ইয়াসিন দাবাড়িয়ে রাখে, মাথা তুলতে দেয় না। জমিরুদ্দিন সহজ মানুষ ছিল, জোর-জবরদস্তি খাটাত না। কথা বলে আরাম পেত, কখনো হাসি-তামাশাও করত। ইয়াসিনের ঐসব বালাই নেই, চায় ভোগ, চায় অধিকারের প্রতিষ্ঠা, আইন মাফিক অধিকার না হলেও কিছু এসে যায় না। ইয়াসিনের ভালোবাসা দানে এবং ভোগে, হৃদয়ে নয়। তাই কুতুব এবং জোহরার ভালোবাসা এই মুহূর্তে ওর কাছে বিছুটির জ্বালা, সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কুয়োর পানি আজ ওর সান্ত্বনা নয়, ও ছটফটিয়ে ঘরে আসে। দেখে, কুতুব বারান্দায় বসে আছে, খুঁটিতে হেলান দিয়ে।

বাপজান?

খালা, বলতে পারেন জোহরা কেন মরল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে পায়নি বলে।

একজনকে না পেলে মরা লাগে?

কুতুব একটু চেঁচিয়ে বলে। আছিয়া চুপ করে থাকে, উত্তর তার জানা নেই। মেয়েমানুষ হয়ে পুরুষের ভোগে যার জীবন কাটল, তত্ত্বকথা সে কোথা থেকে জানবে? জানাটা ক্ষতি, জানতে চাইলে নিয়ম নষ্ট হয়। বরং পোকার মতো বাস করা সহজ। আছিয়া এতকাল এই সহজের মধ্যে ছিল। এখন ও বিচলিত বোধ করছে। কুতুবের সামনে থেকে সরে পড়ে। নারকেলের নাড়ু এবং মুড়ি নিয়ে আসে।

খাও বাপজান।

কুতুব মুড়ির ডালা টেনে নেয়। প্রচণ্ড খেতে ইচ্ছে করছে। কতকিছু যে খেতে ইচ্ছে করে, ও তা কাউকে বোঝাতে পারবে না। মনে হয়, ছোটবেলায় মা যতো ভালো খাবার খাইয়েছিল, তার সবগুলো পেলে ও এক লহমায় খেয়ে শেষ করতে পারে। যেন হাজার হাজার বছর ও কোনো খাবার খায়নি। আছিয়া ওর পাশে বসে।

শরীরের একটু যত্ন নিও বাপজান।

শরীর ঠিকই আছে। আমার কিছু হয়নি।

চুলে তেল দাও না?

মনে থাকে না।

কাল রজনী নাপিতের কাছে গিয়ে চুল-দাড়ি কামিয়ে ফেলবে।

ভালো লাগে না।

ঘরে লুঙ্গি আছে, পরো। সিতারা তোমার কাপড় ধুয়ে দিক।

না।

ময়লাতো সব?

থাক।

কুতুব নির্বিকার উত্তর দেয়।

বাপজান?

আপনি আমার দিকে নজর দেবেন না খালা। আমি আমার মতো থাকব। আমার সাথে বেশি কথা বললে আমি আপনার বাড়িতে আসব না।

ঠিক আছে, বলব না। তুমি আসবে।

আছিয়া সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে যায়। তবু কুতুব ওর কাছে আসুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুতুব কালবৈশাখি হয়ে ওর জীবনের গ্লানি ছিন্নভিন্ন করে দিক। কুতুব শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা হয়ে ছিন্নভিন্ন টুকরোগুলো ধুয়ে নিয়ে যাক। এই মুহূর্তে জীবনের অনেক জঞ্জাল সাফ-সুতরো হওয়া বড় জরুরি। ও তখন কুতুবকে আক্রমণ করে, তুমি পারলে না জোহরাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে?

পালালে ইয়াসিন কুত্তা আমাদেরকে মেরে ফেলত।

মরলে কি হয়?

আছিয়ার জন্য বড় দুঃসাহসী উচ্চারণ। কুতুব মুহূর্তে জবাব দিতে পারে না। ইয়াসিন বসনির সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে নিয়ে যে ভোগের জীবনযাপন করে, তার কাছে মৃত্যুর উচ্চারণ সহজ নয়। ভালোবাসাহীন জীবনে মৃত্যুর উচ্চারণ কঠিন। জোহরাই তো প্রমাণ করেছে, একমাত্র প্রচণ্ড ভালোবাসাতে মৃত্যু বন্ধু হতে পারে। তবে এটা কি আছিয়ার পরিহাস? ও কি নিজেকে উপহাস করছে? তবু মরিয়া হয়ে আবার বলে, মরলে কি হয়?

কিছু না।

তাহলে পারলে না কেন?

বলতে পারি না। আপনি মরতে পারতেন খালা?

বলতে পারি না। জোহরার মতো ভালোবাসা আমার নাই কুতুব।

একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ভেসে যায়, কুতুব চমকে ওঠে। কোনোদিন এত কাছ থেকে আছিয়াকে দেখা হয়নি। এত কাছের মানুষের বুকের ভেতর এত গভীর কয়লার খনি থাকে এবং সেখানে ধোঁয়া জমে, কখনো কি মন না খুললে তা বোঝা যায়? কুতুবের ভীষণ লাভ হয়, অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার ভরে। বড় লোকসানের মধ্য দিয়ে ও বড় লাভে প্রবেশ করেছে। এক অর্থে, ওর আজ সুদিন। ও হো-হো করে হেসে ওঠে।

হাসলে কেন বাপজান?

আজমল বলে, কোনোদিন খারাপ না। সব দিন সুদিন। মানুষ কিছু না কিছু পায়।

আজমল?

আছিয়ার বুক ধক করে ওঠে।

আজমল খুব ভালো ছেলে। আমার পছন্দের মানুষ। ও তেভাগা আন্দোলনে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায়?

নাচোল।

তেভাগা ভালো না কুতুব।

আছিয়ার কণ্ঠ রূঢ় এবং আধিপত্যের সুর ধ্বনিত হয় সেখান থেকে। অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। ওর ধারণা, তেভাগার সূত্র ধরে সব সাধারণ মানুষই দাবি আদায়ে নামবে। তখন ব্যবসার ক্ষতি হবে। আছিয়ার মুহূর্তিক পরিবর্তনে কুতুব ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, আমরা তেভাগা চাই। তুমি একা খাবে আর দশজন উপোস দেবে, তা হবে না। আমরা গায়ে খেটে ফসল ফলাব আর তুমি পায়ের ওপর পা তুলে খাবে, তা হবে না।

আছিয়া হিংস্র স্বরে বলে, জমি যার, ফসল তার।

না, মানি না।

কুতুব ক্ষেপে ওঠে। চেঁচিয়ে কথা বলে। ওর ঘৃণা বাড়ে। আছিয়া একটা আস্ত রক্ষিতার মতো কথা বলছে। ও ইয়াসিন বসনিরই উপযুক্ত। ভালোবাসার জন্য বেদনা থাকলে কি হবে, অন্যের ক্ষেত্রে দুজনই এক।

বাপজান?

আমি গেলাম।

ভাত খাবে না?

না।

কুতুব দ্রুত পায়ে উঠোন পেরিয়ে আসে। অন্ধকারে ওকে আর দেখা যায় না। অন্ধকার রেশমি সুতো হয়ে আছিয়ার গলার চারপাশ বেষ্টন করে। ওর মনে হয়, আজমলের ঠাণ্ডা চাউনি কুতুবকে গ্রাস করেছে। যেটা দেখে ও ভয় পায়, সেটা কুতুবের জন্য উদ্ধার। সে জন্যই ইয়াসিনকে কুত্তা বলে আর আজমলের জন্য ভাতের থালা অপেক্ষা করে। ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। অকারণে সিতারাকে, তাহেরকে বকাবকি করে। তারপর নিজেও না খেয়ে শুয়ে পড়ে।

খুব ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে নিজেই রেড়ি পাতা ওঠাতে যায়। এখন পলুকে গোটা পাতা দিলেই চলে। খুব ছোট থাকতে কচি পাতা কুচিকুচি করে কেটে দিতে হয়। সেই সময় খুব ঝামেলা হয়। পাতা তুলে এনে আছিয়া পান্তা খেতে বসে। মাথাটা কেমন ভার লাগছে। রাতে বারবার ঘুম ভেঙে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে, আজে-বাজে স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল, সিতারাকে ডাকে, কিন্তু সাহস হয়নি। গতরাতে ওর কেন এত ভয় করল, ও বুঝে উঠতে পারে না। এখন ও মন থেকে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে। দিনেরবেলায় ওর সাহস ফিরে আসে। ও জানে, মনের মধ্যে বাজে কথার বোঝা চাপিয়ে রাখলে কাজ নষ্ট হয়। কাজ নষ্ট করতে ও একটুও রাজি নয়। এজন্য গাঁয়ের লোকে বলে, আছিয়া হিসেবী মেয়েলোক। ওর হিসেব নাকি ভুল হয় না। হিসেব ভুল করলে কি এতবড় ব্যবসা চালানো সহজ হতো? জীবনের হাল শক্ত হাতেই ধরা উচিত। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার কোনো মানে হয় না। এই মুহূর্তে কুতুবের ওপর রাগ হয় ওর।

হারামজাদা তেভাগার কথা বলে। কিছুতেই না, জমি যার ফসল তার।

কথাগুলো মনে মনে আওড়ায় ও, কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারে না। এই কথার মধ্য দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে। কিসের সমান অধিকার? ছোটলোকেরা ছোটলোকই থাকবে। একে একে সুতো কাটুনিরা আসছে। হরমুন চালা-ঘরে ঢুকল, টাকনি নিয়ে বসেছে। হরমুন কি দাবি করলেই আছিয়ার সমান সমান হবে? কখনো না। ওর রক্ত চিড়বিড় করে। সিতারা বড় কড়াইয়ে পানি দিয়ে চুলোয় জ্বাল বসিয়েছে। আছিয়া নিজে পোকা সেদ্ধ করে। এই সেদ্ধ করার ওপর সুতার গুণাগুণ অনেক নির্ভর করে। সেজন্য ও কাউকে ভরসা করে না। আর এ কাজে ওর আন্দাজ দারুণ, কখনো এদিক-ওদিক হয় না। ও পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়া চুল খোঁপা করতে করতে রান্নাঘরে আসে। মেজাজ একদম খারাপ।

হরমুন গতকালের রেখে দেয়া কাজ শুরু করেছে। ভর্তি তক্তি থেকে সুতো লাটাইয়ে জড়িয়ে লাছি করছে, এরপর রোদে শুকনো হবে। শরীফা সেদ্ধ গুটির মাথায় আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে ফাঁক করে ভেতর থেকে কঠিন খোলসটা বের করছে। রমিজা কাঠিতে সুতো পেঁচাচ্ছে। আট-দশটি এণ্ডির গুটির আঁশ ছাড়িয়ে একই কাঠিতে পেঁচিয়ে জমা করা হয়। তারপর তক্তিতে সুতো পাকায়। সুতোগুলো যাতে শক্ত থাকে এবং গায়ে-গায়ে লেগে না যায়, এজন্য সামান্য পানি ছিটিয়ে দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়। ভেজা অবস্থাতেই সুতো পাকানো হয়। তবে বেশি সময় জমাট অবস্থায় থাকলে পচে যায়। তাই বেশ কিছুটা সুতো উঠলেই তক্তি পাল্টে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরটিতে সুতো কাটার কাজ চলে। হরমুন দ্রুত হাতে লাটাইয়ে সুতো ওঠাচ্ছে। ওর কাজ সূক্ষ্ম। তাঁতিরা ওর সুতো পছন্দ করে। একটু পরে আকবর আসবে সুতো নিতে। গত সপ্তাহে বলে গেছে আজ আসার কথা। ও সপ্তাহে একবার আসে। সব সুতো ওর কাছেই বিক্রি করে আছিয়া। ও আসে শিবগঞ্জ থেকে। আকবর শিবগঞ্জের তাঁতিদের কাছে সুতো বিক্রি করে। ও বিভিন্ন জায়গা থেকে সুতো সংগ্রহ করে। পাকা লোক, এক নজরে সুতোর ভালোমন্দ বুঝে ফেলে। হরমুনের সুতোয় নাকি চমৎকার এণ্ডির চাদর হয়। মুগা সুতো দিয়ে হাতে চালানা তাঁতে এণ্ডির চাদর তৈরি করে তাঁতিরা। সারা দেশে এর কদর। জমিরুদ্দিন তো অন্য চাদর গায়েই দিত না। ইয়াসিনও তাই। বড় ঘরের সবার এণ্ডির চাদর থাকা চাই, নইলে আভিজাত্য ক্ষুণ্ন হয়। আছিয়ার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফোটে। ব্যবসা শুধু টাকা উপার্জন নয়, এই ব্যবসায় ওর ভালো-লাগা জড়িয়ে আছে। আগুনের তাপে আছিয়ার মুখ লাল হয়ে ওঠে। ওকে খুব সুন্দর দেখায়।

আছিয়া বু?

হরমুন কিছুটা ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে ডাকে। কাজের সময় কথা বলা আছিয়া একদম পছন্দ করে না। সাড়া না পেয়ে ও আবার ডাকে।

আছিয়া বু?

আছিয়া না তাকিয়ে বলে, বল?

জোহরা নিকি গলায় ফাঁস দ্যাছে?

আছিয়া এক মুহূর্ত থমকে যায়। তারপর চোখে তুলে বলে, হ্যাঁ।

আহারে!

কাটুনিরা সবাই দুঃখসূচক শব্দ করে। ঐ শব্দ আছিয়ার বুকে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ও কাজ হয়ে গেলে চুলোর কাছ থেকে উঠে আসে। ঘর থেকে সুতোর লাছি বের করে এনে উঠোনো খাটিয়ার ওপর মেলে দেয়। কিছুক্ষণ রোদে রাখা দরকার। ভিজে ভাব নেই, তবু সাবধানের মার নেই তো। এমনিতেই সুতো পাকানোর সময় এবং তক্তি বদলের ফলে বেশ শুকিয়ে আসে। সুতোর কেমন একটা গন্ধ আছে, ও ঠিক বোঝাতে পারে না, বুক ভরে শ্বাস নিলে ওর আরাম লাগে। তখন শুনতে পায়, হরমুন বলছে, জোহরা ভালো ম্যায়া ছ্যালো। আহারে! বাপটা একটা শয়তান। এমুন কর্যা ম্যায়াটারে শ্যাষ কর্যা দ্যালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুতুবও শ্যাষ হয়্যা যাবি।

থ্যামো তো তোমহারা।

শরীফা নিচুস্বরে বলে। বললে কি হবে, সব কথাই আছিয়ার কানে যায়।

নিজের কতজনের সাথে আশনাই। ম্যায়াটার পিরীত সহ্য হলো না।

চুপ, চুপ।

চুপ করবো ক্যান? আছিয়া বু শুনলে কি হবি? হামারঘে ছাড়া কাক দিয়্যা কাম কর্যাবি?

ওদের কণ্ঠে কিছুটা ঔদ্ধত্য। আছিয়ার কান লাল হয়ে যায়। দড়ির খাটিয়ায় বসে ও সুতো নাড়াচাড়া করে, কারো দিকে তাকায় না। জোহরা প্রসঙ্গে ও আবার মুষড়ে পড়ে। কাটুনিরা কি জানে, এই প্রসঙ্গে ও নিজের সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শিখেছে? ওরা কি বুঝবে ওকে? বুঝবে কি, ভালোবাসাহীন জীবনযাপনের জন্য ওর বুক হাহাকার করছে? বুঝবে কি, এই গ্লানিকর জীবনযাপনে ওর রুচি নেই?

আম্মা আকবর জোলা এয়েছে?

আছিয়ার চমক ভাঙে।

আকবর পান-খাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসতে হাসতে সামনে আসে, ক্যাংকা আছেন আম্মা?

ভালো। তুমি?

হামারঘে আর থ্যাকা। ক্যাবল ইখান থেকে উখানে দৌড় প্যাড়া। জানে আর কত সয় কন?

আকবর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বসো।

সিতারা ওকে জলচৌকি এনে দেয়। ও বসতে বসতে বলে, বাজারে শুনল্যাম, জোহরা ফাঁস দ্যাছে। আহারে!

আবার জোহরা! জোহরা এখন এই এলাকার লোকের মুখে মুখে। জোহরা মরে গিয়ে আছিয়ার মগজে ঢুকেছে। কি করে নামাবে ও?

আম্মার কি শরীল খ্যারাপ?

না, ভালোই আছি। তুমি সুতো মাপো।

আছিয়া মুহূর্তে নিজের শক্তিতে ফিরে আসে। কথায় কিছুটা ধমক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন বাজে কথা আর বলবে না। আকবর কাজ শুরু করে। ওকে বিদেয় করাই এখন আছিয়ার লক্ষ্য। আজ আর ওর কাজে উৎসাহ নেই। মাথা ঝিমঝিম করে। মন খারাপ থাকলে শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝিমিয়ে আসে। আকবরের কাছ থেকে দাম বুঝে নিয়ে ও ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকে। আকবর সুতোর পোটলা বাঁধতে ব্যস্ত। অসময়ে শুয়ে থাকা ওর একদম পছন্দ নয়। আজ ওর মন ভালো নেই, তাই সব নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে যাচ্ছে। কাটুনিরা অবাক হয়। সিতারা চুলে তেল দিতে এসে বকা খেয়ে ফিরে যায়। কেউ বুঝতে পারে না যে, কি ঘটল। সুতোর পোটলা কাঁধে ওঠাতে ওঠাতে আকবর সিতারাকে বলে, বুঝল্যা সিতারা, ম্যায়আটা মর‍্যাতে হামার মন খুব খারাপ। আজমল এটি ন্যাই, থ্যাকলে বাপ-বেটায় মারামারি ব্যাধতো কয়্যা দেল্যাম। ইয়াসিনটা মানুষ না।

ঘরে শুয়ে সব কথা শুনতে পায় আছিয়া। ওর ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে, আজ কেউ ওকে সমীহ করে কথা বলে না।

রমেনের বৈঠকখানা নিস্তব্ধ, থম ধরে আছে মানুষগুলো। খোলা হাওয়া মুখোমুখি জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু বেরুতে চায় না কারো বুকের নিঃশ্বাস। অনেকের সঙ্গে মুখ চুপ করে বসে থাকে আজমলও। জোহরার মৃত্যুর খবর ওর কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু তার চাইতেও ভয়াবহ মৃত্যুর খবর ওদের বিমূঢ় করে রাখে। কলকাতার দাঙ্গার খবর এনেছে ফণীভূষণ, এই কিছুক্ষণ আগে ও মালদহ থেকে ফিরেছে। আজমল ঘরের মানুষগুলোর ওপর দৃষ্টি ঘোরায়, বিবর্ণ দেখাচ্ছে সবাইকে, শুকনো এবং মলিনও। ইলা সবাইকে গ্লাসে করে ডাবের পানি দেয়, সঙ্গে মুড়ির মোয়া। কিন্তু খাবারে কারো আগ্রহ নেই। আজমল এক চুমুকে ডাবের পানি খেয়ে ফেলে, ওর মনে হয়, বুক শুকিয়ে চড়চড় করছে। দাঙ্গার বর্ণনা শোনার পর থেকে ওর স্বস্তি নেই। ও কেবলই ইয়াসিন বসনির ক্রুদ্ধ চেহারা দেখতে পায়। এখানে আসার সময় ইয়াসিনকে বলে আসা হয়নি, বাশারকে দায়িত্ব দিয়ে চলে এসেছে। ফিরলে ইয়াসিন বসনি গালাগালির তুলো ধুনো করে ছাড়বে। ইয়াসিনের মুখটা এখন কলকাতার রাস্তায় পড়ে থাকা ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত নর-নারীর মুখের মতো, ওটাকে কুপিয়ে মেরে ফেললে কেমন হয়? মুহূর্তে আজমলের শরীর শিরশির করে ওঠে। ও দাঁত কিড়মিড় করে। তখন রমেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ম্লান হেসে বলে, বড্ড গুমোট লাগছে। ঘরের কেউ কোনো কথা বলে না। রমেনের হাতে ডাবের পানি। ও এক চুমুক খায় এবং মগজ পরিষ্কার করার চেষ্টা করে—এই বছরের মার্চ মাসে সারা ভারতের নির্বাচন হয়ে গেল। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ জয়লাভ করলে সোহরাওয়ার্দী হলেন প্রধানমন্ত্রী। ১২ আগস্ট লীগ কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করলে, মুসলিম লীগ তাতে যোগ দিল না। তার আগেই তারা ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করেছিল। এই দিন প্রচণ্ড দাঙ্গায় কলকাতার বায়ু দূষিত। রমেন চোখ বুজলে দেখতে পায় সেই দৃশ্য। দেখতে পায়, উপুড় হয়ে এক যুবক, মুখ থুবড়ে পড়ে এক মহিলা, দ্বিখণ্ডিত শিশু, ভাবতেই অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। ও দ্রুত ডাবের পানিতে ঠোঁট রাখে, গলার কাছে ভারি হয়ে থাকে। ভারতজুড়ে চলছে দাঙ্গার তাণ্ডবলীলা। মুসলিম লীগের বামপন্থী দল আবুল হাসিমের নেতৃত্বে যখন প্রচার করছে, আমাদের সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে, তখন নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে তার দল বলতে লাগল, এই সংগ্রাম কেবল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, বর্ণ-হিন্দুদেরও বিরুদ্ধে। রমেন মনে মনে ভাবল, দেশ বিভাগ তাহলে অনিবার্য!

ফণীভূষণ উঠে দাঁড়ায়, ঘরে ফেরে। ভালো লাগছে না কিছু। রমেন কাছে এগিয়ে আসে, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। গাঁয়ে যাতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ফণীভূষণ মাথা নাড়ে, ঠিকই বলেছ। আমাদের মধ্যে যেন কোনো উস্কানিমূলক ঘটনা না ঘটে, এটা ঠেকানো আমাদের প্রথম কর্তব্য।

রমেন আজিজের ঘাড়ে হাত রাখে, তুমি না বলেছিলে ভোলাহাট যাবে? আপাতত সেটা বন্ধ রাখ। তুমি আমাদের ছেলেদের খবর দাও, যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তৈরি থাকতে বল।

আজিজ ঘাড় নাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও। ওরা বেরিয়ে আসে। যে যার বাড়ির পথ ধরে। ফণীভূষণ বারান্দায় একটুক্ষণ দাঁড়ায়, তরুণদের স্লোগান তখনো ভেসে আসছে, ও আস্তে করে বলে, পাকিস্তান বোধ হয় হয়েই যাবে!

রমেন সায় দেয়, মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল আর আজিজ দুজনে বাঁশঝাড় পেরিয়ে আসে।

তোর মন খারাপ হলো আজমল?

যা শুনলাম, মন খারাপ আর কি হবে? মাসখানেক পর তুই চলে আসবি। দুজনে মিলে আশিক আলির সঙ্গে পাখি ধরতে যাব।

সেই ভালো। তুই বাড়ি যা। পাঁচ-সাতদিন কিংবা দরকার হলে আরো বেশি দিন আমার আর বাড়ি ফেরা হবে না। আমি আজ চণ্ডিপুর যাচ্ছি, তারপর অন্যদিকে।

মামা রাগ করবে না?

সে তো সারাক্ষণই করছে। কিছুদিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দেব। তুই মাকে বলে আজই বলে যা। না কি কাল যাবি?

কাল যাব।

ঠিক আছে।

পথের বাঁকে আজিজ অন্য রাস্তা ধরে। আজমল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কেমন করে আজিজ এমন সহজে সবকিছু পারে? কী মন্ত্র ওর ভেতর কাজ করে? আজিজকে যত দেখে ততই ওর সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে শোয়েব স্বর্ণকারের সঙ্গে দেখা হয়। শোয়েব এক গাল হাসে, কেমন আছেন আজমল ভাই?

ভালো। আপনি?

দিন কেটে যায়।

নতুন গান বাঁধলেন কিছু?

হাঁ, শুনবেন একটু?

শুনব।

দুজনে পথের পাশের অর্জুন গাছের নিচে এসে বসে। শোয়েব উরুর ওপর তাল ঠোকে, তারপর গুন্‌গুন্‌ করে, শেষে গলা ছেড়ে দেয় :

স্বপন দেখেছি হবে হবে হবে।
কি যে হবে বুঝতে পারে না
জানতে এলাম সবে।

এইটুকু গেয়ে ও থেমে যায়, কেমন লাগছে?

ভালো, খুব ভালো। থামলেন কেন?

শোয়েব এবার গলা চড়িয়ে দেয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শশী মন্ত্রী ভি রাজা
কপালে কি আছে সাজা
উড়ে স্বরাজের ধ্বজা
আগুন কি আর নিভে?

চমকে ওঠে আজমল। শোয়েব স্বরাজের কথা বলছে! তাহলে দেশ কি স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে? ব্রিটিশ রাজ শেষ হতে চলল? এখন চড়া গলায় শোয়েবের গান টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যায়, উড়ে স্বরাজের ধ্বজা/আগুন কি আর নিভে? আজমলের বুক ধুক্‌ধুক করে। দাঙ্গা আর স্বরাজ শব্দ দুটো ওর মগজের মধ্যে হাতুড়ির মতো পড়ে।

দাঙ্গায় সারা ভারত জ্বলছে। খবর পেয়েছে ওরা, নোয়াখালীর দাঙ্গায় জীবন দিচ্ছে হাজার হাজার নর-নারী। কলকাতার পরই নোয়াখালীর দাঙ্গায় ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালীতে তাঁর সেবা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করছেন। রমেন একদিন খুব ভোরে ইলাকে বলে, আমাদের আর বসে থাকার সময় নেই। দাঙ্গা প্রতিরোধে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় ইলা, আমিও তাই মনে করি। আমাদের এখানে কিছু হয়নি, এটা বড় সান্ত্বনার কথা। কিন্তু দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোও তো কর্তব্য।

দুজনে শুকনো মুখে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ভোরের বাতাস ছুটে আসে। তখনো ভালো করে আলো ফোটেনি। বাড়ির অন্যরাও ওঠেনি।

আমাদের দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। আমরা ঘুমুতে পারলাম না কেন ইলা?

ইলা রমেনের গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়, আমাদের সামনে ঘোর অন্ধকার তাই।

হবে হয়তো। রমেন ওর কাঁধে হাত রাখে, দেখ ইলা, এই যে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে, এর একটা সৌন্দর্য আছে। কিন্তু মানুষের তৈরি অন্ধকার কী ভয়াবহ, কী নির্মম! এর কোনো সৌন্দর্য নেই।

এক অস্থির যন্ত্রণায় রমেনের শরীর কেঁপে উঠলে ও দুহাতে ইলাকে জড়িয়ে ধরে। ইলা ফিসফিসিয়ে বলে, তোমার খারাপ লাগছে জানি, কিন্তু মানুষের তৈরি অন্ধকার বড় অল্প সময়ের জন্য। আমাদের ক্ষমতা আছে সেটা দূর করার। চলো, বাগানে একটু হেঁটে আসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজনে হাত ধরে বাগানে নামে।

এর দুদিন পরই কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ডাক এলো যে, নোয়াখালীর দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় সেবা ও পুনর্বাসন কাজে যেতে হবে। ওরা একদিনও সময় নষ্ট না করে রোহনপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠল।

এই ভয়াবহ দাঙ্গায় মানুষ ভুলে গেল মানুষের কথা, সবাই রূপান্তরিত হয়ে গেল হিন্দু আর মুসলমানে। অবশ্য অন্য ধর্মের যারা, তারা তো একদমই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ঘৃণা এবং বিদ্বেষ দ্রুত ঢুকতে থাকে ওদের রক্তে। চারদিকে অন্ধকার, চারদিকে নৈরাজ্য। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করে যে, ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যে তারা ভারত ছেড়ে চলে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২

বিল ভাতিয়া পেরিয়ে সোনা মসজিদ যেতে কতক্ষণ লাগবে অনুমান করে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়েছে আশিক আলি। এখনো সূর্য ওঠেনি। শীতের বেলা, চারদিকে হালকা কুয়াশার মোড়ক। বেলা বাড়লে আর যাই হোক, রোদের তাপে চামড়া পুড়বে না। রোদে হাঁটতে ওর কষ্ট হয়, শরীরে চাকা চাকা দাগ হয়, জ্বালা করে। আশিক আলি রোদ ভয় পায়, তাই ছায়া চায়। ও দ্রুত পা চালায়, হাঁটতে ভালো লাগছে। রাস্তায় তেমন কেউ বের হয়নি। দুপাশে তুঁত গাছের সারি, গাছগুলো বেশি বড় নয়। রাস্তার ওপর ছায়া বিছিয়ে রাখে না। এই রাস্তায় তেমন বড় গাছ নেই। আর বিল ভাতিয়া তো খাঁ-খাঁ করে। ওটা রাস্তা নয়, সরু পায়ে চলার পথ আছে কেবল, তাই বৃক্ষহীন। ফসলের মৌসুমে আদিগন্ত সবুজ হয়ে থাকে, বর্ষায় টলমল জলের আধার। বিল ভাতিয়া ওর প্রিয় জায়গা। আজকের দিনে এই বিল পেরিয়ে ও যাবে প্রিয়জনের খোঁজে।

আশিক আলির পরনে নীল লুঙ্গি, গায়ে শাদা পাঞ্জাবি, কিছুটা পুরনো। ভেতরে নতুন কেনা গেঞ্জি আছে। পায়ে জুতো নেই। হাতে কালো রঙের ছাতা। ছাতা ছাড়া ও পথে নামে না। ওর কেমন ভয় করে। এই জিনিসটি হাতে থাকলে মনে জোর পায়। ও ভীতু স্বভাবের লোক। কাউকে জোরে কথা বলতে পারে না, সব সময় নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকে। আজকের এই ভোরবেলা ওর দারুণ মনে হয়। হঠাৎ করে নিজের ওপর আস্থা বেড়ে যায় এবং ভাবতে থাকে, এখন থেকে কেউ ওকে ধমকাতে এলে, ও তাকে আরো দশটা কথা বলে দেবে। গুঁড়ি গুঁড়ি কুয়াশা ওর চুলের ওপর লেগে থাকে। মাঝে মাঝে হাঁচি আসছে। ওর পকেটে রুমাল নেই, কাঁধে গামছাও না। ও পাঞ্জাবির হাতে নাক মুছে নেয়। খালি পা শিশিরে ভিজে উঠলে ওর অস্বস্তি লাগে। একবার ভাবে, এত ভোরে না বেরুলে পারত, পরক্ষণে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, ঠিকই করেছে। এই দোলাচল আশিক আলির স্বভাব। বিল ভাতিয়ার জায়গায় জায়গায় এখনো গোলাকার পানির বৃত্ত। রোদে চকচক করছে। বড় বোন রহিমুন ওকে গরম ভাত দিয়েছে, সঙ্গে ডিম ভাজি আর ভর্তা। এটুকু পেলেই ও খুশি হয়। খাওয়া শেষে ওর পরিতৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রহিমুন বলেছিল, ভাইজান, এই খুশি যেন আপনার সারা জীবন থাকে। আর কোনো দুঃখ না।

ও মাথা নেড়ে বলেছিল, সুখ থাকে না কেন, এ তো আমিও ভাবি। বিল ভাতিয়ার গোলাকার পানির বৃত্তের সামনে দাঁড়িয়ে ওর হঠাৎ খিদে পায়। যেন রহিমুনের রাঁধা ভাতের কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রশ্নটা ওর নিজেরও, খুশি কেন জীবনভর থাকে না? কেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়? ও ছাতাটা মাটির ওপর রেখে বসে, একটু জিরিয়ে নিতে চায়, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। পেটে একটু চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে। ভরপেটে হাঁটার জন্য কি? কে জানে? আশিক আলি হাত উল্টিয়ে বড় করে শ্বাস ফেলে। ইদানীং বেশিরভাগ সময়ই দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে বুকের নিচে থেকে। কেন এমন হয়, ও জানে না।

আশিক আলির বয়স এখন ছত্রিশ, স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো। রোগবালাই তেমন নেই। ও সুখেই ঘর-সংসার নিয়ে জীবনযাপন করতে পারে। ওর আয়ে অভাব হয় না, প্রাচুর্যও নেই। ও মাঝপথের মানুষ। শুধু ধূপ গাছের মতো কোনো এক সময়ে বুক ফেটে কষ গড়িয়ে পড়ে। ওর ঘরের সামনে একটা বিশাল ধূপ গাছ আছে। রহিমুন বহুবার বলেছে, গাছটা কেটে ফেলতে। ও কাটে না, গাছটা ওর শখের, গাছের গুঁড়িটা বেশ মোটা। প্রায়ই বাকল ফেটে রস বেরিয়ে আসে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে জমাট হয়ে যায়। এই কষ পোড়ালে ধূপের মতো গন্ধ হয়। আশিক আলির গাছটা প্রিয় এজন্য যে, ওর ধারণা, ওর বুকের মধ্যে এমন একটি গুঁড়ি আছে। প্রথম রস বেরিয়ে আসে যেদিন জরিমন মারা যায়, ওর প্রথম স্ত্রী।

সেই রাতে আশিক আলির ঘরে কেরোসিন ছিল না। ও কেবল সংসার শুরু করেছে, রোজগার তেমন নেই, চারদিকে দিশেহারা অবস্থা। জরিমন অন্ধকারে কোঁকাচ্ছে, কখনো তীক্ষ্ণ চিৎকারে কেমন অবশ করে দিচ্ছে ওকে। জরিমনের তখন প্রসবের অবস্থা। ও দরজার কাছে বসে ছিল, উৎকণ্ঠিত যন্ত্রণাদগ্ধ। গাঁয়ের বুড়ি দাদী সুরাতুন ছিল ঘরে। ওকে বকাবকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছিল, গালিও দিচ্ছিল। আশিক আলির মুখে কথা ছিল না, কাঁদতে ইচ্ছে করছিল অথচ গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না। ও বিমূঢ়, স্থবির, বিশাল পাথর একটা। বুকের ভেতর একটা ইচ্ছা মহানন্দার স্রোতের মতো তীব্র হয়ে ওঠে। খুব ইচ্ছে করে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া জরিমনের নীল চেহারা দেখতে। ওর প্রিয় জরিমন, মাত্র দশ মাস আগে বিয়ে হয়েছে, অথচ এখন ওর কাছে যাওয়ার সাহস নেই। আশিক আলি পারে না, ধরে রাখতে পারে না। পায়চারি করে, বসে, বিড়ি ধরায়, পানি খাওয়, দুহাতে চুল চেপে ধরে। ও এখন আর নিজের মধ্যে নেই। মনেপ্রাণে ভোরের প্রার্থনা করে। সুরাতুন উচ্চৈঃস্বরে বলে, ক্যাংকা বেটা ছেলে তুমি গো, ও বাপ, একটা কুপি এ্যানো না।

ও বোকার মতো দাঁড়িয়েই থাকে। এত রাতে কার কাছে কুপি চাইতে যাবে? সুরাতুন কিছুক্ষণ গালাগালি করে আবার ঘরে ঢুকে যায়। বুড়িও অস্থির, কি করবে, বুঝতে পারে না। জরিমনের চিৎকার গোঙানিতে পরিণত হয়েছে, কিছুটা নিস্তেজ ও। সেই শব্দে আশিক আলি ভয় পায়। ওর অস্থিরতা জমাট বেঁধে ওঠে। ভোরের আলো ফুটতেই সেই অস্থিরতা থেকে রস ঝরে। ও ফুঁপিয়ে কাঁদে জরিমন আর নেই। সন্তান প্রসব না করেই মরে গেছে, নিয়ে গেছে ওর স্বপ্ন আর স্বস্তি।

ও জলের ধার থেকে উঠে পড়ে। ঝক্‌ঝকে রোদ উঠেছে বিল ভাতিয়ার ওপর। ও ছাতা খুলে নেয়। একে দুয়ে লোকজন আসছে বিলে। কেউ গরু নিয়ে, কেউ পাখি ধরতে, কেউ মাঠ পাড়ি দিয়ে অন্য কোথাও যাচ্ছে। ও হাঁটতে শুরু করে, এখনো অনেকটা পথ বাকি। এই সময় বিল ভাতিয়ায় হাজার হাজার শীতের পাখি আসে। মাঠে এমন করে বসে থাকে, যেন সহস্র কচুরিপানার ফুলে ভরে আছে বিলের জল। এ সবই ওর পরিচিত দৃশ্য। তবু আজকের সকালে সবকিছু ওর ভালো লাগছে। আজ ওর শুভদিন।

শুভদিন? চমকে ওঠে ও। শব্দটা যেন রাবেয়ার মুখ থেকে বের হয়েছে। জরিমনের মৃত্যুর বছর দুয়েক পর রাবেয়া ওর ঘরে আসে। ওর অভ্যেস ছিল শুভক্ষণ, শুভযাত্রা, শুভদিন ইত্যাদি হিসেব করে কোনো কিছু করা। এসব আশিক আলির ভালোই লাগছে। একজন প্রিয় মানুষ ওর শুভাশুভের দিকে নজর রাখছে, এটা মন্দ ব্যাপার নয়। ও যেদিন রেশনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতো নিয়ে মালদহ যেত, সেদিন রাবেয়া সারা দিন অপেক্ষায় থাকত। বলত, আজ হামাকরে শুভদিন। সেদিন ও ইংরেজ বাজার থেকে রাবেয়ার মন-মতো সওদা নিয়ে আসত। ওর সঙ্গে বিয়ের পর আশিক আলির সংসারে সচ্ছলতা আসতে শুরু করে, রোজগার ভালোই হয়। কিন্তু বিয়ের পাঁচ বছরেও রাবেয়ার সন্তান হলো না। ও একদিন গাঁয়ের তোরাব মিয়ার সঙ্গে পালিয়ে গেল। কবে ওদের মধ্যে ভালোবাসা হলো, কিছুই জানতে পারেনি আশিক আলি। যখন জানল, তখন সব শেষ। সেদিন চাঁপাইনবাবগঞ্জে গিয়েছিল দুদিনের কাজে। ফিরে এসে দেখে ঘর খালি। ও উচ্চবাচ্য করেনি। কেন করবে? যার বুক থেকে ভালোবাসা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? জেনেছিল, ওরা শিবগঞ্জে আছে। তোরাব মিয়া দোকান চালায়। ও আবার একা হয়ে পড়ে। বিল ভাতিয়ার আদিগন্ত সবুজের দিকে তাকালে রাবেয়া ওর বুকের ভেতর শীতের পাখি হয়ে যায়। কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, ও তো ভালোবাসতেই চেয়েছিল, পালিয়ে গেল কেন তবে?

আশিক আলি হঠাৎ করে শরীর ঝাঁকি দিয়ে দ্রুত পা চালায়, যেন সবকিছু ঝেড়ে ফেলতে চায়। না ফেলেই বা উপায় কি? বাঁচতে তো হবে। রাগ না, দুঃখ না, এক ধরনের উদাসীনতা পেয়ে বসেছিল ওকে। কখনো অভিমান কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠলে ও বলত, রাবেয়ার দিনগুলো শুভদিন হোক। এজন্য গাঁয়ের লোকে ওর প্রতি বিরূপ হয়, কটাক্ষ করে, বাঁকা সুরে কথা বলে। বলে, ও নাকি পুরুষ না। আশিক আলি বিল ভাতিয়ার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে ওঠে। মনসুর আলির কণ্ঠ শুনতে পায়, মরদ মানুষের রাগ থাকবি না ক্যানহে? রাগ দ্যাখাও, দাপট দ্যাখাও, নইলে পুরুষ কি?

সত্যিই তো, এ গাঁয়ের সব পুরুষ তেজের সাথে, দাপটের সাথে ঘর করে গেল, ও পারল না। ও কেবলই ভালোবাসতে চেয়েছিল, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। ভালোবাসা ওর জীবনে ধূপের কষের মতো জমাট, কঠিন হয়ে যায়। আশিক আলির বুক আবার তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে, জীবন তো একটাই। পেতে চাই অনেক কিছু, শূন্য হাতে মরব কেন? ভীতু স্বভাবের আশিক আলি এই একটি জায়গায় সাহসী এবং দুর্বিনীত। ওর খোঁজার শেষ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাবেয়ার পর ও পেয়েছিল সাহারাকে, করিম শেখের সুন্দরী মেয়ে। অনেক টাকা পণ দিয়েছিল শ্বশুরকে। সাহারাকে ওর চাই, ও শুনেছিল সাহারার অন্যত্র ভালোবাসা আছে, এ বিয়েতে ও রাজি নয়। তবু নিজের জেদে অটল ছিল, সাহারার ডাগর চোখ ভুলতে পারে না। শুধু একবার, এক নজরই তো দেখেছিল ওকে রোহনপুর যাওয়ার পথে লঞ্চে। তারপর খোঁজ করে করিম শেখের বাড়ি গিয়েছিল। টাকার জন্য করিম শেখ রাজি হয়ে যায়। আশিক আলি ভেবেছিল, কাঁচা বয়সের এসব মন দেয়া-নেয়া বিয়ে হলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সাহারা অদ্ভুত ধরনের মেয়ে, জেদী, একরোখা। বিয়ের রাতে ওকে ছুঁতে দেয়নি। তার পর দিন না, তার পর দিনও না। তৃতীয় দিন পা জড়িয়ে ধরেছিল, হামাক ছ্যাড়া দ্যান। হামি কামেলের ক্যাছে য্যামো।

কামেল?

আশিক আলি বিস্ময় বোধ করে।

ওক হামি ভালোবাসি।

আশিক আলি স্থির চোখে সাহারাকে দেখে। ডাগর চোখ জলের স্পর্শে আরো মোহনীয়। ওক ছ্যাড়া হামি বাঁচমো না।

আশিক আলি চমকে ওঠে। ভালোবাসা কি এমন? ওর জীবনে এমন কেউ আসে না কেন, যে বলবে, আশিক আলি ছাড়া ও বাঁচবে না। আশিক আলি ছাড়া ওর জীবন মিথ্যে। ওর হৃদয় দুঃখে ভরে যায়। ও আস্তে করে পা ছাড়িয়ে নেয়।

ওঠো, তুমি যা চাও, তাই হবে।

সাহারা ওর বুকে গেঁথে আছে, তীব্র রোদের মতো ও। ওর চামড়া পুড়িয়ে দেয়, ওকে কিছুতেই ভুলতে পারে না। সাহারা ওর আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিয়েছে। ওর মতো একজন নারী চায় আশিক আলি যেন ভালোবাসার জন্য সবকিছু উপেক্ষা করতে পারে। সেই ঘটনার পর ও সাহারাকে তালাক দিয়ে বাপের বাড়িতে দিয়ে আসে। এমনকি পণের টাকাও ফেরত চায়নি। কামেলের সঙ্গে এখন ঘর করছে ও। আশিক আলির মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, ঐ সুখের সংসার দেখে আসতে। সাধ পূরণ আর হয় না।

অনেকটা পথ এসে গেছে ও, আর অল্প বাকি। তবু কেমন ক্লান্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগছে। মাঠজুড়ে কলাইয়ের ডাল লাগিয়েছে চাষিরা। ও ক্ষেতের ধারে পা ছড়িয়ে বসে। এইটুকু পথ যেতে ওর ভয়ও করছে। কেমন করে পেরুবে পথটুকু? গিয়ে কি তাকেই পাবে, যাকে ও খুজছে? ও যাচ্ছে রুস্তম মৃধার বাড়ি। মৃদার মেয়ে রেহানার সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে। ওর মামাতো ভাই হারেছ সব ব্যবস্থা করেছে। ওকে কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না। তবু ওর বুকে কাঁপুনি জাগে। যেন শীতের কনকনে উত্তুরে বাতাস ওকে কাঁপিয়ে দিল, তা নয়। কাঁপুনি ওর নিজের ভেতর। কাঁপুনি সুখ এবং দুঃখে, আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণায়। আশিক আলির কাঁপুনি থামে না। ও উঠে হাঁটা শুরু করে। হাঁটলে শরীরের জড়তা কমে যায়। ও ছাতা বন্ধ করে, রোগ লাগুক শরীরে। রোদ লাগলে কাঁপুনি কমতে পারে, কিন্তু না কাঁপুনি কমে না। ও বুঝতে পারে, ওর শরীরজুড়ে উত্তেজনা, উত্তেজনায় ও অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। আসলে ওর ভেতর এখন একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যে আকাঙ্ক্ষা ওকে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলবে। ও রেহানা নামের একটি মেয়েকে পেতে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে সাহারার মতো হতে হবে। ভাবতেই ওর বুক শূন্য হয়ে যায়। বিল ভাতিয়ার খোলা প্রান্তরের মতো ওর বুকের ওপর দিয়ে হাহাকার বয়ে যায়। ও চিৎকার করে ওঠে, এমন একজন নারী চাই, যে বলবে, আশিক আলি ছাড়া আমি বাঁচব না, আশিক আলি ছাড়া আমার জীবন মিথ্যে।

ভালোবাসার জন্য জোহরার মৃত্যু আজমলের জীবনে এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। কী তীব্রতা এবং প্রচণ্ডতা মানুষকে দুঃসাহসী করে, ও তা বুঝতে পারে না। ওর জীবনে ভালোবাসা নেই, কারো জন্য ওর এমন তীব্র টান নেই। এক সময় সায়মাকে ভালো লাগত, ওকে দেখলে বুক ছলকে উঠত, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ওটা আর বেশি দূর গড়ায়নি। জোহরা এবং কুতুব একদম অন্যরকম। জোহরার জন্য কুতুব কি এখন কয়েদ চাচা হয়ে যাবে, না কি ও নিজেও মরবে? মরে গিয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা জুড়িয়ে ফেলবে? আজমলের শরীর শিরশির করে। ওর ভয় লাগে। কেবলই মনে হয়, জীবন কত ছোট, এর জন্য কত তার আয়োজন। নাচোলের কথা ভুলতে পারে না। সেখানে এক বিরাট ঘটনা দানা বেঁধে উঠছে, তার ঢেউ লাগছে সবদিকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, মল্লিকপুর—সর্বত্র এখন তেভাগার কথা। মানুষের জিজ্ঞাসা ফুরোয় না, যারা সক্রিয়ভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়িত নয়, তারাও জানতে চায় তেভাগার খবর। শুধু তাই নয়, এখন দাঙ্গা আর পাকিস্তানের কথা সবার মুখে মুখে। পাকিস্তানের উৎসাহে লোকজন জোর আলোচনা করছে। আজমল কোনো কিছুর মধ্যে স্থিরতা খুঁজে পায় না। জোহরার মৃত্যু ওকে কাবু করে রেখেছে—কেবলই ছটফটানি, কেবলই যন্ত্রণা। ইয়াসিন বসনি ওকে এড়িয়ে চলে, এখন পর্যন্ত মুখোমুখি হয়নি। আজিজের ওখান থেকে ফিরে ও একদিনও বাড়িতে থাকেনি। বিছানা-বালিশ নিয়ে পলু ঘরে চলে এসেছে, বাশার গিয়ে তিন বেলা ভাত দিয়ে আসে। বারান্দায় শুয়ে ও আকাশ দেখে। যতক্ষণ জেগে থাকে, তারাগুলো জোহরার মুখ হয়ে জ্বলে। ও বাড়ির পাশের তেঁতুল গাছে ঝুলে মরেছে, আহ্ এই মৃত্যুর কথা ও ভাবতে চায় না। ভাবলে ইচ্ছে করে, ইয়াসিন বসনিকে দু'টুকরা করে কেটে বাজারের মোড়ে টাঙিয়ে রাখতে। মানুষ দেখুক, মানুষ জানুক। কথাটা ও কয়েকবার উচ্চারণ করে। কিন্তু কি জানবে মানুষ? ইয়াসিনের মতো নরকের কীটকে শাস্তি দিলে মানুষ কি খুশি হবে? হয়তো হবে, হয়তো না। তাতে তেভাগার মতো কোনো বড় সামাজিক পরিবর্তন হবে না। রমেন মিত্র বলে, বিশাল সামাজিক প্রেক্ষাপটে একজন ইয়াসিন বসনির উচ্ছেদ কোনো ঘটনাই নয়। প্রয়োজন সব পাল্টে ফেলা, সব নতুন করে গড়া। না, রমেন মিত্রের মতো চিন্তা ভাবনা ও করতে পারে না। কথাগুলো বুকে লাগে এবং তা মনে রাখে। আজিজ বলে, এই মনে রাখাও একটা কাজ। দরকার মতো বুঝলেই হয়, ঝাঁপিয়ে পড়লেই হয়।

নাচোল থেকে ফিরে আসার আজ পাঁচ দিন। বিকেল থেকেই বেশ গরম। বাতাস গুমোট। নিজেকে কাজে লাগানোর জন্য ও কিছু করতে চায়, কিছু না করলে ও দম আটকে মরে যাবে। ও পুকুরপাড়ের তুঁত গাছগুলোর নিচে আসে। বেশ কয়েকটি গাছে আঁশ পোকার আক্রমণ হয়েছে। ও সাবান-গোলা পানি ও কেরোসিন কিনে এনেছে। সেগুলো গাছের গায়ে ছিটিয়ে দেয়। এই পোকাগুলো আঁশ জাতীয় আবরণের মধ্যে থাকে। এগুলো গাছ আক্রমণ করলে গাছের কাণ্ডে প্রচুর গোল দাগ দেখা যায়—যা আঙুলে ঘষে দিলে উঠে আসে। আস্তে আস্তে গাছের ডাল শুকিয়ে যায় এবং পাতা হলুদ হয়ে আসে। এই পোকা আজমলকে প্রায়ই তাড়াতে হয়। কেরোসিন ছিটিয়ে দিতে দিতে ওর নাক ঝাঁঝিয়ে উঠলে ও নাকে গামছা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঁধে নেয়। এই কাজটা ওর খারাপ লাগে, কিন্তু না করেও উপায় নেই। কেরোসিন ও সাবান-গোলা পানি ছিটানো শেষ হলে মরে যাওয়া ডালগুলো পুড়িয়ে ফেলে। ডালে কেরোসিন লাগিয়ে আগুন দিলে ফস করে জ্বলে ওঠে শিখা। ওর মনে পড়ে, একবার ওদের পলু ঘরে আগুন লেগেছিল। শীতকালে টিনে কয়লা জ্বালিয়ে ঘরে রাখতে হয় ঘর গরম রাখার জন্য। সেই কয়লা থেকে আগুন চন্দ্রকিতে লাগে। তারপর সারা ঘরে ছড়িয়ে যায়। প্রথমে কেউ টের পায়নি। আগুন ছনের চালে লাগার পর এবং ঘর পুড়ে শেষ হলে লোকজন দৌড়ে আসে। বিরাট ক্ষতি হয়েছিল ইয়াসিন বসনির এবং তা কাটিয়েও উঠেছিল। আবার নতুন ঘর, নতুন চাষ। ইয়াসিন ভাগ্যবান পুরুষ। কিছুতেই বসে যায় না, দ্রুত কেটে যায় ক্ষয়-ক্ষতি। মাঝে মাঝে এমন যে কেন হয়, যে মানুষটির কথা একটু ভাবতে চায় না, সে-ই ছিদ্রপথে প্রবলবেগে প্রবেশ করে। একদম তছনছ করে দেয় ভেতরটা। এতক্ষণ পর ওর মনে হয়, বমি পাচ্ছে। ও গামছাটা নাক থেকে খুলে বড় করে শ্বাস টানে। অনেকক্ষণ ধরে পুকুরে গোসল সেরে ও যখন পলু ঘরে আসে, তখন সন্ধ্যা উতরেছে। কুতুব বসে আছে বারান্দায়। চিকন কাঠি দিয়ে বারান্দায় মাটিতে আঁকিবুঁকি কাটছে। কুতুব ওর দিকে তাকায় না। আজমল গামছা দিয়ে ভালো করে চুল মোছে। ভেজা চুল নিয়ে ঘুমুলে রাতে ঠাণ্ডা লাগবে এবং সর্দি ধরবে। সর্দি জিনিসটা ও ভীষণ ভয় পায়, ওর খারাপ লাগে।

কুতুব কেমন আছো?

ও ঘাড় তোলে না। বাশার হারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। ওটা কুতুবের সামনে রাখলে ও রেগে ওঠে।

হারিকেনটা রাখার আর জায়গা পেলি না হারামজাদা।

আপনার বাতি লাগবে না? আপনি না কি করছেন?

তোর মুণ্ডু।

কুতুব দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওঠে। আজমল বাশারকে হারিকেনটা সরিয়ে নিতে বললে ও ঘরে নিয়ে যায়। বারান্দায় অন্ধকার নেমে আসে।

কুতুব ভাত খাবে?

খাব। কয়দিন ভাত খাইনি।

কি খেলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুড়ি, রুটি, ছাতু, ছোলা—যখন যা পাই।

তুমি আমার এখানে থাকো।

থাকব।

ও সুবোধ বালকের মতো ঘাড় নাড়ে। আজমল জানে, ও থাকবে না। অস্থিরতা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, কিছু দিন ধরে সেটা আরো বেশি হয়েছে। আস্তে আস্তে ও অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন হঠাৎ করে কারো চোখে পড়বে না, আজমলের মনে হয়, ও বুঝতে পারে। দুজন চুপচাপ। কুতুব একই ভঙ্গিতে বসে আছে। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে, কান পেতে শুনলে কখনো ভালোই লাগে।

কুতুব?

ঝিঁঝির ডাক ভালো না?

জোহরার হাসির মতো।

কুতুব নির্বিকার বলে।

না, তেমন নয়। তুমি ভালো করে শোনো।

আমি অনেকদিন শুনে দেখেছি। এখনতো আরো বেশি করে শুনি। ও বিচলিত না হয়ে বলে। আজমল চুপ। এমন হৃদয় নিঙড়ানো কথা শুনে ওর বুক কেঁপে ওঠে।

আজমল ভাই, জোহরা তেঁতুল গাছে মরল না?

হ্যাঁ।

তেঁতুল গাছে ভূত থাকে, না?

আমি জানি না।

আমি জানি, থাকে।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড শব্দে হেসে ওঠে। সে হাসি থামতে চায় না। আজমলের গা ছমছম করে। কিন্তু ও কুতুবকে হাসি থামাতে বলতে পারে না।

আমি ভাত আনতে গেলাম।

বাশার দ্রুত বারান্দা থেকে নেমে যায়। ও অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে কুতুবের হাসি থেমে যায়। নীরবতা দুজনকে গ্রাস করে।

আমি যাই আজমল ভাই।

না, যাবে না। তুমি থাকো, আমার সাথে ভাত খাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমলের মনে হয়, অন্ধকারে কুতুবের চোখ জ্বলছে। ও ভীষণ কিছু খুঁজছে, যেন পাচ্ছে না। ও ভীষণ কিছু করতে চায়, পারবে না। ওর সামনে এখন ভয়াবহ অন্ধকার। আজমলের শরীরে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়।

মানষ মরে গেলে কেমন লাগে আজমল ভাই?

আমি জানি না।

আপনার মরার ইচ্ছা হয়?

না। আমার ভয় লাগে। তোমার হয়?

আমি মরতে চাই না। আমার খুন করার ইচ্ছা হয়। আমি খুন করব আজমল ভাই।

কাকে খুন করবে?

বলতে পারি না। আমি যাই।

ভাত ভাবে না? কুতুব? ও কুতুব?

অন্ধকার থেকে কোনো সাড়া আসে না। কুতুব কয়েদ চাচার মতো রহস্যময় হয়ে যাচ্ছে, হোক। একজন লোক ওর অলক্ষ্যে এই ভোলাহাট থেকে সরে গেলে কারো কিছু এসে যায় না। ওর নিজের যে কুতুবের জন্য খারাপ লাগছে, সেটাই বা কয়দিনের? ও বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। তারাভরা আকাশ অপূর্ব। মন ভরে যায়। কুতুব চলে গেছে, এখন ওর ভয় করছে না। কুতুবের জন্য কি ওর কোনো মমতা নেই? না কি ওর উপস্থিতি অসহ্য বলে ওর ভয় করে? তাহলে খেতে বলেছিল কেন? এসব মিশ্র অনুভূতি ওকে বিষণ্ন করে রাখে। ওর ঝিমুনি আসে। হারিকেনটায় বোধ হয় কেরোসিন নেই, দপ্‌দপিয়ে নিভে যায়। ওর মনে হয়, চারদিকে কেরোসিনের গন্ধ। বাতাস ভারী। বাশার এখনো ফিরছে না কেন? রান্না কি হয়নি? হরেকের কথা মনে হয় ওর। হরেক তেজী ছেলে, বুকে সাহস ভরা। এমন ছেলেদের জন্যই নাচোল তেভাগার প্রাণ। এমন ছেলেরা আছে বলেই ওখানে আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে। হরেকের নিকোন উঠোন, মহুয়া গাছ, জোড়া শূকর সম্বলিত গৃহস্থলির ছবি দেখতে দেখতে ওর ঘুম পায়। ওর স্বপ্নে নাচোল প্রবল হয়ে ওঠে।

সকালে অনেক বেলায় ঘুম ভাঙে ওর। রাতের স্বপ্নটা মাথার মধ্যে স্পষ্ট—যেন সরলরেখায় মগজের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলে গেছে। কোথাও কোনো ছেদ পড়েনি। সাঁওতালদের একটা জঙ্গি মিছিল ওর স্বপ্নে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ওর উঠতে ইচ্ছে করে না। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। মনে পড়ে, রাতে ওর খাওয়া হয়নি। অথচ খিদে নেই। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস, নরম আলো, মনোরম সকাল ও ওর স্নায়ু শীতল করে রাখে। সবাইকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, এমনকি আছিয়া খাতুনকেও। আজ ও পলুর প্রজনন করবে। সারা দিন ভালো যাবে, ভাবতেই উঠে পড়ে।

তখন গামছায় বাতের বাটি বেঁধে বাশার আসে।

আপনার ভাত আনলাম।

এখন?

রাতের বেলা কুতুবের হাসি শুনে আমার ভয় করেছিল। আমি এজন্য আসিনি। মাগো, কী হাসি! আপনার ভয় করেনি?

আজমল উত্তর দেয় না। মাদুর আর বালিশ ঘরের কোণে গুছিয়ে রাখে। ওর মাথার মধ্যে আছিয়া খাতুন ঢুকছে। আছিয়া খাতুন ইয়াসন বসনির মতো তেভাগার কথা শুনতে পারে না। আজমলের কাছে এটা তার অনেক অপরাধের মধ্যে আর একটি মহাপাপ। ও তখন অদৃশ্য আছিয়া খাতুনের উদ্দেশ্যে খিস্তি করে, মাগী! তোর মুখে থুতু, থুতু, থুতু।

কিছু বলছেন?

বাশার বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে। ও উত্তর দেয় না। যে মেজাজটা মনে হচ্ছিল শীতল, তা খিচড়ে ওঠে দ্রুত ওলোট-পালোট হয়ে যায়, দ্রুত এলোমেলো হয়ে যায়, সাঁই করে চলে যাওয়া দ্রুতগামী রেলের মতো মেজাজের ওঠা-নামা। পুকুরে গিয়ে মুখ ধুয়ে আসে। পুকুরের অপর পাড়ে আছিয়া খাতুনের রেড়ির বাগানের শুরু। রেড়ির ডালের মতো আছিয়া খাতুনের ঘাড়টা কি নরম? চাপ দিলেই কি ভেঙে যাবে? তখন সাঁওতালদের মিছিলের স্বপ্নটা প্রবল হয়ে ওঠে। ও জোরে জোরে গড়গড়া করে। পানির গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঢেউ বানায়। তখন ওর মনে হয়, আজ ও পলুর প্রজনন ঘটাবে। হাজার হাজার ডিম পাড়বে, হাজার হাজার বাচ্চা ফুটবে, হাজার হাজার সাঁওতাল ছেলেদের মিছিল। ও দ্রুত ঘাট বেয়ে উঠে আসে। বাশার গামছার গিঁট খুলে ভাতের বাটি বের করেছে। রাতের ভাত বলে পানি দিয়ে ভেজানো। সঙ্গে আলু দিয়ে শোল মাছের তরকারি। ও গপ্‌গপিয়ে ভাত খায়, সপ্‌সপ শব্দ হয়। ভাতের লোকমা বড় বড়, গাল ফুলে ওঠে, চিবুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কষ্ট হয়। মনে হয়, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে যাবে বুঝি। বাশার ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

মিয়াভাই?

বল।

আপনার যেন কী হয়েছে!

ঘন্টা হয়েছে।

ও ভেংচি কাটে।

কুতুবের সাথে আপনি কথা বলবেন না।

তোর কি হারামজাদা!

ও আর মানুষ নাই।

বাশার কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে।

মানুষ নাই?

প্রচণ্ড ধাক্কায় আজমলের গলায় ভাত আটকে যেতে চায়, ও বিষম খায়। কাশতে কাশতে ওর চোখে পানি আসে। বাশার ওর দিকে পানির মগ এগিয়ে দেয়। ওর আর ভাত খাওয়া হয় না। বাশার বিব্রত হয়ে বলে, যাকে দেখলে ভয় লাগে ও কি মানুষ থাকে? আজমল কথা বলে না। ওর প্রচণ্ড রাগ হয়। ভাতের থালা ঠেলে উঠে পড়ে। ও নিজে নিজে ফুঁসতে থাকে। এক সময় চিৎকার করে বলে, ইয়াসিন বসনি একটা শুয়োর।

একটা চিৎকারে নিজের আবেগকে গলিয়ে দেবার পর পলু ঘরে ঢুকতেই অবিস্মরণীয় আনন্দদায়ক মুহূর্ত ওকে মুগ্ধ করে ফেলে। ও নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে। ভোলাহাট, কানসাট, গোমস্তাপুর, নাচোল, রোহনপুরের বিস্তৃত চরাচর ওর চোখের সামনে একাকার হয়ে যায়। আজ ওর বড় সুখের দিন। পলুর প্রজনন ওকে সবসময় আনন্দ দেয়। ঠিক চৌদ্দ দিনের মাথায় রেশম গুটি কেটে বেরিয়ে আসা পুরুষ ও স্ত্রী মথ সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। আজমল ওগুলোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। ও এখন অপেক্ষা করবে, জন্মের অপেক্ষা। এই সময় ও উত্তেজিত থাকে, কোনো কিছু ভাবতে পারে না। কখনো বসে, কখনো পায়চারি করে, সময় দেখে ঘন ঘন। মিলিত হওয়ার আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে পুরুষটিকে তাড়িয়ে দিয়ে স্ত্রী মথটিকে কাগজের ওপর রেখে বাঁশের তৈরি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবে। স্ত্রী মথটি কাগজের ওপর ডিম পাড়তে থাকবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড়া শেষ হবে। ও উঠে বারান্দায় আসে। একটু পর সবচেয়ে কঠিন কাজটা করতে হবে ওকে। বাশার একা একা কথা বলছে। পৃথিবীর কারো ওপর ওর কোনো রাগ নেই। রাগ এখন নিজের ওপর, নিজের সঙ্গে যুঝাযুঝি। আর কিছুক্ষণ পরই সঙ্গমলিপ্ত পুরুষ মথটিকে ছাড়িয়ে নেবে ও। ওর বুক কেমন করে। এই কাজ করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তবু প্রতিবার ওর বুক কেমন করে। বাশার এখন বারান্দায় নেই, বাসন-কোসন নিয়ে গেছে। ও আবার ঘরে ঢোকে, আবার উবু হয়ে বসে। মোটাসোটা পুরুষ মথগুলো একটা টুকরিতে রাখে। ছাড়াতে কষ্ট হয়। এগুলোর পাখা থেকে রেণু লেগে আঙুল আঠা আঠা হয়ে যায়। ওর কপালে ঘাম, মুখে আনন্দের হাসি। ওর অবচেতনে নতুন প্রজন্মের বেড়ে ওঠা। স্ত্রী মথগুলোকে কাগজের ওপর ঢাকনার নিচে রেখেছে। আজমলের ঠোঁটে ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে। পোকাগুলোর শরীরে কি এখন মিলনের অতৃপ্তি? নাকি কাঙ্ক্ষিত কামনা চরিতার্থ হয়েছে? আহ কী আজগুবি ভাবনা, ও নিজেকে ধমকায়। কাজ শেষ করে পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসে। দুপুর গড়িয়েছে, সূর্য খাড়া মাথার ওপর। টুকরির পলুগুলো গা এলিয়ে পড়ে আছে, শরীর ভারী। ও পোকাগুলোর পাখা নাড়ানো দেখে। ডিম পাড়া হয়ে গেলে স্ত্রী মথগুলো পেব্রিন রোগমুক্ত কি না, দেখতে হবে। সামান্য একটু পানিতে মাখলেই এটা বোঝা যাবে। পেব্রিনে আক্রান্ত হলে সেই মথের ডিম সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে ফেলতে হয়। দুর্বল পলুর রেশমের মনে হয় খারাপ। কী জটিল প্রক্রিয়া! কত দিকে যে খেয়াল রাখতে হয়। মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর মনে হয় আজমলের। একবার মহামারী লাগলে দিন-রাতের হিসেব থাকে না। সময় ফুরিয়ে যায় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায়। ওদের সুস্থ-সবলভাবে বাঁচিয়ে রাখলেই আজমলের জীবন সুখকর হয়, ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে।

তখন টিনের থালাটা ঠক্ করে বারান্দার ওপর রাখে কয়েদ চাচা। তারপর পা ছড়িয়ে বসে। হাতের নখ লম্বা হয়ে গেছে, ময়লা ভরা। গায়ে জামা নেই। উস্কোখুস্কো চুল, জট পাকানো। আজমলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

দে।

আজমল জানে, কি দিতে হবে। ও ট্যাক থেকে বিড়ি বের করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়াশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। কয়েদ চাচা নির্বিকার টানে।

চাচা?

উত্তর নেই। আজমল তার মুখ নিরিখ করে। কপালে অসংখ্য ভাঁজ। গোঁফের অন্তরালে চেহারার অর্ধেকটা ঢাকা, অভিব্যক্তি বোঝা মুশকিল। মানুষ কি করলে এমন সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে যেতে পারে?

চাচা ভাত ভাবেন?

নির্বিকার বিড়ি ফোঁকা ছাড়া আর কোনো কথা নেই। আজমলের মনে পড়ে, কয়েদ চাচার মুখে ও কোনোদিন পুরো বাক্য শোনেনি। একটি দুটি শব্দ শুনছে, তাও ক্বচিৎ, কখনো।

চাচা ভাত খাবেন?

টিনের থালা বাড়িয়ে দেয় শুধু, অর্থাৎ ভাবে। এই থালাটি একমাত্র সঙ্গী, আর কোথাও কিছু নেই। আজমল বাশারকে ভাত আনার জন্য পাঠিয়ে দেয়। কয়েদ চাচার বিড়ি শেষ হলে আরেকটি বিড়ি দেয়, চাচা নেয় না। আজমলের চোখে চোখ রেখে বলে, রাজা অ্যাসবি।

রাজা?

ও বিস্মিত হয়।

রাজা কে?

কয়েদ চাচা চুপ। আজমল খুব কাছে এসে বসে, একদম মুখোমুখি।

রাজা কে বলেন?

কয়েদ চাচার ঠোঁটে কি মৃদু হাসির ঝিলিক? আজমল বুঝতে পারে না। ওর ভেতরে প্রচণ্ড অস্থিরতা দপ্‌দপিয়ে ওঠে।

চাচা বলেন?

ও চাচার পায়ে হাত রাখে। মানুষটিকে জানার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় ও মরিয়া হয়ে উঠেছে।

চাচা আপনার পায়ে পড়ি, আপনাকে বলতে হবে।

না, উত্তর নেই। আজমল এক নির্বিকার মানুষের ধু-ধু দৃষ্টি অবলোকন করে। যে মানুষটি কথা বলে না, সে একটি কথা বলেছে। কেন, তা ওকে জানতেই হবে।

রাজা কেন আসবে চাচা?

তুমার স্যাথে মুলাকাত করবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন?

তুমাক লিয়্যা য্যাবার চ্যায়।

কেন? আমি কোথায় যাব? ও চাচা আমি কোথায় যাব?

না, উত্তর নেই। বরং একটু বিরক্ত হয়। বারান্দার নিচে নেমে পায়চারি করে। পুকুরে নেমে হাত-মুখ ধোয়। তারপর আবার ফিরে আসে। আজমলের মন খারাপ হয়ে যায়। ওর কিছুই ভালো লাগে না। মানুষটির উপস্থিতি ওর ভেতর রাগ বাড়ায়। ও গুম হয়ে থাকে। একটু পর দেখতে পায়, থালা হাতে কয়েদ চাচা চলে যাচ্ছে। শিথিল হাতে শূন্য থালা ঝুলছে। ও ডাকে না, ডাকার ইচ্ছে হয় না। কয়েদ চাচা তুঁত গাছের আড়ালে হারিয়ে যায়। মহা-স্থবিরতা ওকে যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে, ওর নড়ার ক্ষমতা নেই।

আছিয়া অবাক হয়ে ইয়াসিনকে দেখে, রুক্ষ উস্কোখুস্কো চেহারা, বোঝা যায়, প্রচণ্ড ঝড় সামলে উঠতে পারেনি। জোহরার মৃত্যুর পর এই প্রথম এলো আছিয়ার এখানে। ভাঙাচোরা চেহারায় ইয়াসিন বসনির বয়স বেশ বেড়ে গেছে। লোকটির দাপট এবং প্রতিপত্তির সামনে কেউ জোরে কথা বলেনি। সব সময় মাথা পেতে নীরবে মেনে নিয়েছে। এই প্রথম জোহরা প্রতিবাদ করল, নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে প্রতিবাদ। ইয়াসিন বসনির সারা জীবনের ভিত ধসে পড়েছে। ও আছিয়ার মুখের দিকে তাকাতে পারে না। গ্লানিতে মাথা নিচু হয়ে যায়। ইয়াসিন বসনি অবসন্নের মতো বসে থাকে। আছিয়া এক গ্লাস সরবত বানিয়ে আনে।

খান।

ইয়াসিন এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে। কোনো কথা নেই, উপদেশ না, সান্ত্বনা না। এজন্য ও ওখানে এসেছে। আছিয়ার অনুভূতি তীক্ষ্ণ, কখন কি বলতে হবে, বুঝে নেয়, পরিমিত কথা বলে। আছিয়া জানে, সন্তানের মৃত্যুতে সান্ত্বনা হয় না, শুধু মুখের কথায় এতবড় ক্ষতি পূরণ হয় না। ও বাড়তি কথা বলে মেজাজ খারাপ করে দেয় না। ইয়াসিন বসনি আছিয়াকে জানে, বোঝে, এই প্রথম ওর জন্য একটা তীব্র মানসিক টান অনুভব করে। জোহরা ভেতরটা ওলট-পালট করে দিয়েছে। ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন হাজার রকমের কথা বলেছে, হুল ফুটিয়েছে, সে দংশন ওকে পীড়িত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখেছে। জীবনের এই পরাজয় ওর কাছে বড় আকস্মিক।

আছিয়া লুঙ্গি-গামছা আনে। সরষের তেল এনে চুলে মাখিয়ে দেয়।

চলেন গোসল করেন। শরীল ঠাণ্ডা হবে।

ইয়াসিন সুবোধ বালকের মতো কুয়োপাড়ে আসে। আজ তার কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই। মনে হয়, নিজেকে কারো কাছে সমর্পণ করে দেয়ার মতো আনন্দ বুঝি আর হয় না। চাঁড়ির পানি ঠাণ্ডা হয়ে আছে। গায়ে ঢালতে শীতল হয়ে যায় শরীর। এ-কয়দিন ওর একদম ঘুম হয়নি। আজ একটা প্রচণ্ড ঘুম চাই। এই শীতল ছায়াচ্ছন্ন বাড়িটা এজন্য ওর ভীষণ প্রয়োজন।

ও গোসল সেরে এসে দেখে পরিপাটি করে ভাত সাজানো, তিন-চার রকমের তরকারি। আয়োজন সামান্য কিন্তু যত্নের তুলনা হয় না। পারিপাট্য আছিয়ার স্বভাবের অন্তর্গত, নইলে স্বস্তি পায় না। ইয়াসিন বসনি সবকিছু নিজের জন্য এবং নিজের বলে ভাবতে ভালোবাসে।

খাবেন না? বসেন।

ও খেতে বসে। আছিয়া কাঁসার বাটিতে ভাত-তরকারি তুলে দেয়। দু গ্রাস ভাত খেয়ে ও সোজাসুজি আছিয়ার মুখের দিকে তাকায়।

তুমি কিছু বললে না আছিয়া?

কি বলব? বলার কি আছে?

আমি নিজ হাতে মেয়েটাকে খুন করলাম, না?

আছিয়া চুপ করে থাকে। ইয়াসন ভাত খেতে পারে না, বুকে আটকে যায়, পানি খায় ঢক্‌ঢকিয়ে। তারপর হুঁ হুঁ করে কেঁদে ওঠে।

আমি ভেবেছিলাম, ভালোবাসা-টাসা কিছু না। বিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কুতুব কি পাত্র হলো? আমার জোহরাকে ভাত দিতে পারত না।

আপনি বোঝেন না কেন যে, ভালোবাসা ভাত চায় না?

আছিয়া!

ইয়াসিন বিস্মিত হয়ে তাকায়।

আপনার জীবনে ভালোবাসা নাই বলে বোঝেন নাই।

আছিয়া এমন করে বলবে না।

ইয়াসিন হাত গুটিয়ে বসে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাত খান।

ভালোবাসার জন্য মেয়েটা মরে গেল, এও কি সম্ভব?

আছিয়া দৃঢ়স্বরে বলে, সম্ভব।

তুমি যেন কেমন হয়ে গেলে আছিয়া। আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না।

জোহরা মরে আমার বুকে আগুন দিয়েছে।

কেন?

আপনি আর আমার এখানে আসবেন না।

তোমার এত সাহস?

ইয়াসন অস্ফুট আর্তনাদ করে।

সাহস না, বুক পোড়ে।

ইয়াসিন কথা বলে না। অন্য সময় হলে আছিয়া এই কথা উচ্চারণ করলে ইয়াসিন ওর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলত। ও প্রতিবাদ সহ্য করে না, তাও আবার মেয়েমানুষের প্রতিবাদ। এখন ওর মনে হয়, যুবতী কন্যা মরে গেলে মানুষের বুক থেকে সাহস কমে যায়। তাও আবার সে মেয়ে যদি ভালোবাসার জন্য জীবন দেয়।

আপনি ভাত খান।

আছিয়ার কণ্ঠে কী যেন ছিল, ইয়াসিন ভাত খেতে শুরু করে। বারবার মনে হয়, আছিয়ার বাধ্য হতে ভালো লাগছে ওর। এ ধরনের অনুভূতি ওর সারা জীবনে কখনো হয়নি। ও জীবনকে দেখেছে অধিকারে এবং স্বেচ্ছাচারিতায়। ওর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। হাতের উল্টো পিঠে মুছে ফেলে চোখ। ভিত্ ধসে গিয়ে ভীষণ এক দৈন্যদশা ওকে জরাগ্রস্ত করেছে। ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, পড়ে যাচ্ছে। প্রবল হয়ে উঠেছে জোহারার মৃত্যু।

আছিয়া দুটুকরো মাছ উঠিয়ে দেয়, একটুখানি ডাল, সঙ্গে আরো এক চামচ ঝিঙ্গাশাইল চালের ভাত। ওর মুখটা কঠিন, চোয়ালে কালো দাগ, দৃষ্টিতে ঝড়। ইয়াসিনের হাত থেমে যায়। আছিয়ার চোখে চোখ পড়লে ও ঠাণ্ডা গলায় বলে, আমি এমন জীবন চাই না।

ইয়াসিন প্রবল আগ্রহে বলে, আমি তোমাকে বিয়ে করব।

না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছিয়া আমি তোমাকে ভালোবাসতে চাই।

ও বাম হাত দিয়ে আছিয়ার হাত চেপে ধরে। আছিয়া হাত ছাড়িয়ে নেয়।

আমাদের আর ভালোবাসা হয় না।

কেন হবে না?

আমরা আর মানুষ নাই।

এমন করে বলবে না।

ইয়াসিনের কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর। আছিয়া উপেক্ষা করে বলে, আমরা পলু পোকা হয়ে গেছি। আমাদের গলার চারদিকে মুগা সুতার দড়ি। আমরা ভালোবাসা খেয়ে ফেলেছি।

ও আঁচলে চোখ মোছে। ইয়াসিন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, যেমন বিস্ফারিত হয়েছিল জোহরার চোখ। সে চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠেছিল ও। এখনো তেমন শিরশিরে অনুভূতি ওকে শীতল করে দেয়। এই মেয়েমানুষটিকে ও কোনোদিন বুঝতে পারেনি। আসলেই ও একটা রেশম পোকার গুটি। ওর চারদিকে লক্ষ সুতোর প্যাঁচ। এ আবরণ ভেদ করা দুঃসাধ্য। আছিয়ার কান্না থামে না, ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। এই নিরিবিলি ঠাণ্ডা বাড়িটার ঘরবসতি পাল্টে দেবার প্রবল ইচ্ছায় ওর বুকে ছটফটানি। ওর সামনে যে মানুষটি বসে আছে, ও এখন তার মৃত্যু কামনা করছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩

চৌদ্দই আগস্ট নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হলো। মালদহ জেলার পাঁচটি থানা—চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, নাচোল ও গোমস্তাপুর রাজশাহী জেলার সঙ্গে যুক্ত হলো। রামচন্দ্রপুর হাটের হিন্দুদের মুখ শুকনো, থমথম করছে ওদের বাড়িঘর। এক বছর আগের কলকাতার দাঙ্গার কথা কেউ ভুলে যায়নি। মুসলমানদের দেশ পাকিস্তান, থাকতে পারবে কি ওরা? না কি চলে যেতে হবে বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে? এই মানসিক টানাপোড়েনের অস্থিরতা ওদের পীড়িত করে।

তখন জমিদারবাড়ির অন্দরে রমেনের মা দৃঢ়কণ্ঠে ছেলেকে বলে, স্বামীর ভিটে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। জীবনের শেষ বেলা পর্যন্ত এই গ্রামে কাটল আমার, সুখে-দুঃখে, আচার-আচরণে, পালা-পার্বণে সবাই তো এক সাথে থাকলাম। কোনো দিন তো বিরোধ হয়নি। তবে কেন যাব নিজের দেশ ছেড়ে?

তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ মা যে মুসলমানের জন্য পাকিস্তান তৈরি হয়েছে।

মান না। এটা মাটি আমার দেশ, শুধু হিন্দু বলে এখান থেকে চলে যাব কেন? এখানে আমারও অধিকার আছে।

রমেন মার মুখো দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। এই একটি ব্যাপারে ওর মার অবিচলতা ওকে বিস্মিত করে। আসলে ভিটেমাটি এমনই জিনিস, এখানকার ঋণ শোধ করা যায় না। এই ঋণ পায়ে ধরে টেনে রাখে। যারা সঙ্কটে পড়েছে, তাদের ও বোঝোতে পারবে, এখানকার মানুষকে আন্দোলনের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে, ওদের শোষণ বঞ্চনায় শরিক হয়েছে, একটা নতুন কিছু হবে। তবে কেন চলে যাবে ওদের ছেড়ে?

ফণীভূষণ ঘর্মাক্ত কলেবরে ছুটে আসে, তুমি ওদের বোঝাও রমেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা খুব মনমরা হয়ে গেছে। কালাচাঁদ তো ভাত-পানি ছেড়ে দিয়েছে।

রমেন মৃদু হাসে।

এতবড় একটা রদবদলে একটু তো হবেই। এ-নিয়ে ভাবনা কি? সব ঠিক হয়ে যাবে। যখন দেশের কোথাও কোথাও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হয়েছে, তাদের একত্রে বাস করা নিয়ে কথা উঠেছে, তখন আমাদের এখানে কিছু হয়নি, কোনো সংকট আমাদের স্পর্শ করেনি। আজো করবে না। চলুন বাজারের দিকে যাই, আমাদের উচিত সভা করা, সে সভায় নতুন রাষ্ট্রের জন্ম-উৎসব পালিত হবে, আমরা আনন্দ করব।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বাজারের দিকে যায়। ফণীভূষণ দুশ্চিন্তামুক্ত হয়। পথে নীতেশের সঙ্গে দেখা, কি রে কোথায় যাচ্ছিস?

আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম—

নীতেশ আমতা আমতা করে। চোখে-মুখে আতঙ্ক, এখনো সহজ হতে পারছে না।

আমরা কি করব বাবু?

কি করব মানে?

রমেন যেন আকাশ থেকে পড়ে।

মা বলে দিয়েছে, ভিটেমাটি ছেড়ে কোথাও যাবে না।

সত্যি?

নীতেশের চোখ চকচক করে ওঠে।

হ্যাঁ রে বাপদাদা চোদ্দ পুরুষের ভিটে ছাড়বি কেন?

আমিও তো তাই বলি। দাদা শুনতে চায় না। সে-জন্যই তো আপনার কাছে যাচ্ছিলাম। কত্তা-মা যাবে না শুনে মনে অনেক জোর পেলাম। মাগো কী ভাবনাই যে হচ্ছিল। যাই, সবাইকে বলিগে।

নীতেশ দৌড়ুতে দৌড়ুতে চলে যায়। যাকে পায়, তাকেই বলে, জানিস কত্তা-মা ভিটেমাটি ছেড়ে কোথাও যাবে না, আমরাও যাব না।

ওদের পাঁশুটে চোখে আলো জ্বলে ওঠে। কালাচাঁদ সেদিন পেট ভরে ভাত খায়। রাস্তার মোড়ে রমেন ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, ভয় কি, আমরা তো আছি।

মাতলার কোনো ভয় নেই, ও বরং খুশি। ও রমেনকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, নতুন দেশ পেলাম, এবার আমাদের দুঃখ ফুরোবে, কি বলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমেন হেসে ফেলে, হয়তো ফুরোবে। তবে সংগ্রাম না করলে কেউ কি হাতে তুলে দেয় রে?

আজিজ এ কথায় সায় দেয়। নতুন দেশ ওকে আবেগতাড়িত করে, কিন্তু ও বোঝে, ক্ষমতার হাত-বদল হলেই সমস্যার সমাধান হয় না। যে সমস্যার মূল গভীরে, তাকে উপড়ে ফেলা কি এতই সহজ?

ফণীভূষণের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আজিজ এ-সভাই আলোচনা করে, খালি সীমানাই তো টানা হয়েছে ফণীদা, জোতদারদের গোলার মুখ তো আর বন্ধ হয়নি। ওরা পারলে ঐ মুখে গোটা দেশটাই ঢোকাতে চাইবে।

ভালো বলেছ।

ফণীভূষণ হো হো করে হাসে।

ক'দিন পর বেশ মন খুলে হাসলাম। এটা সত্যি যে, আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। অধিকার আদায় বড় কঠিন। ফণীভূষণের কাঁচা-পাকা চুল বাতাসে ওড়ে। আকাশে মেঘ করেছে। বেশ একটা হিমেল হাওয়া বয়ে আসছে। আজিজ বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়।

রমেন বলছিল, নতুন রাষ্ট্রের জন্য উৎসব পালন করবে।

আজিজ সোৎসাহে বলে, আমিও তাই বলি। অনেক দিন গাঁয়ে আমোদ-ফুর্তি নেই। ভালোই হবে একটা আয়োজন করলে। আলকাপ গানের আসর বসাব ফণীদা?

মন্দ না। শুক্র মাঝিকেও খবর দাও। ওরাও নাচ-গানের ব্যবস্থা করুক।

হ্যাঁ, সবার সঙ্গে মিলিমেছি এক মহা-সমাবেশ হোক। দুজনে হো-হো করে হাসে। সে হাসিতে মেঘ ভেসে আসে। আকাশ কালো করে বৃষ্টি ঝরতে শুর করলে দুজনে দৌড়ে দিয়ে হাতেমের আড়তে ওঠে। ও দ্রুত হাতে ঝাঁপ বন্ধ করছে। বৃষ্টি তখন ভালোই নেমে গেছে। পেঁয়াজের বড় ধামাটা এক পায়ে সরিয়ে হাতেম ওদের বসতে দেয়।

দুদিন পর সাঁওতালদের ঢোলের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে রামচন্দ্রপুর হাট। দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে বড় সামিয়ানা এনে টাঙানো হয়েছে। নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভরে যায় প্রাঙ্গণ। সবার মতানুসারে রমেন মিত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে, কবুতর উড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় আকাশে। সবুজের বুকে শাদা চাঁদ তারা আঁকা পতাকার দিকে তাকিয়ে গমগমে কণ্ঠে বক্তৃতা করে রমেন মিত্র, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে আমরা চাই শাদামাটা জীবনের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ, কৃষক চায় তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ফসল যেন অন্যায়ভাবে কেউ কেড়ে না নেয়, ভূমিহীন চায় এক টুকরো জমি, সাধারণ মানুষ চায় বেঁচে থাকার মতো কাজ, নারী চায় সামাজিক মর্যাদা, স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখী জীবনের স্বপ্ন। আমরা এখন সুখের প্রত্যাশায়। আমরা নতুন রাষ্ট্রের দীর্ঘায়ু কামনা করি। প্রবল করতালিতে বক্তৃতা শেষ হলে শুরু হয় গান। গানে গানে কেটে যায় রাত। আলকাপ গান দিয়ে আসর মাতিয়ে রখে শোয়েব সরকার।

একসময় গানের আসর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আজিজ। সুর ওর কানে ঢোকে কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করে না। ওর পাশেই ওয়াজেদ মোড়ল নীল ফতুয়া গায়ে দিয়ে প্রবল উৎসাহে গানের সঙ্গে মাথা নাড়াচ্ছে—গুনগুনিয়ে নিজেও গাইছে—একদম জমে গেছে। ভূমিহীন মজুর ও—দিন আনে দিন খায়—একটুখানি আনন্দ পেলে উপভোগ করতে ছাড়ে না। আগামীকাল থেকে ওর ছনের ঘরে একসঙ্গে থাকবে আজিজ। বাপের সঙ্গে আর না। যার জীবনের সঙ্গে ওর আদর্শের মিল নেই, তার সঙ্গে সম্পর্ক টেনে লাভ কি? বরং প্রতিদিনের তেতো কথাবার্তা মন খিঁচড়ে রাখে, ক্রূ দৃষ্টি দেখলে শরীরে আগুন জ্বলে। ফর্মীভূষণের স্কুলে দপ্তরের কাজ করে দিলে একটা হাত-খরচা দেবে। পার্টি ফান্ড থেকে রমেন দেবে দশ টাকা। এই দিয়ে ওর মাস চলে যাবে। তা ছাড়া মাসের অর্ধেক দিনই তো ওর ঘরে থাকা হয় না। দূর-দূর গ্রামে চলে গেলে ঠিকমতো ফেরা হয় না। পার্টির কর্মীদের সঙ্গেই কাটিয়ে দেয়। ওর ভাবনা কি? ওয়াজেদ মোড়লের সঙ্গে কথা হয়েছে। নিঃসন্তান এক বিধবা বোন ছাড়া ওর সংসারে কেউ নেই। দুবার বিয়ে করেছিল। দুই বউই সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়। তারপর থেকে আর বিয়ের কথা ভাবে না। বলে, হামার ভাগ্যে বউ ন্যাই, ছাওয়াল ন্যাই। কথাগুলো বলার সময় অদ্ভুত এক বিষণ্নতায় ওর চেহারা কালো হয়ে যায়। এই বিষণ্নতা ও বেশিক্ষণ ধরে রাখে না। হাসিখুশি থাকতেই ভালোবাসে—গান-বাজনা হলে ওর ফুর্তির সীমা থাকে না। আজিজকে বলে, আপনে ঐ হারামজাদা বাপের স্যাথে থ্যাকেন ক্যান আজিজ ভাই? হামার কাছে চল্যা আসেন। হামরা দুই ভাই জোতদার খ্যাদামো। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউকে ল্যাগবিন্যা। কথা বলার সময় ওর সরল, বোকা চেহারা ঝল্‌কে ওঠে। তেল চক্‌চকে চুলগুলো পরিপাটী করে আঁচড়িয়ে পকেটে চিরুনি ঢোকাতে ঢোকাতে আড় চোখে আজিজের দিকে তাকায়। বিকেলে আজিজ ওকে একসঙ্গে থাকার কথা বলতেই ওকে জড়িয়ে ধরে। বলে, হামার কী ভাগ্য! চলেন হাট থেইখক্যা ইলিশ কিন্যা আনি।

আজ না। আর একদিন হবে।

আজিজ ওর মহা-উৎসাহ নির্বাপিত করে।

ঘরে কিছু ন্যাই যে!

ডাল-ভাত তো আছে?

আছে।

ওয়াজেদ মাথা নাড়ে।

ওতেই হবে।

আজিজ ওকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অনুষ্ঠানের কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন ওয়াজেদের খাবার কথা মনে নেই। ও গানে মশগুল হয়ে সব ভুলেছে। এই উৎসবমুখর মধ্যরাত থেকে আজিজ নিজেকে মুক্ত মানুষ মনে করে।

পরদিন ভোরবেলা গিলাবাড়ি সীমান্তের কাছে দাঁড়িয়ে আজমল হো-হো করে হেসে ওঠে। এ কেমন আজব নীতি যে, এখন থেকে এই সীমানার ওপারে আমি আর যেতে পারব না? এতদিনকার চিরচেনা মাটি এমন করে পর হয়ে গেল? ও কিছুতেই নিজের মনকে বোঝাতে পারে না। ক'দিন ধরে ভোলাহাটের সবখানে ধুমধামের সঙ্গে পাকিস্তানের জন্ম উৎসব পালিত হচ্ছে। ও তেমন সাড়া পাচ্ছে না। মনে হয়, কোথায় যেন কী ঘটে গেছে, যে ফাঁক ও পূরণ করতে পারবে না। এখন থেকে এই মাটির নাম পূর্ব পাকিস্তান, ও বিড়বিড় করে, এখন থেকে আমি পাকিস্তানি। এতদিন আমি বাঙালি ছিলাম, এখন থেকে সেটা কি আমি আর নেই? ওর কাছে সবকিছু কেমন গোলমাল ঠেকে। কার কাছে এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে? আজিজ ছাড়া ও আর কার কাছে যাবে? ও দ্রুত হেঁটে আসে অনেকখানি। আমি মুসলমান, আমি বাঙালি, আমি পাকিস্তানি, কোনটা আমার জন্য ঠিক। ও গোলাম আলির চায়ের দোকানে এসে বসে। দোকানে কেউ নেই। লোকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়লার চুলোয় ফুঁ দিচ্ছে, আগুন জ্বলাতে পারছে না। আজমল কাঠের বেঞ্চে পা উঠিয়ে নেয়। ধোঁয়ায় গোলাম আলির চোখ লাল হয়ে উঠেছে। দুহাতে চোখ কচলে বলে, এত ভোরে?

এলাম।

আজমল হাত উল্টিয়ে বলে। ভঙ্গিটা এমন যে, এই সংসারে ওর ভালোলাগার মতো কিছু নেই।

কপাল কুঁচকে রেখেছেন যে?

একটা জিনিস ভাবছি।

কি?

গোলাম আলির কয়লা জ্বলে ওঠে। ও কেতলিতে গরম পানি বসায়। আজমল ওর কাছে বাঙালি, মুসলমান, পাকিস্তানি ইত্যাদি সমস্যার কথা বলতেই, ও হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে বলে, পাগল না হলে এসব কেউ ভাবে? শুনছি পশ্চিম পাকিস্তান নামে আরেকটি জায়গা আছে। আমরা বোধহয় কোনোদিন তা দেখতেই পাব না। এতসব ভেবে লাভ কি আজমল ভাই? মুসলমানের একটা আলাদা দেশ হয়েছে, আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ, আমি এতেই খুশি।

ও বোঝে, গোলাম আলির কথায় যুক্তি আছে, ওর মতো হতে পারলে স্বস্তিতে থাকা যায়, কিন্তু ও মানতে পারছে না। ওর বুক খচ্‌খচ্‌ করে, বুক থেকে কাঁটা নেমে যায় না।

আপনি খুশি না আজমল ভাই?

ও হাঁ-না বলে না। এই সমস্যার একটা উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ও নিজেকে ভারমুক্ত করতে পারছে না। গোলাম আলি একগাল হেসে বলে, বুঝেছি, আপনার মন ভালো নেই। আপনার জন্য পরোটা বানাব?

বানাও।

গোলাম আলি গামলায় একগাদা আটা মাখায়।

শুনলাম, আপনার আব্বা আপনার জন্য মেয়ে খুঁজছেন?

কতবারই তো দেখলেন। বিয়ে করবে কে?

আপনি রাজি হন না কেন?

ভালো লাগে না। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।

আজমল সামনের পুকুরের এসে নামে। এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর ভালো লাগে না। মানুষের অহেতুক কৌতূহলকে ও ঘৃণা করে। গোলাম আলিকে এখন একটা পোকার মতো লাগছে। এসব মুহূর্তিক পরিবর্তন ওকে খুব অস্থির করে রাখে। ওর ঘাড়ে ঘাম জমে এবং নিঃশ্বাস বিলম্বিত হয়। আজমল গোলাম আলির ওপর রেগে থাকে। গোলাম আলি পরোটা বেলায় ব্যস্ত হয়ে গেলে ও কেটে পড়ে।

হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে হয়, ইয়াসিন বসনির আচরণেই ও বিয়ে থেকে বিমুখ হয়েছে। ও কখনো নারী নিয়ে ভাবে, সেটা সাময়িক, কিন্তু আবেগ তাড়িত হয় না। ইয়াসিন বসনির উগাখিচুড়ি জীবনযাপনে ওর ঘেন্না, ভাবলেই শীতল হয়ে যায় অনুভূতি। সেই ঠাণ্ডা বরফের নিচে চাপা পড়ে যায় বিয়ে-সংসার ইত্যাদির প্রশ্ন। তার চেয়ে এই অবাধ জীবন ভালো, যেখানে কারো জন্য পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। মুহূর্তে ওর ইচ্ছে হয়, আজিজের কাছে চলে যায়। এখনই রওনা হলে দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাব। ও আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না।

বিল ভাতিয়ার মাঝখানে আশিক আলির সঙ্গে দেখা। জাল পেতে একগাদা পাখি ধরেছে ও। খাঁচায় ভরে রেখেছে। আজমল জানে, সেদিন রেহানাকে বিয়ে করতে গিয়েও বিয়ে না করে ফিরে এসেছিল আশিক আলি। কেন—এ প্রশ্ন ওর অনেকবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সামনাসামনি হলে আর করা হয় না, তখন নিজের কাছে বাধে। পাখি নিয়ে ব্যস্ত আশিক আলি, ঘাসের দড়ি দিয়ে কতকগুলোর পা বেঁধে রেখেছে। আজমলকে দেখে এগিয়ে আসে।

কি খবর ভাস্তে, কোথায় যাচ্ছ?

আজিজের কাছে।

হঠাৎ?

এমনি যাচ্ছি। মন ভালো নেই। কাল আবার ফিরে আসব।

আমারও মন ভালো নেই। বিল ভাতিয়া ভাগ হয়ে গেল। অবশ্য একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। হিন্দু জমিদাররা আমাদের ওপর জুলুম করেছে অনেক।

জুলুমের কথা বলছেন? জুলুম কে না করছে? মুসলমান জমিদার-জোতদাররা কি আর ছেড়ে দিয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশিক আলি মাথা নেড়ে বলে, ঠিক বলেছ। তখন আজমল ওর কাছে বাঙালি, মুসলমান, পাকিস্তানি সমস্যার কথা ওঠায়। খুব করে বোঝাবার চেষ্টা করলে আশিক আলি হো হো করে হেসে ফেলে, আমরা চাষাভুষো মানুষ। আমাদের কি এতকিছু ভাবনা মানায়! আমি এইসব বুঝি না। বুঝতে চাই না। এতকিছু বুঝতে চাই না বলেই তো সেদিন রেহানাকে বিয়ে না করে ফিরে এলাম। কি হবে বারবার ভাগ্যের পরীক্ষা দিয়ে? এখন বুঝি, ভালোই করেছি। এই পাখি ধরি, খাই-দাই, ঘুরে বেড়াই, দিব্যি আছি। কোনো কষ্ট নেই। বিয়ে করলেই কষ্ট বাড়ে। জীবন থেকে এইসব ঝুট-ঝামেলা ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি। ভালো করেছি না?

করেছেন।

আজমল খুব আড়ষ্ট কণ্ঠে বলে। ওর মনে হয়, আশিক আলি অন্যরকম হয়ে গেছে। কয়েদ চাচা হয়ে যাবে না তো? ওর বুক খচ্‌খচ্‌ করে।

আমি জানি রে আজমল, আমার জন্য কেউ নেই। আমি বিশ্বাস হারিয়েছি। জোর করে কি সাহারার মতো ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যায়?

হো হো করে হেসে ওঠে আশিক আলি। ওর হাসিতে পাখিগুলো ডানা ঝাপটায়। আশিক আলি একছোড়া বেলে হাঁস আজমলের দিকে এগিয়ে দেয়, নে, আজিজকে দিস। ও পাখি খেতে ভালোবাসে। অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস যে?

আপনার শরীর বোধ হয় ভালো নেই চাচা? বাড়ি যান। রহিমুন ফুফু আছে তো?

থাকবে না তো কোথায় যাবে? ওর কি কেউ আছে? তবে আমার শরীর ভালোই আছে।

যাই।

আজমল বোঝে, খারাপের কথা বলা আশিক আলি পছন্দ করেনি। ও পাখি দুটোর ঠ্যাং ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে দ্রুত হেঁটে যায়। দুপুরের আগেই ও পৌঁছে যায় ওর মামার বাড়ি। বারান্দায় বসে হুঁকো টানছিল নাসির জোতদার। মুখ দেখেই বোঝা যায়, আজমলকে দেখে খুব খুশি হয়নি।

কি খবর? কি মনে করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল কিছুটা আহত হয়। মামী বেরিয়ে এলে তাকে সালাম করে। ও বারান্দায় উঠে এলে নাসির জোতদার খড়ম পায়ে বারান্দা থেকে নেমে যায়। ওর মামী চোখে আঁচল দেয়।

তুমি আজিজের কথা ওঠাবে, এজন্য মামা চলে গেল।

আজিজ কোথায়?

বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। শুনেছি ওয়াজেদ মোড়লের সঙ্গে থাকে।

আসে না?

কখনো আসে আমাকে দেখতে। তুমি গোলস করো। আমি ভাত দিচ্ছি।

মামী চলে গেলেও আজমল হাতল-ভাঙা চেয়ারটায় চুপচাপ বসে থাকে। ওর ইচ্ছে করছে, দৌড়ে আজিজের কাছে চলে যেতে। ওর বুকের ভেতর প্রবল এক আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। কিন্তু মামীর দুঃখের সামনে সে আনন্দ প্রকাশ করার উপায় নেই। ও আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে। ওর মামা কাচারি ঘরে গিয়ে বসে আছে, কাকে যেন বকাঝকা করছে। নিকনো উঠোনে একটা কুকুর শুয়ে এছ। কোথাও কোনা আবর্জনা নেই। আজমলের চোখের সামনে গোটা বাড়িটা একটা ফসল-কাটা মাঠের মতো হয়ে যায়। আজিজ নিজের মতো হয়ে গেছে। বাপের জোয়াল ওর কাঁধে নেই, ভাবতেই আজমল উঠে পায়চারি করে। ঘামে জামা ভিজে গেছে, পা ধূলিধূসরিত, তবু ওর গোসলের ইচ্ছে নেই। ও যেতে পারলে বাঁচে।

বারান্দায় মাদুর পেতে মামী ওকে খেতে দেয়। বড় কই মাছের দোঁপেয়াজি দেখেও ওর জিভে পানি আসে না। ও চিংড়ি দিয়ে করল্লা ভাজির সঙ্গে ভাত মাখিয়ে নাড়াচাড়া করে। কয়েক গ্রাস মাত্র খায়।

তুমি কিছু খাচ্ছো না বাবা?

আজিজের জন্য মন কেমন করছে।

ছেলেটা এত নিষ্ঠুর!

ওর মামী আবার চোখে আঁচল চাপা দেয়। আজমল কিছু বলতে পারে না। দ্রুত ভাত শেষ করে।

আমি যাই মামী। পাখি দুটো এনেছিলাম আজিজের জন্য। থাক এখানে।

নিয়ে যাও। ওকেই দিও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল পাখি দুটো হাতে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে। আজ ওর এক স্মরণীয় দিন। কত দিন এমন গভীর আনন্দে নিমজ্জিত হয়ে পারেনি।

ওয়াজেদ মোড়লের বাড়ি পৌঁছে ও হতাশ হয়ে যায়। আজিজ পার্টির কাজে অন্য গ্রামে গেছে। কবে ফিরবে, ঠিক নেই।

এ্যানা ডাল-ভাত খ্যান আজমল ভাই?

না।

ও নির্জীব কণ্ঠে বলে।

পাখি দুটো রাখো।

আজিজ ভাই পাখি খুব ভালোবাসে। হামি খ্যাঁচায় ভর‍্যা র‍্যাখ্যা দেব।

আজমলের কানে কোনো কিছু ঢোকে না। পাতায়-ছাওয়া ওয়াজেদ মোড়লের শান্ত-শীতল বাড়ির নির্জনতা ওর বুকের ওপর চেপে বসে। ওর দম ফেলতে কষ্ট হয়। আজিজের সঙ্গে দেখা না হওয়া যে কত বেদনার, ও কাউকে বা বোঝাতে পারবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ। নিজ খোলানে ধান তোল, আধির বদলে তেভাগা চাই।' অর্থাৎ মোট উৎপন্ন ফসলের দুভাগ পাবে চাষি, একভাগ পাবে মালিক।

অনেক রাত পর্যন্ত আজিজ আজমলের কাছে তেভাগা আন্দোলনের গল্প করে। কখনো উত্তেজিত হয়ে যায়, কখনো বিশ্বাসে স্থিত। দুজনের কারোই ঘুম আসে না। উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলন ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে, কৃষকরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে, দিনাজপুরে তন্নারায়ণ জোতদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহীদ হয়েছে, আজমলকে এসব খবর না দেয়া পর্যন্ত ওর স্বস্তি হচ্ছিল না। বুকের মধ্যে অনেক কিছু জমে গেলে ও ছুটে আসে আজমলের কাছে। শৈশব থেকে দুজনে একসঙ্গে বড় হয়েছে। ওর যে কোনো কাজেই ও আজমলকে সঙ্গী হিসেবে চায়। তেভাগার সংগ্রাম ওকে উদ্বুদ্ধ করেছে, রমেন মিত্র আন্দোলন জোরদার করে তোলার ডাক দিয়েছে। তন্নারায়ণের ঘটনা রমেন মিত্র গল্পের মতো করে যখন সভায় বলে, তখন অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। দুবছর আগে বাংলার প্রাদেশিক কৃষক-সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তেভাগার সংগ্রাম শুরু হয়। যত দিন যাচ্ছে, আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হচ্ছে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন ছিল সাধারণ মানুষের মনে, সে স্বপ্ন দিবাস্বপ্নে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে। মানুষ বুঝে গেছে, ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে মাত্র, উলুখড়রা উলুখড়ই। কৃষকরা এখন অধিকার আদায়ের দাবিতে রুখে উঠছে। উত্তরবঙ্গের ফসলহীন খাঁ খাঁ মাটি কৃষকের রক্ত জল করে শুষে নিচ্ছে, বিনিময়ে জুটছে শূন্য হাঁড়ির হাহাকার। কৃষকেরা রুক্ষ, ধু-ধু মাটিতে দাঁড়িয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রমে নিরন্ন এবং হাড়জিরজিরে। অন্যদিকে ফুলে উঠছে জোতদার, জমিদার, উঠতি বণিকরা। তাই মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুখে দাঁড়াচ্ছে মানুষ। ন্যায্য অধিকার চাই। এখন থেকে নিজের খোলানে ধান তুলবে ওরা, তারপর ভাগ করে নেবে।

আজিজের কথা শুনতে শুনতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যায় আজমল। মানুষের দুর্দশা ওকে সব সময় বিচলিত করে, এই দুর্দশার কথা শুনলে যুক্তির চাইতে আবেগ কাজ করে বেশি। ওর বাবা রেশম চাষি। বংশপরম্পরায় এই ব্যবসা চলে আসছে। ভোলাহাটের রেশম ব্যবসার দীর্ঘকালের ঐতিহ্য আছে। এখানে ঘরে ঘরে পলু চাষ হয়। দুভাগ, তিনভাগের প্রশ্ন এখানে নেই। প্রশ্ন নেই ভূমিহীন মজুরের। তাই তেভাগা আন্দোলন আজমলের জীবনে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা। এদিক থেকে আজি ওদের অনেক কাছাকাছি। বলে, ওদের কান্না আমি শুনতে পাই। ছেলেবেলায় দেখিসনি ওরা কেমন বাবার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ত। বড় হয়ে বুঝেছি, বাবা যা করছে, তা অন্যায়। আজমল, ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে।

আজমল মাথা নাড়ে। আজিজ বড় সুন্দর করে বলে। ওর কথা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। মাতলার অনেক গল্প করে আজিজ। বলে, মাতলা জাতে সাঁওতাল, কালো শরীর। ওদের বাপ জোতদার, শরীরে চিক্‌নাই। হলে কি হবে, মাতলার পাশে কিছু না। ও একটা খাঁটি মানুষরে আজমল। আমাদের এলাকায় তেভাগার আন্দোলন ও-ই চালাতে পারবে।

পাশাপাশি শুয়ে আজিজের নিঃশ্বাসের ওঠানামা টের পায় আজমল। আজিজের রোগা-পাতলা গড়ন, কিন্তু দারুণ কর্মক্ষম। অসুখ-বিসুখের বালাই নেই। ক্লান্তিতে সহজে কাবু হয় না। দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেও ও কেমন রাত জেগে গল্প করছে। আজমল পারে না, ও হাই তোলে।

আজিজ ঘুমাবি না?

মনে কথা জমে থাকলে ঘুম আসে না।

শব্দ করে হেসে উঠলে আজমলের হাসির শব্দ ভালো লাগে। হঠাৎ করে ওর মামার কথা মনে হয়, সে কি এসব মানবে?

আজিজ ছোট মামা—

বাবার কথা বাদ দে।

তোর ভয় নাই?

ভয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজ হো-হো করে হাসে। হাসি থামলে বলে, আমি তোকে তন্নারায়ণের গল্প বললাম না? তন্নারায়ণ জোতদারের হাতে শহীদ হয়েছেন। আমি না হয় জোতদার বাপের হাতে খুন হব। কি আর হবে?

আজিজ?

আজমল ওর বাহু চেপে ধরে।

তোর কিসের ভয়? বুকে বল রাখিস।

আজমলের রক্ত হিম হয়ে যায়। আজিজ এত সাহসের কথা বলে কী করে? ও কেমন করে এমন আলাদা হলো? ওর ছোট মামা জমির স্বপ্নে জীবনপাত করে, বর্গাচাষিদের মমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার রাজপ্রসাদ। কী নিষ্ঠুর ব্যবস্থা! জোতদার তার খুশিমতো বর্গাচাষিদের ব্যবহার করে। বিনা অজুহাতে এক বর্গাদারের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে অন্যের হাতে তুলে দেয়। জোতদারের সবরকম জুলুম ওরা নিরীহ জীবনের মতো সহ্য করে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী চাষিরা ধান কেটে জোতদারদের খোলানে তোলে। সেখানে ধান মাড়াই হয়, তারপর ভাগাভাগির পালা। চাষি বুঝতেই পারে না, কেমন করে ফাঁক তৈরি হয়, কেমন করে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় তার ন্যায্য অধিকার। জোতদারদের কর্মচারীদের হাতের কৌশলে নিরীহ চাষি বেশিরভাগ সময়ই বঞ্চিত হয় তাদের প্রাপ্য অর্ধেক থেকে, যা পায়, তা ভোগ করতে পারে না—তাদের অংশ থেকে মাড়াই খরচ, বরকান্দা খরচ এবং আরো নানা খরচের তালবাহানায় সেই ধানের কতক অংশ আত্মসাৎ করে জোতদাররা। নিরুপায় চাষি ওদের সামনে প্রতিবাদ করার সাহস নেই। হিসেবের মার-প্যাঁচের আরো একটি পদ্ধতি আছে। প্রত্যেক বর্গাচাষি জোতদারের কাছে ঋণের দায়ে আবদ্ধ। যখন ঘরে ধান ছিল না, প্রচণ্ড অভাবের সময় জোতদারের কাছে ধান কর্জ নিয়েছে। ঋণদানের শর্ত ছিল, ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে পরিমাণ ধান কর্জ নিয়েছে, তার দেড়গুণ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। একবারে বেশি পরিমাণ ধান ধার দেয়া হয় না। ফলে চাষিকে কিছুদিন পরপর জোতদারের কাছে হাত পাততে হয়। এতে হিসেবের ফাঁক-ফোকর তৈরি হয় সহজে। এভাবে মাসের পর মাস ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। ভাগাভাগির সময় এই ঋণ পরিশোধ করে কিছুই থাকে না। এই ঋণ আদায় বড় সহজ। কর্জের ধানের দেড়গুণ পরিমাণ ধান জোতদারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকেরা নিজেদের গোলায় তুলে রাখে। কখনো কখনো দেখা যায় ঋণের পরিমাণ এতই বেশি যে, চাষি খালি ডোলা নিয়ে ঘরে ফেরে। কিন্তু পেট তো মানে না। আবার জোতদারের কাছে যেতে হয়, ঋণও পায় এবং ঋণের দায়ে বাধাও পড়ে। বছরের পর বছর ধরে চলে এই নিয়ম। না শুধু বছর নয়, একজন বর্গাচাষি পুরুষানুক্রমে টেনে চলে এই ঋণের বোঝা। তার বাবা, পিতামহ, প্রপিতামহ টেনে এসেছে এই ঋণের বোঝা। চাষি তার ছেলেকেও এই ঋণের বোঝা দান করে দুঃখময় জীবনের জ্বালা জুড়োয়। এভাবেই বর্গাচাষি ঋণের শেকলে বাঁধা থাকে। জীবনভর মেহনত দিয়ে শোধ করে, কিন্তু শোধ কোনোদিন হয় না। জোতদারি ব্যবস্থায় এই অর্থনৈতিক শোষণের মধ্যে মানুষের মতো বেঁচে থাকার কোনো উপায় ছিল না ওদের। কিন্তু সহ্যেরও সীমা থাকে। সেই সীমা ভেঙে একদিন বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল। বিক্ষোভ রূপান্তরিত হলো আক্রোশে, আক্রোশ আন্দোলনে। স্লোগান উঠল, 'জান দিব তবু দান দিব না।' অর্থ-দাসের মতো ব্যবহৃত ভাগচাষিদের চোখে এখন আগুনের ঝলক। এ আগুন দাউ দাউ জ্বলবে জ্বালিয়ে দেবে।

ছেলেবেলা থেকে এই ব্যবস্থা দেখে বাবার বিরুদ্ধে ঘৃণা জমেছে আজিজের। যৌবনের শুরুতে রমেন মিত্রের সংস্পর্শ এবং শিক্ষা ওকে বয়স্ক করেছে। এখন ও এসব খুব ভালোভাবে বোঝে বলেই নিপীড়িত মানুষের পক্ষে সোচ্চার। ভোর রাতের দিকে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ে। কথা বলা শুরু করলে দুজনের কারোই সময়ের হিশেব থাকে না। শুধু গল্প নয়, কখনো জটিল বিষয় দুজনকে ভারাক্রান্ত করে, কখনো হাল্‌কা রসিকতায় খুলে যায় হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার। আজিজ মজার ছেলে। কাজ পেলে গম্ভীর, ডানে-বামে তাকায় না। অন্য সময় একদম উল্টো। আসর জমলে কাউকে কথা বলতে দেয় না, রসিকতায় ভরিয়ে রাখে সময়। আজমল এর উল্টো। বেশিরভাগ সময় চুপচাপ থাকে, অন্তর্গত ক্ষরণ হয়। যতটুকু না করে তার চেয়ে ভাবে বেশি। সে জন্য আজিজের চাইতে ওর বেদনা প্রবল। ঘুমের মধ্যে আজিজের অবচেতনে গড়ায় মাতলা সর্দার, সাঁওতাল এলাকা, পুকুরে ধারের মহুয়া গাছ এবং মাতলা সর্দারের খোলানে ধানের স্তূপ। আজমলের অবচেতনে গড়ায় গৌড়, রেশম এবং আছিয়া খাতুন। মনে হয়, ও যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিল ভাতিয়া পেরিয়ে চলে যাচ্ছে কোথাও। কোথায়, ও জানে না। পরক্ষণে আছিয়ার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। ওর বাবা এসে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আজমলের ঘুম ভেঙে যায়। আছিয়া খাতুন ওর মগজে গেঁথে থাকে। ওর মুখ তেতো, বুকে পিপাসা। ওর খুব খারাপ লাগে। ওর ইচ্ছে, সুন্দর স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ঘুম ভাঙুক। তাহলে দিন ভালো যায়, মন প্রফুল্ল থাকে। কিন্তু ঘুম ভাঙার মুহূর্তে খারাপ লাগলে ওর দিন খারাপ যায়। যত ঘটনাই ঘটুক, সারা দিনে আর মন ভালো যায় না। আজিজের ঘুম ভাঙেনি। আজমল নিঃশব্দে উঠে আড়চোখে তাকায়। রাতে কোথায় ছিল কে জানে? ও রাতে ঘরে ফিরে বাবার খোঁজ করেনি। ইয়াসিন বসনি নির্বিকার, ছেলের দিকে তাকায় না। আজমল পলুঘরে চলে আসে। আজ ও আজিজের সঙ্গে নাচোল যাবে। তাই বাশারকে সব বুঝিয়ে দেয়া দরকার। অবশ্য বাশার দক্ষ ছেলে। পলুপোকার প্রত্যেক স্তরের অবস্থা চমৎকার বোঝে। বাশারের কারণেই পলুঘরের কাজ ওর কখনো ক্লান্তিকর মনে হয় না। বারান্দায় বাশার চাকু দিয়ে তুঁত পাতা কুচি করছে। আজমল পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে। ডিম ফোটার পর বারো দিন গেছে। পলুর এখন রহা অবস্থা। এই অবস্থায় পোকা কুড়ি-পঁচিশ দিন থাকে এবং চারবার খোলস বদলায়। প্রত্যেকবার খোলস ছাড়ার সময় নিস্তেজ হয়ে যায়। প্রায় দেড় দিন খাওয়া বন্ধ রাখে। প্রথমবার খোলস বদলানোকে বলে মেটে কলপ, দ্বিতীয়বার দো-কলপ, তৃতীয়বার তে-কলপ এবং চতুর্থবার হলো শোধ কলপ। এভাবে খোলস বদলিয়ে গুটি-করার অবস্থায় গেলে হয় রোজের পলু। পোকা খাওয়া বন্ধ করে আবার খাওয়া শুরু করলে সে অবস্থাকে বলে চিয়ান। ও হিসেব করে দেখল, নাচোল থেকে ফিরে আসতে আসতে পলু চিয়ানে চলে যাবে। বাশার ঠিকমতো সামলাতে না পারলে পুরো চালাইন মাটি হবে। একবার ভাবে, যাবে না। কিন্তু পরক্ষণে মত বদলায়, না যাবেই। না গিয়ে থাকতে পারবে না। ও আবার বারান্দায় আসে। বাশারের সঙ্গে হাত লাগায়। তাড়াতাড়ি শেষ করলে সকালেই রওনা হতে পারবে। পলুর এই জীবনচক্র বড় অদ্ভুত লাগে ওর কাছে। এই চক্রের মধ্য দিয়ে ঘরে ফসল ওঠে। এজন্যই কি এ কাজ ভালো লাগে? কি জানি বুঝতে পারে না ও। তবে এই ফসরের জন্য তেভাগা আন্দোলন নেই। এই ফসল উৎপাদন যার যার, তার-তার। যার গুটি যত ভালো হবে, সে সবচেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দামি বসনি। চিরকাল ও দামি বসনি থাকতে চায়। সোনালি গুটি ওর শুধু ব্যবসা না, এটা ওর স্বপ্নও। এর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক।

বাশার আজ আমি নাচোল যাব।

নাচোল? ওর চোখ কপালে ওঠে। আপনি গেলে তো আর আসতে চান না।

আজমল মৃদু হাসে, আসতে মন চায় না যে।

পলুর যা অবস্থা—

আমি জানি, তুই সব পারবি। তোকে ভরসা করে আমি যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে পারি।

দোহাই লাগে ভাইজান, ঐ কাজটি করবেন না।

না রে পালাব না। তোর ভয় নেই।

আজমল হেসে ফেলে। বাশার কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়ায়।

পলুর ডালা পরিষ্কার করেছিস?

করিনি, করব।

পলুর এই অবস্থায় পাতা খুব সাবধানে কাটতে হয়। খুব কচি পাতা, তুঁত গাছের ডগার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাতাটি ছোট করে কেটে ছড়িয়ে দিতে হয়। এই পাতা কাটা এক ঝামেলা, বেশ সময় লাগে। খুব সাবধানে ছুরি দিয়ে চৌকো করে পাতাগুলো কাটতে হয়। বঁটি দিয়ে শাকের মতো কাটলে পাতা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। পলু ভালো করে খেতে পারে না। পাতা কাটা শেষ করে আজমল ডালা পরিষ্কার করার জন্য ব্যস্ত হয়। ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত সরু জাল পোকার ওপর বিছিয়ে দিয়ে পাতা ছড়িয়ে দেয়। পোকাগুলো পাতা খেতে খেতে জালের ওপর উঠে আসে। ও আর বাশার জালের দুই মাথা ধরে জাল এবং পাতাসহ পোকাগুলো অন্য ডালায় দিয়ে দেয়। পুরনো পাতার পড়ে থাকা অংশ এবং পলুর মল এভাবে পরিষ্কার হয়। এ কাজের নাম কাসার। শব্দটা শুনলেই ওর হাসি পায়। কে যে এমন একটি শব্দ বের করেছিল! মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। পলু যে কয়দিন রহাতে থাকে, তখন এই জামেলা নেই। নইলে রোজই একবার করে কাসার করতে হয়। এ সময় খুব সাবধানে থাকে ও। পোকা বেশি ছোট থাকলে তুঁতের ডালপালার সঙ্গে চলে যায়, তাতে বেশ কিছু নষ্ট হয়। এই সময়টায় ও নিজেই থাকে, বাশারকে পুরোপুরি ভরসা করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ডালা পরিষ্কার হলে বাশার ময়লাগুলো বাইরে নিয়ে যায়। ও জন্য ডালায় মনোযোগী হয়। এই ডালার পলুর ভিন্ন অবস্থা। আজিজ একে ঢোকে।

আমাকে রেখে তুই চলে এলি?

ভাবলাম রাতে তো ঘুমুতে পারিসনি, একটু ঘুমিয়ে নে। এই ফাঁকে আমি কাজ সেরে নিই।

আজিজ ডালার ওপর ঝুঁকে পড়ে।

এই ডালার পোকা দেখছি হলুদ হয়ে আসছে।

শুধু হলুদ? ভালো করে দেখ, মাথা মোটা হয়েছে, মুখ কালো ও চোখা।

হ্যাঁ, তাই তো।

আজিজ বিস্ময় প্রকাশ করে, এখন এগুলো আর খাবে না, না?

তুই শিখে ফেলেছিস দেখছি।

আজমল দ্রুত কাজ করে। এখন পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবে। তারপর ওর ছুটি। আজিজ ঘরে হেঁটে বেড়ায়, দাঁতন করে। দুজনের কারোই সকালের খাওয়া হয়নি। খিদে পেয়েছে। গরে বাতাস নেই, চারদিক বন্ধ। অল্প আলোয় মাথা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করে আজিজের। ও বাইরে এসে দাঁড়ায়। যতদূর চোখ যায়, কেবল তুঁতের জমি। হয় ঝোপ তুঁত, নয় বড় গাছ। ইয়াসিন বসনির সাম্রাজ্য। ও ভেবে দেখল, সবার বুকের মধ্যে একটা সাম্রাজ্য গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা থাকে। ওর বাবা একটা গড়েছে। মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়েছে, জুলুমে অত্যাচারে ছারখার করে দিচ্ছে বর্গাচাষিদের জীবনযাপন। অথচ আশ্চর্য মানুষ রমেন মিত্র। নিজের জমিতে তেভাগা চালু করেছে। মানুষকে সে মানুষ হিসেবে দেখে, কীট হিসেবে নয়। ও স্যান্ডেল বারান্দায় রেখে খালি পায়ে জমিতে নেমে আসে। ঘাসের ওপর হাঁটে, নরম ঘাস, শিশিরমাখা। তুঁতের জমির অঢেল সবুজ ওর দৃষ্টি মায়াময় করে দেয়। ওদের এলাকা এমন সবুজ নয়, কিছুটা রুক্ষ, ধূসর। জ্বলে-যাওয়া ঘাসের মাথা লাল হয়ে থাকে। গত মৌসুমে চাষিরা ক্ষেতের ফসল কাটতে চায়নি। ওদের এক যুক্তি, ফসল যখন ঘরেই ওঠে না, তখন কেট লাভ কি? কৃষকরা সব একজোট হয়ে গিয়েছিল। পরে রমেন মিত্রের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা ফয়সালা হয়। কিন্তু আর বেশিদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। মানুষ মারমুখী হয়ে উঠছে। ও তুঁতের ফল ছিঁড়ে পকেটে নেয়। তখন আজমল এসে ওর কাছে দাঁড়ায়। ও জানে, আজিজ এখানে এলেই মহানন্দার পাড়ে যাবে। সকালবেলা নদীর ধারে গেলে মন-মেজাজ সতেজ হয়। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ভোলাহাট থানার পেছনে আসে। এখানে একটা বিশাল কড়ুই গাছ আছে। জায়গাটা ওদের প্রিয়। দুজনে অনেক সময় এখানে কাটায়। নদীর বুক নীলাভ দেখায়। দূরের গাছপালা, মাঠ, দিগন্ত একাকার হয়ে আছে। সূর্যের উঠি উঠি অবস্থা। চারদিকে কোলাহল নেই, অসম্ভব নির্জনতায় প্রকৃতি নীরব। আজিজের মনে হয়, একটা পাখিও তো ডাকতে পারে? দুজনে নদীর ঢাল বেয়ে জলের কাছে এসে দাঁড়ায়। পা দিয়ে জল ছিটোতে ছিটোতে আজিজ বলে, কোনো কোনো জায়গা থাকে, যেখানে গেলে মনে হয়, কোনো সমস্যা নেই, দুঃখ নেই। এটা তেমন জায়গা।

আজমল জিজ্ঞেস করে, বাড়িঘর ছেড়ে তোর কেমন লাগছে?

খুব ভালো।

আমি তোর মতো হতে পারি না।

আজিজ হো হো করে হাসে।

ঘরে ফেরা দরকার আজমল। বেলা হয়ে গেছে, রওনা করতে হবে।

হ্যাঁ চল। গরম ভাত খেয়ে বেরুব।

ইয়াসিন বসনি প্রথমে আজমলের যাবার ব্যাপারে আপত্তি করে, কিন্তু আজিজের অনুরোধের মুখে আর কিছু বলে না। এই একরোখা ছেলেটাকে তার পছন্দ হয় না। কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আজমলের ছোট মা খাবার আয়োজন করেছে। গরম ভাতে ঘি, সঙ্গে ভুনা মাংস, আলু ভর্তা, থকথকে কলুইয়ের ডাল। একটু বেশিই খাওয়া হয়ে যায় আজিজের। ছোট মা ওকে প্রচুর দিয়েছে, জোর করেছে। না খেয়ে উপায় ছিল না। অবশ্য ভালোও লাগছিল। ওদের বাড়িতে এসব সাধাসাধি নেই। ছোট ছোট কাঁসার বাটিতে তরকারি বাড়া থাকে, আর গামলা ভরা ভাত। যে যখন ইচ্ছে খায়। ঐটুকু খেয়েই উঠে পড়তে হয়, আয়েশের কোনো জায়গা নেই। ও তর্জনীটা চেটে বলে, তোর ভাগ্যরে আজমল।

কেন?

তোকে খাবার জন্য সাধে। বাড়িতে আমাকে কেউ সাধে না। মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোতদারের বউ। হাজার ঝামেলায় বাধা। ছেলে বড় হয়ে গেছে, তাই আমার দিকে খেয়াল দেবার সময় নেই।

রাখ এসব, ভারি তো একটা কথা। তোকে এগুলো মানায় না।

তা আমি জানি। এ নিয়ে আমার দুঃখ নেই। হঠাৎ মনে এলো বললাম।

আজমল বুঝতে পারে আজিজের কথায় সুর কেটে গেছে। ও নির্বিকার ভাত চিবোয়। ও তো জানে, এতকিছুর পরও সংসারে ওর বাঁধন নেই। ওর মনে বৈরাগ্য আছে। ব্যাকুল উদাসীনতা বুকে নিয়ে ও এক গৃহী সন্ন্যাসী।

তখন খাড়া দুপুর নয়, দুপুরের অনেক বাকি। সূর্য আড়াআড়ি উঠছে। দুজনে গল্প করতে করতে বিল ভাতিয়া পেরুচ্ছে। মেঠো পথ, চারদিকে ফসল। এই বিল ঐশ্বর্যশালী, ফসল ঢেলে দেয়। কখনো নষ্ট হয় না। অন্তত আজমল ওর ছাব্বিশ বছরের জীবনে দেখেনি। ওরা কিছুদিন পর ফসল কাটা হবে। এদিকে ধানের জমি কম, যার যা আছে নিজেরাই চাষ করে। বেশিরভাগ লোকেরই রেশম ব্যবসায়, হয়তো আমবাগানের মালিক কিংবা ক্ষেতি-গৃহস্থ। আর বাকিরা দিন আনে দিন খায়। যেমন আয়, তেমন ভাত। কখনো নুন-মরিচ, কখনো শাক-সব্জি কিংবা কদাচিৎ মাছ-মাংস। এতেই সন্তুষ্ট ওরা। এর বাইরে কিছু চাইবার আছে বলে ভাবে না। বিলের সবুজ ধান আজিজের মগজে হাজার মৌমাছির গুঞ্জন ওঠায়। ও আস্তে আস্তে তন্নরায়ণের গল্প বলতে শুরু করে। ঠিক যেমন করে রমেন মিত্র ওদের বলেছিল, একদম তেমন করে। একটুও এদিক-ওদিক হয় না।

তন্নারায়ণের বাড়ি ছিল রংপুরের ডিমলা থানার খগাখড়াবাড়ি গ্রামে। এ গ্রামে ছিল কয়েক ঘর জোতদার। অর্থ এবং জনবল–দু দিক থেকেই তারা ছিল প্রতাপশালী। এরা ছাড়া গ্রামের বাকিরা সাধারণ চাষি। বেশিরভাগেরই বর্গা চাষ করে দিন যায়। রোদে পুড়ে ওদের গায়ের চামড়া কালো হয়ে যায়। সারা দিন পেট-পিঠ একসঙ্গে মিশে থাকে। কাজ করতে করতে ওরা নিজেদের কথা ভুলে যায়। ওরা বুঝতে পারে না, কেমন করে দিন কাটে। এমন সময় তেভাগা আন্দোলনে নতুন উদ্যম এসেছে। ধান কাটা শুরু হয়েছে। সমিতির নির্দেশ আছে, কেউ আদালাভাবে নিজের ধান কাটবে না। সংঘবদ্ধ হয়ে অনেকগুলো ক্ষেতের ধান স্বল্প সময়ে কেটে শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হবে। জোতদারদের বাধা দেয়ার কোনা সুযোগ দেয়া হবে না। নির্দেশমতো সবকিছু ঠিকঠাক চলে। জোতদাররা হামলা করতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রস্তুত ছিল ওরা। সিদ্ধান্ত হয়, ধান জোতদারদের খোলানে যাবে না, যাবে চাষির বাড়ি। সন্ধ্যা উতরে গেলে তন্নারায়ণের বাড়িতে হামলা করে জোতদাররা। পাঁচটা বন্দুক সঙ্গে নিয়ে ওরা দল বেঁধে আসে। ওরা খুব আকস্মিক দ্রুততায় পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং হঠাৎ করে গুলি চালাতে শুরু করে। গুলি চালানোর মতো কোনো পরিস্থিতি ছিল না। ওদের লক্ষ্য ছিল আতঙ্ক সৃষ্টি করে চাষিদের মনোবল ভেঙে দেয়া। তন্নারায়ণের বাড়িতে আক্রমণ করে ওরা। গুলি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যায় তন্নারায়ণ, তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা, চাষিদের প্রাণ। আজমল আজিজের কব্জি চেপে ধরে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, মরে গেল মানুষটা?

না মরেনি।

আজিজ দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

মরেনি? তবে যে—

তুই কিছু বুঝতে পারিস না। তন্নারায়ণ শহীদ হয়েছেন ঠিকই কিন্তু আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন। জানিস, তারপর কি হলো?

বল্ কি?

জোতদাররা ভেবেছিল, গুলির ভয়ে সবাই পালাবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। বন্দুকের শব্দে চারদিক থেকে দলে দলে লোক ছুটে আসতে শুরু করে। কোনো দ্বিধা নেই, ভয় নেই। হাতে লাঠি নিয়ে ওরা ছুটে আসে বন্দুকের সঙ্গে লড়াই করতে। অবস্থা বেগতিক দেখে ওরা বেপরোয়া গুলি ছোঁড়ে। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় বাচ্চাই মামুদ। আহত হয় অনেকে। কিন্তু কেউ পিছিয়ে আসে না, পিছু হটার শিক্ষা ওদের নেই। ওরা সমিতির স্বেচ্ছাসেবক। শত শত মানুষের জঙ্গি আক্রমণে তন্নারায়ণের বাড়ি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। শেষে জোতদাররা অন্ধকারে পালিয়ে বাঁচে। তন্নারায়ণ শান্তিতে শুয়ে থাকেন, এই মৃত্যুর মধ্যেও আনন্দ এই যে, তাঁর মৃত্যু বৃথা যায়নি। শত শত কৃষক-কর্মীর চোখে প্রতিহিংসার আগুন। তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যখন মিছিল করার তোড়জোড় চলছে, তখনই পুলিশ এসে জোর করে নিয়ে যায় শহীদের লাশ। পরদিন তন্নারায়ণের হত্যার প্রতিবাদে কৃষকদের মিছিল বের হয়, বিশাল মিছিল। এতবড় মিছিল এ অঞ্চলে আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি। এলাকার সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ এসে যোগ দেয় মিছিলে। গলা ফাটিয়ে স্লোগান হয় : আধির বদলে তেভাগা চাই, তন্নারায়ণের হত্যার প্রতিশোধ চাই, জোতদারি প্রথা ধ্বংস হোক।

জোতদাররা কিছু বলল না?

কি আবার বলবে? সেই দিনই জোতদারদের বাড়ির সামনে সভা হয়। মানুষ একজোট হলে তার সামনে একজনের সাহস কি টিকতে পারে?

ঠিক বলেছিস।

ধর আমার বাপের কথা। নাচোলের সব বর্গচাষি একজোট হয়ে চড়াও হলে নেংটি খুলে পালাবে।

আজমল বিব্রত হয়।

চুপ কর। কি বলছিস?

আজিজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমি তো চিনি আমার বাপকে। এরা পারে কেবল রস নিংড়ে নিতে। মুঠি খুলে কিছু দিতে পারে না।

দুজন চুপচাপ হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে পথ পেরিয়ে যায়। আজমলের মনে হয়, ও একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে পথ চলছে। এটা ঠিক শৈশবের গল্প শোনার নেশা নয়, এ হলো সত্যকে জানা। এই জানা পরতে পরতে গেঁথে যায় বুকের ভেতর। ও তো কখনো ভাবেনি যে জীবনে এমন এক উপলব্ধি হবে, যে উপলব্ধি ওকে চেনা সড়ক থেকে নামিয়ে অন্য পথে নিয়ে যাবে। যে পথের শেষ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে—যে লক্ষ্য ওর নিজের জীবনযাপনেও কার্যকর।

বুঝলি আজমল, তন্নারায়ণ মরেনি।

আজমলও এই একই কথা ভাবে। কোথায় কতদূরে কে শহীদ হয়েছে, তার কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে। উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে আরেক অঞ্চলের মানুষ। কেননা মরার সমস্যা এক এবং লক্ষ্য অর্জনের পথও এক।

আজিজ অনেকক্ষণ পর বলে, সেদিনের সভায় জঙ্গি মিছিল তন্নারায়ণের নামে শপথ নিয়েছিল। তাদের শত্রুদের তারা কোণঠাসা করার সিদ্ধান্ত নেয়। জেলেরা মাছ দেবে না, দুধওয়ালা দুধ দেবে না, তরকারিওয়ালা তরকারি দেবে না। আরো প্রস্তাব নেয় যে, জোতদারদের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভকে ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে। এসব জুলুম-অত্যাচারের অবসান ঘটলেই সার্থক হবে তন্নারায়ণের জীবন দান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল বলে, তাহলে তন্নারায়ণ এখন আর খগাখড়িবাড়ি বা ডেডামার থানা এলাকার মানুষ না?

না। তন্নারায়ণ আমাদের সবার। এজন্যই তো আমার বাপ এখন ক্ষ্যাপা কুত্তা। নাম শুনলেই ঘেউ ঘেউ করে চিল্লায়।

গল্প করতে করতে দুজনে কীভাবে যে পথ পেরিয়ে আসে, বুঝতে পারে না। সময় ওদের অনুকূলে থমকে আছে, ওরা ছুটলেই সময় ছুটবে।

রমেন মিত্রের বৈঠকখানা জমজমাট, ছেলে-বুড়ো অনেকে এসেছে। রমেন মিত্র একটানা কথা বলে যাচ্ছে। আজমলের মনে হয়, কোনো কোনো মানুষ থাকে, যার কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনা যায়। এমনকি চোখের পলক পড়ে না, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আজমলের বুকে-পিঠে ঘাম জমে। তেভাগার কথা ও আজিজের কাছে শুনছে, কিন্তু রমেনের বলা একদম অন্যরকম। ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, কথা বলে থেমে থেমে। কখনো নরম গলায়, কখনো উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে। শ্রোতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তিনি গলার কারুকাজ ভেঙেচুরে নেন। আজমল তাকিয়ে তাকিয়ে রমেনের কপালের ভাঁজ দেখে, ভুরুর ওঠানামা লক্ষ্য করে, দেখে, একবারও জিভ দিয়ে ঠোঁট না চেটে অনর্গল কথা বলা। কথা বলতে বলতে রমেন আজমলের দিকে তাকিয়ে থমকে যায়, তুমি কিছু ভাবছো বোধ হয়?

ভয়ে আজমলের মুখ শুকিয়ে যায়। কথা বলতে পারে না।

আমার কথা তোমার ভালো লাগছে না?

জোড়া জোড়া চোখ ওর মুখের ওপর। ও কিছু বলার আগেই ইলা ঢোকে। হাতে ডালাভরা মুড়ি ও গুড় এবং বড় একবাটি পায়েস। দরজার কাছে আজিজ ছিল। ও উঠে পায়েসের বাটি নিয়ে নেয়।

হাসতে হাসতে বলে, মানুষগুলোকে পেটে কিছু না দিয়ে কেবল শুকনো কথা শোনাচ্ছো?

তরুণরা হৈচৈ করে ওঠে, ঠিক বলেছেন রানীমা।

রমেন হেসে ওঠে, তোমার নীতিই এই। আগে খাওয়া, পরে কাজ।

ইলা মাথা নাড়ে, সঠিক নীতি। জানোই তো পেটে খেলে পিঠে সয়।

সবাই ডালা থেকে মুড়ি তুলে নিয়ে খায়। ইলা ছোট ছোট বাটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়েস তুলে দেয়। কালিজিরা চালের সঙ্গে ঘন দুধের পায়েস, চমৎকার ঘ্রাণ আসছে। আজমলের খিদে বেড়ে ওঠে। রমেন বেরিয়ে গেছে। বাইরে কারা এসেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলছে। ওদের খেতে দিয়ে ইলা ঘর-বাইর করে। কিছুটা চিন্তিত।

মাতলা যে কেউ আসছে না! সারা দিন লোকটি যে কোথায় কোথায় ঘোরে! কাজও করতে পারে অসুরের মতো।

ইলার ঠোঁটের কোণে প্রশ্রয়ের হাসি। মাদুরের এক কোণে বসে পড়ে আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

চিন্তা কিসের রানীমা?

না, চিন্তা নয়। জানস তো আগামীকালকের কথা? ফসল কাটার সময় আমাদের এবং জমিদারির অন্যান্য হিস্যার মালিকদের পাঁচশ বিঘা জমির ওপর লাল ঝাণ্ডা তুলে দেয়া হবে।

ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে, রানী মা জিন্দাবাদ!

ওরে থাম্, থাম্। তোরা কি শুরু করলি?

ওদের জয়ধ্বনি থামে না। রমেন ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

ছেলেদের খাইয়ে-দাইয়ে পক্ষে টেনে নিয়েছো দেখছি।

মোটেই না। ওরা সারা মাস উপোস করলেও আমার পক্ষে থাকবে।

তাহলে রণে ভঙ্গ দিলাম।

ঘরজুড়ে হাসির রোল বয়ে যায়। আজমলের মনে হয়, ঘর তো নয়, যেন হাজার মাইল জুড়ে বেড়ে-ওঠা বিল ভাতিয়া এবং সে মাটিতে অসংখ্য পাখির কিচিরমিচির। ওর বুক কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়। এমন মানুষই তো চাই, যারা মানুষের জীবনকে পাল্টে দেয়, সবাইকে নিয়ে সুখে থাকতে চায়, সবার দুঃখের ভাগী হয়। হঠাৎ ওর মধ্যে এক তীব্র উপলব্ধি হয়। ও মনে মনে বলে, এমন মানুষের জন্য মরেও সুখ।

বাইরে মাতলা সর্দারের গলা শোনা যায়।

রানী মা?

মাতলা এসেছে।

ইলা দ্রুত উঠে পড়ে। ওর সঙ্গে এসেছে অন্য এলাকার কর্মীরা। এখন ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হবে। ছেলেরা বেরিয়ে পড়ে। যে যার পথে নেমে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজ আজমলকে নিয়ে হরেকের বাড়িতে আসে। আগামীকালের সভা নিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। হরেকের বাবা-মা বর্গা চাষি। বয়সের তুলনায় স্বাস্থ্য ভালো। প্রচুর খাটতে পারে। হরেক বাবা মার এক ছেলে। আরো ভাই-বোন হয়েছিল, বাঁচেনি। ওদের দেখে হরেকের বাবা এগিয়ে আসে। মহুয়া গাছের নিচে যে জোড়া শুয়োর নিয়ে ব্যস্ত ছিল, হরেকের মা উঠোনে গুগ্‌লি খুলছে। ছোট ছোট শামুক সেদ্ধ করে তারপর ভেতরের মাংসটুকু বের করে রান্না করে ওরা। প্রচুর ঝামেলার কাজ, কিন্তু চমৎকার সুস্বাদু খাবার এটা। সব সাঁওতালই ফাঁক পেলে গুগ্‌লি খুঁজে আনে। ঝুড়ি বোঝাই করে রাখে। হরেকের মা গালভাঙা হাসিতে আজিজকে স্বাগত জানায়। মাথা নেড়ে বরে, হরেক বাড়িতে নেই, একটু আগে বেরিয়েছে। চমৎকার নিকনো বাড়িঘর। কোথাও এক ফোঁটা ময়লা নেই। হরেকের মা ওদের বসার জন্য দুটো পিঁড়ি পেতে দেয়। সেদ্ধ গুগ্‌লি থেকে ভাঁপা বের করছে। দুজন তাকিয়ে থাকে। বুড়ি অকারণে হাসে বুঝতে পারে যে, ওরা অবাক হয়েছে। আজমল আজিজকে কনুই দিয়ে গুঁতো দেয় এগুলো খেতে পারবি?

আজিজ অবলীলায় মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

সত্যি পারবি?

একশোবার পারব। আমার কিছু যায় আসে না। এদের এখানে আমি শুয়োর খেয়েছি না? দারুণ স্বাদ।

আজমল দাঁত কিড়মিড় করে, তুই একটা ডাকাত, যম ডাকাত।

আজিজ মৃদু হাসে। ওর কোনো সংস্কার নেই। আজমলের পায়ে এখনো শেকল। আজিজ যা করতে পারে, ও তা ভাবতেও পারে না। হরেকের বাবা শুয়োর দুটো বেঁধে ফিরে এসেছে। উঠোনের কোণায় রাখা মাটির চাঁড়ি থেকে পানি নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিচ্ছে। বুড়োর চোয়াল গড়িয়ে জল নামছে। চুলের ডগায় জলের ফোঁটা টলটল করছে।

কাকা যাই।

বুড়ো মাথা নাড়ে। ওদের পিছে পিছে মহুয়া গাছ পর্যন্ত আসে। বুড়িও এসেছে। ওরা মেঠো পথে নেমে যায়। একবার পেছন ফিরে দেখে, দুজন মানুষ স্থির মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাথার ওপর মহুয়া গাছের ছায়া, ওদের পেছনে সুখ-দুখের ঘরগেরস্থি। ওরা সরল প্রাণ মানুষ, অধিকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাবিতে সোচ্চার। এমন মানুষ ক্ষেপে গেলে ক্ষ্যাপা ষাঁড় হয়, ভেঙে তছনছ করে, পেছনে চায় না। মাতলা সর্দার এদের জোয়ার বানিয়েছে, দুকূল প্লাবিত হবে। আজিজ ঘাড় ঘুরিয়ে নেয়। ওদের সুঠাম শরীর, বিদ্রোহী ভঙ্গি, ভাবলেশহীন কালো কঠিন চেহারা আজিজের চোখে লেগে থাকে। আজমলের মনে হয়, এমন মানুষ দেখা ওর জীবনের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ও কি কোনোদিন এদের ভুলতে পারবে?

আজ উৎসব। মহা-সমারোহে ফসল কাটা শুরু হয়েছে। এই উৎসবের কোনো সাম্প্রদায়িক ভিত্তি নেই। হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল—সবাই এসেছে। এই উৎসবের হৃদয় ফসল, শরীর অধিকারের প্রতিষ্ঠা। সবাই ব্যস্ত। লালপেড়ে শাদা শাড়ি পরেছে ইলা। কপালে জলজল করছে সিঁদুরে ফোঁটা। যখন ও কৃষকদের বাড়ি বাড়ি যায়, কখনো ধূলি-ধূসরিত খালি পায়ে, তেলহীন রুক্ষ চুল বাতাসে ওড়ে, তখন কোমরে প্যাঁচানো থাকে শাড়ি। যখন ওদেরকে আন্দোলনের কথা বোঝায়, তখন উদ্দীপিত থাকে দৃষ্টি, কঠিন হয়ে ওঠে চোয়াল। এখন কিছুটা ক্লান্ত, কিছুটা উদ্বিগ্ন। ইলা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ধান-কাটার কাজ নির্বিঘ্নে এগিয়ে যাচ্ছে। মাতলা খুশিতে গদগদ। অন্যান্য জোতদার বাধা দিতে আসেনি। ওরা নীরবে দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। রমেন মিত্র মাতলাকে জিজ্ঞেস করে কেমন লাগছে মাতলা?

ও খুশিতে মাথা দোলায়। তারপর ছুটে যায় ইলার কাছে।

রানী মা?

আজ আমাদের পরব না রে মাতলা?

মাতলা খুশি হয়ে প্রণাম করে। রানীমা ওদের জন্য কাজ করছে। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে সবার ঘরে ঘরে গিয়েছে। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হয়নি, শরীর পুড়ে কালো হয়েছে, তবু নিজের দিকে তাকায়নি। আজ তো পরবের দিন হবেই।

ধান-কাটা শেষ হতে হতে বেলা পড়ে যায়। বিদায়ী সূর্যের আলোয় ন্যাড়া ক্ষেত ঝলমল করছে। সেই ঝল্‌মলে পাঁচশ বিঘা জমির ওপর লাল ঝাণ্ডা তুলে দেয়া হয়। রমেন ও ইলা দুজনেই বক্তৃতা করে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আগামীতে অন্যান্য জোতদারের জমিতে তে-ভাগা কায়েম করা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরুর গাড়িতে করে ধান চলে যায় মাতলার বাড়িতে। সবাই হৈ-হৈ করতে করতে সেখানে উপস্থিত হয়।

সারা রাত গান-বাজনা হয়। খোলা প্রান্তরে বাতাস-নির্ভর হয়ে সে কণ্ঠ চলে যায় চারদিকে। ঢোল, হাঁড়িয়া এবং ছাগলের ঝলসানো মাংস দিয়ে সাঁওতালরা নাচে, উদ্দাম হয়ে ওঠে ওরা।

অনেক রাতে ইলার ঘুম ভেঙে যায়। রমেন তখনো জেগে।

তুমি এখনো জেগে আছো?

ইলার ঘুমজড়ানো কণ্ঠে মাদকতা।

সাফল্যের আনন্দে আমার ঘুম আসছে না ইলা। সবচেয়ে বড় আনন্দ যে, এখানকার লোকজনদের তুমি আপন করে নিতে পেরেছ। ওরা তোমার ডাকে জীবন দিয়েও সাড়া দেয়। ওদের রানীমা ডাক যথার্থই হয়েছে।

ইলার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। ঘুমিয়ে গেলেও এই হাসি ওর মুখে লেগে থাকে।

দুদিন পর মহীপুরে জমিদারদের জমি থেকে বর্গাচাষিরা ওদের প্রাপ্য ফসল আদায় করে। ওরা বন্দুক দেখিয়ে কৃষকদের নিরস্ত করতে চেয়েছিল। জমিদাররা তেভাগা মানতে অস্বীকার করছে। কিন্তু বর্গাচাষিরা সব একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াচ্ছে বলে জোতদার-জমিদারদের সুবিধে হচ্ছে না। চাষিরা ধান খোলানে তুলে ভূস্বামীকে খবর দেয়। ভূস্বামী উপস্থিত হলে তার সামনেই ভাগ হয়। উপস্থিত না হলে ধান তিন ভাগ করে দুই ভাগ কৃষকের জন্য রেখে এক ভাগ গরুর গাড়িতে করে পাঠিয়ে দেয়া হয় মালিকের বাড়ি।

জোতদাররা ক্ষ্যাপা কুকুর হয়ে উঠেছে। উপায় না দেখে ওরা 'ধান লুট' বলে থানায় এজাহার দিচ্ছে। অনেকের বিরুদ্ধে মামলা দাঁড় করিয়েছে। 'ধান লুটে'র আসামি। দেখে-শুনে মাতলা হা-হা হাসে। বলে, জীবনভর ধান লুটের আসামি হব। তবু যদি নিজের হিস্যা বুঝে পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫

ইলা মা হবে।

প্রাথমিক উত্তেজনা এবং বিস্ময় কেটে যাবার পর দুজন যখন আত্মস্থ হয়, তখন গভীর আনন্দে ইলাকে বুকে টেনে নেয় রমেন। নিজের শারীরিক পরিবর্তন ইলাকে অভিভূত করে। নতুন ভুবনে প্রবেশের শুভ উদ্বোধনে ও কিছুটা দিশেহারা এবং বিমূঢ়। মৃদু হেসে বলে, কেমন করে ঘাপটি মেরে শরীরের ভেতর বাড়ছে। দস্যু একটা। রমেন হো-হো করে হাসে, আমি চাই মেয়ে। ঠিক তোমার মতো। আমাদের বার্ধক্যে আমি তোমাকে ওর মধ্যে নতুন করে দেখব।

তাহলে তো এক-ই কথা আমারও। আমি চাই ছেলে, ঠিক তোমার মতো।

আমরা এভাবে বারবার নিজেদের খুঁজে নেব।

খুঁজব কেন? আবিষ্কার করব। আমরা তো কখনো হারিয়ে যাব না।

ঠিক বলেছো ইলা। মা এ খবর শুনলে পাগল হয়ে যাবে। মার কত শখ! কতদিন সংসারে শিশু নেই।

কিন্তু পুলিশ যা শুরু করেছে, মনে হয়, এখানে বেশিদিন থাকা যাবে না।

চিন্তিত কণ্ঠে রমেন বলে, আমিও তাই ভাবছি। ওয়াজেদ মোড়লকে গ্রেফতার করেছে। আজিজ পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ করে দুজনে চুপ করে যায়। ওরা জানে, নিজের পরিশ্রমের ফসল অন্যের গোলায় উঠতে না দেয়ার প্রতিবাদ মুসলিম লীগ সরকার সুনজরে দেখছে না। কম্যুনিস্ট পার্টি যে এসব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে সরকার তা জানে। তাই কম্যুনিস্টদের গ্রেফতার করে বিনাবিচারে আটক করার তৎপরতা ক্রমাগত বাড়ছে। এদিকে পার্টি সংগঠন থেকে নির্দিষ্ট কর্মসূচি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সাত আড়ি জিন ও ফসলের তেভাগার দাবিতে আন্দোলন হবে। এতদিন বিশ আড়ি ধান কাটা ও মাড়ানোর জন্য বর্গাচাষি পেত তিন আড়ি ধান। উপরন্তু জোতদাররা ফসল উৎপাদনের কোনো খরচই বহন করত না। এই এলাকার বড় বড় জোতের অধিকারীরা উৎপাদনের কোনো কিছুতেই অংশ না নিয়ে পেত হাজার হাজার মণ ধান। সুতরাং কম্যুনিস্ট পার্টির সংগঠিত এই দাবি কৃষকদের মধ্যে প্রবল সাড়া জাগিয়েছে। একে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে। রমেন এসব ভাবতে ভাবতে ইলাকে বলে, আমাদেরও আত্মগোপনে গিয়ে কাজ করতে হবে। এ সময়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়া চলবে না। আমিও তাই ভাবছি। আমি ঠিক করেছি, সাঁওতালদের মধ্যে গিয়েই থাকব।

কার কাছে?

সুচন্দ আর সুখিয়ার ওখানে।

রমেন মৃদু হাসে, আন্দোলন নিয়ে তুমি অনেক বেশি ভাবো। ওরা তোমাকে পেলে খুশি হবে।

আমি জানি।

ইলা গভীর প্রত্যয়ে মাথা নাড়ে। যখনই ওদের গ্রামে গেছে, ওরা ইলাকে কাছে টেনে নিয়েছে। ওরা ওর ওপর নির্ভর করে, ওকে বিশ্বাস করে। ওদের খুব কাছের মানুষ ভাবে।

কিন্তু মাকে বোঝাতে খুব বেগ পেতে হয় রমেনকে। সন্তানের খবরে আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা দুঃসংবাদ তাকে বিমূঢ় করে দেয়।

বৌমার এই অবস্থায় সাঁওতালদের মধ্যে গিয়ে থাকবে?

এখনো তো দেরি আছে মা।

জমিদার-গিন্নি কথা বলে না। রাগে কালো হয়ে যায় মুখ।

ভেবে দেখো মা, থানা-হাজতে থাকার চাইতে লুকিয়ে থাকা ভালো কি না?

তুই যা ভালো বুঝিস, কর গিয়ে। আমাকে আর জিজ্ঞেস করা কেন?

মা তুমি মাথা ঠাণ্ডা কর।

আমার মাথা তোদের মতো গরম নয়।

জমিদার-গিন্নি রাগে অন্যত্র উঠে চলে যায়। ইলার সঙ্গে কথা বন্ধ। কিন্তু হলে কি হবে, পরিস্থিতি অন্যরকম। পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার সুবিধের জন্যই পার্টির সদস্যদের আত্মগোপন করে থাকতে হবে। যেদিন রাজশাহী থেকে সীতাংশু মৈত্র খবর পাঠালেন, সেদিন আর কিছু করার ছিল না। ইলাকে যেতেই হবে। ও শাশুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতে টুকিটাকি জিনিস এবং কয়েকটি কাপড় ভরা ব্যাগ। রমেনের হাতে লণ্ঠন। জমিদার-গিন্নির ঘরে হ্যাজাক জ্বলছে। পোকা উড়ছে চারপাশে। ইলা শাশুড়িকে প্রণাম করে। রমেন ঠাণ্ডা গলায় বলে, মা, আর উপায় নেই। যেতেই হবে।

জমিদার-গিন্নি মুখ না তুলেই বলে, যাও। তবে প্রসবের আগে বৌমাকে নিয়ে আমি কলকাতা যেতে চাই। সে ব্যবস্থার যেন এদিক-ওদিক না হয়।

তাই হবে মা।

দুজন বেরিয়ে আসে। খনিকটা পথ এগিয়ে দেয় ভুপেন আর কালীপদ। ঘুরঘুট্টি রাত। রমেনের হাতের লণ্ঠন এক অন্ধকারে পর্যাপ্ত আলো দেয় না। বটগাছ পেরিয়ে গেলে রমেন ওদের ফিরে যেতে বলে। আরো কিছুদূর এগুলে মাঠের মাঝখানে অপেক্ষা করছে হরেকের সঙ্গে আরো অনেকে। ওদের কোনো অসুবিধে হবে না।

কিছুদিন পরই সীমান্ত পেরিয়ে রমেন কলকাতা যায়। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দেবে। সাঁওতালদের মধ্যে থেকে ইলার কাজের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হয়। ও প্রতিদিনই গ্রামে ঘোরে, প্রতিটি ঘরে যায়, সবার সঙ্গে কথা বলে। এমন অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে খোঁজ-খবর নেয় যে, মনে হয়, ওদের প্রিয়জন এসেছে। ওকে পেয়ে সুখিয়া একদম বদলে যায়। বলে, জিঁয়ো ঠাকুরের আশীর্বাদে তুমি আমাদের ঘরে এসেছো রানীমা।

কিন্তু আমি তো বেশি দিন থাকতে পারব না রে?

কেন রানীমা?

এক জায়গায় বেশি দিন থাকা ঠিক হবে না যে।

ম্লান হয়ে যায় সুখিয়ার মুখ। ও রানীমার জন্য ঝিনুক রান্না করে। টকটকে লাল হয়ে থাকে ঝিনুকের মাংস। কিন্তু ইলা কিছু খেতে পারে না। শরীর খারাপ হচ্ছে, খাবার দেখলে বমি আসে। সুখিয়া বুঝে যায় সব। রাতে বিছানায় সুচন্দকে জড়িয়ে ধরে, জানো, রানীমা মা হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা হবে?

বিছানায় উঠে বসে সুচন্দ। ওর বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। অকস্মাৎ সুখিয়া ওকে প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে, ঠাকুর জিঁয়ো আমাদের একটা সন্তান দেয় না। সুচন্দ সুখিয়ার রুক্ষ চুলে মুখ ঘষে। হাতের তালুতে চোখের জল মুছিয়ে দেয়, ভাবে, সন্তান হলে সুখিয়া হয়তো দিনমণির মতো হতো, হয়তো ওদের জীবন অন্যরকম হতে পারত।

সুখিয়া, সুখিয়া?

সুচন্দ ফিসফিসিয়ে বলে। ওর বুকের ভেতর দিনমণি। ওর আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। দিনমণিকে পাবে না বলেই কি এমন তীব্র আকর্ষণ দিনমণির জন্য? ও ঠিক করে, কাল থেকে রানীমাকে দিনমণির ঘরে রাখবে। দিনমণিতো মা হয়েছে, ও জানবে, কিভাবে সন্তানবতী মায়ের যত্ন নিতে হয়।

ঘুমো সুখিয়া।

সুচন্দ আস্তে করে বলে। সুখিয়ার কান্না নেই। কিন্তু বুকের ভেতর থেকে বড় শ্বাস উঠে আসে। তারপর থেমে থেমে বলে, কাল লাল পিঁপড়ে ধরে এনো। এ সময় রানীমার লাল পিঁপড়ে খেতে ভালোলাগবে।

ওরা এসব খায় না। আমি ছাগলের মাংস আনব, নয়তো একটা যদি বন মোরগ পাই, তেল-মশলা দিয়ে তুই ভালো করে রেঁধে দিবি সুখিয়া।

কিন্তু রানীমা যে কিছুই খেতে পারে না। সব তো বমি হয়ে যায়। ঘন দুধের সর রানীমা খুব ভালোবাসে। কাল সকালে দিলাম তো খেতেই পারল না।

আহারে! এমন হলে কি শরীর ঠিক থাকবে? তার ওপর সারা দিনই তো ঘোরাঘুরি করে।

রানীমার কথা বলতে বলতে ওরা ঘুমিয়ে যায়।

সকালে কাজে যাবার পথে দিনমণিকে রানীমার খবর দেয় সুচন্দ।

দিনমণির চোখে কৌতুক, মা হবে? কি মজা?

মা হওয়া খুব সুখের, না দিনমণি?

হ্যাঁ, খুব।

খুশিতে চক্‌চক্ করে ওর চোখ। সুচন্দ মুগ্ধ হয়ে দেখে। খুব অল্প আনন্দেই দিনমণির চেহারা একদম বদলে যায়। এই মুহূর্তে বিষণ্ণতা নেই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসুস্থ স্বামীর ম্লান মুখ নেই, দিনমণি ছাড়া পেয়েছে এইসব থেকে।

চলো কোথাও চলে যাই?

সুচন্দ ওর হাত চেপে ধরে।

হেসে গড়িয়ে পড়ে ও, কোথায়? পাগল হলে।

সুচন্দ ওর হাত ছেড়ে দেয়, একদিন সত্যি পাগল হব।

ঠাকুর জিঁয়ো তোমার ভালো করুক।

দিনমণি দ্রুত হেঁটে খানিকটা এগিয়ে যায়। কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে। সুচন্দ এমন করে বাঁধন ছেঁড়ার ডাক দেয় যে, সুচন্দকে ওর ভয় হয়।

দিনমণি একটি কথা বল যে এ সময় রানীমাকে কি খেতে দেব?

ও হেসে মুখ ফেরায়, টক দিও। তেঁতুল আর চালতা। টুটু মাঝির বাগানে বরই আছে, পেড়ে নিয়ে যেও।

শুধু টক, সুচন্দ একদম হতাশ হয়ে যায়। ও কতকিছু ভালো ভালো খাবারের চিন্তা করেছে। দিনমণির ওপর ওর খুব অভিমান হয়। মনে হয়, দিনমণি ওর সঙ্গে তামাশা করছে। কিন্তু কাজ শেষে ফেরার পথে দিনমণির হাসিটুকু ওর বুকে বাজতে থাকে। ও দোকান থেকে তেঁতুল সংগ্রহ করে এবং বরই পেড়ে নিয়ে আসে।

ইলার সামনে এগুলো ঢেলে ধরতেই ও তো অবাক, ওমা, দেখ সুচন্দর কাণ্ড? এসব আনতে কে বলল তোকে?

সুচন্দ মৃদু হাসে। কথা বলে না।

মজাই হবে। সুখিয়া নুন-মরিচ দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে আয়। দেখেই জিভে জল এসে গেছে।

ইলা বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে আয়েশ করে বরই খায়। ওদিকে রান্নাঘরে সুচন্দকে ভাত দিতে দিতে সুখিয়া চোখ পাকায়, তুমি কি করে জানলে যে রানীমা এসব খাবে?

বাহ্ ছোটবেলায় শুনেছি যে।

সুখিয়া নীরবে মেনে নেয়। এই লোকটার ওপর এখন আর ও রাগ করতে পারে না। ভাত খেতে খেতে দিনমণির ওপর আস্থা বেড়ে যায় সুচন্দর। ওর জন্যই তো আজ ও রানীমাকে খুশি করতে পেরেছে।

একটু পর হরেক একজোড়া কবুতর নিয়ে আসে।

মুখ পুড়ে যায় এমন ঝাল দিয়ে রেঁধে দিও বৌদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা তোরা সবাই মিলে আমার পিছে লেগেছিস কেন বলত?

এটুকুও করতে দেবে না আমাদের?

তোরা একেকজন একটা করে খাবার-দাবার পাঠাচ্ছিস। আমি কি রাক্ষস?

ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। ওদের কালো মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইলার বুক কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়। এদের জন্য কিছু করাটা জীবনের বিনিময়েও অনিবার্য হয়ে ওঠে। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যা পায়, তা দিয়ে খুদ-কুঁড়ো খায়। এই শোষণ ওরা আর সইবে না। এসব সরলপ্রাণ মানুষ একরোখা, তেজী—ওরা যাকে নির্ভর করে, তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ওদের ভালোবাসায় খাদ নেই।

রামচন্দ্রপুর হাটে এক বড় জনসভায় মে দিবস পালিত হয়। জনসমাবেশ দেখে ঘাবড়ে যায় স্থানীয় জোতদাররা। এমনিতেই ধান ভাগ করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জমিদার, জোতদার, ইজারাদার, মহাজনরা কোণঠাসা হয়ে আছে। তার ওপর এদের ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন ওদের আতঙ্কিত করে তোলে। সভার পরদিন গ্রেফতার করা হয় রাজশাহী জেলার কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা সীতাংশু মৈত্রকে। ঘেরাও করা হয় রমেন মিত্রের বাড়ি। কাউকে না পেয়ে রমেন মিত্রের মার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে চলে যায় পুলিশ। তখন রমেন আর ইলা ঘাসুয়ার জীবন দাসের বাড়িতে গোল হয়ে বসে অনেকের সঙ্গে কলকাতার গল্প করে। বিশেষ করে পার্টি কংগ্রেসের অভিজ্ঞতার কথা সবাই শুনতে চায়। রমেনও বলে আনন্দ পায়, হাজার বার বলেও ক্লান্ত হয় না। সবাই চলে গেলে রাতে রমেন ইলাকে বলে, জানো পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রণদীভে লাইন অনুযায়ী উপমহাদেশে বিপ্লব আসন্ন। আমাদের উচিত এর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করা। এ ব্যাপারে আমরা অনেকটা এগিয়েছি, কি বলো? লোকে কেমন আগ্রহ নিয়ে শোনে, দেখো না? আমার মনে হয়, ওরা প্রস্তুত।

ইলা মাথা নাড়ে। পিঠের নিচে বালিশ দিয়ে হেলান দিয়ে বসে। শরীর ভারী হয়ে গেছে। প্রসবের মাত্র দুমাস বাকি। ঘরে হারিকেন জ্বলছে। বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক। রমেন স্বপ্নের মতো কথা বলে যায়, সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার আর দেরি নাই। আমরা সফল হবই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুদিন ধরে একটা জিনিস আমাকে ভাবাচ্ছে?

কি?

ইলার কথায় রমেন উৎসুক হয়ে তাকায়।

উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলন যখন প্রায় শেষ, তখন আমরা শুরু করেছি। কতটা সফল হব?

সফল আমরা হবই। সাঁওতালরা এ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও, সব সম্প্রদায়ের লোক কিন্তু যোগ দিয়েছে। এত গণসমর্থনের পরও ব্যর্থ হলে তা হবে আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। না ইলা, ব্যর্থতার কথা আমি ভাবি না।

আমিও ভাবি না। মাঝে মাঝে নানা ধরনের ভাবনা মনে আসে, এই যা।

রাত হয়েছে, তুমি শুয়ে পড়ো।

আমাদের তো কলকাতা যাবার সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, সবই ঠিক। রামচন্দ্রপুর হাটের উত্তেজনা কমলে মাকে নিয়ে আসব। তোমার কোনো শারীরিক অসুবিধে নেই তো?

না, আমি ঠিক আছি। ভালোয় ভালোয় সবকিছু হয়ে গেলেই রক্ষা।

ইলা গায়ে কাঁথা টেনে শুয়ে পড়ে। বালিশে ছড়িয়ে যায় একরাশ চুল। জীবনের বৌ সন্ধ্যাবেলা যত্ন করে তেল ঘষে চুল আঁচড়ে দিয়েছিল। জবাকুসুমের মিষ্টি গন্ধ আসছে চুল থেকে। ওর দুচোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। পেটের ভেতর নড়ে ওঠে সন্তান। বুক কেমন করে ওর। ভাবতে অবাক লাগে যে, কেমন একটা সজীব পদার্থ সারাক্ষণই ওর ভেতরে নড়েচড়ে নিজের কথা বলছে। কবে ওর শব্দ শুনব? হারিকেনে তেল না থাকায় ওটা দপদপিয়ে নিভে যায়। ইলা হেসে ওঠে।

হাসছো যে?

ভাবছি, কবে ওর শব্দ শুনব? কবে ও দুহাত বাড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরবে?

পাগল!

অন্ধকারে রমেন ওকে আদর করে। বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাক বাড়ে। গ্রামে পুলিশের নির্যাতন বেড়েছে। বিভিন্নভাবে মানুষকে উত্যক্ত করছে। কি হয়, বলা যায় না। এক সময় ধৈর্যের বাঁধ তো ভেঙেই যাবে! মা কেমন আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমুবার আগ পর্যন্ত মা ওকে জড়িয়ে রাখে। ও ঘুমিয়ে পড়ে।

কিছুদিন পর শাশুড়ির সঙ্গে সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতা চলে যায় ইলা। কতদিন পর বাবার বাড়ির পরিবেশ ওকে স্বস্তি দেয়। কিন্তু যতটা উৎফুল্ল হবার কথা, সে পরিমাণ আনন্দ পায় না। মন পড়ে থাকে পেছনের বিশাল কর্মক্ষেত্রে। যতই দিন গড়ায়, ততই নিজেকে বন্দী মনে হয়—ছুটে যেতে ইচ্ছে করে চণ্ডীপুরে, যেখানে নিজের বাড়িকে ক্যাম্প বানিয়েছে। যার খোলানে হাজার হাজার মণ ধান এনে রাখা হয়, যেগুলো তেভাগার হিসেবে ভাগ হয়। এই কর্ম-উদ্দীপনার মধ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ও মরমে পোড়ে। মা জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে তোর?

ও মাথা নাড়ে, কিছু না মা। কেবল গাঁয়ের কথা মনে হয়। ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

তুই পারিসও বাপু। এখন ছেলেপুলে নিয়ে একটু সংসারে গুছিয়ে বস।

মা চলে গেলে ইলা ম্লান হাসে, মা তুমি বুঝবে না। এর মধ্যে রমেনের চিঠি আর মাতলার দেয়া এক খাঁচা বাদিহাঁস আর কবুতর নিয়ে লোক এসেছে। রমেন লিখেছে, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করো। শরীর যেন খারাপ না হয়। আমার কথা ভেবো না। ফুটফুটে মেয়ে চাই। কবে ফিরবে, সে আশায় রইলাম।

এতসব ভালোবাসা বুকে নিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফুটফুটে ছেলের জন্ম দেয় ইলা। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে, তুমি হেরে গেলে, জিত আমারই। আমি চাই ও তোমার মতো হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬

লঞ্চটা দিনে একবারই ভোলাহাট-রোহনপুর যাতায়াত করে। সকালে যায়, বিকেলে ফিরে আসে। সময়টা কুতুবের জানা। ও যেখানেই থাকুক, লঞ্চ আসা-যাওয়ার সময় বজরার টেকে এসে হাজির হয়। বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ওঠানামা দেখে। লোকজনের আসা-যাওয়া দেখতে ওর ভালো লাগে। কখনো কাউকে জোহরার মতো লাগে। অবিকল সেই ভুরু, বাঁকানো চোখের সীমান্তে দিগন্তরেখা যেন আকাশের মতো নুয়ে থাকে। কাউকে না পেলে জীবনটা এমন হয় কেন, কেন যে হঠাৎ করে সবকিছু শূন্য হয়ে যায়।

লঞ্চ থেকে নেমে যাচ্ছে লোকজন। আপাতত এটা আর ছাড়বে না। ও খালি লঞ্চে উঠে আসে। সারেং সোনা মিয়া ভালো মানুষ। ওকে দেখে হাসে।

কেমন আছো?

ভালো।

কুতুব ডেকের রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়ায়। হু-হু বাতাসে ওর মাথার চুল ওড়ে। ঢাক গিলতে গলায় বাঁধে। কিসের ব্যথা? মনের, নাকি শরীরের? ইদানীং এমনই হয়। সোনা মিয়া ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। কিছুদিন ধরে কুতুবকে কেন্দ্র করে ওর মনের মধ্যে একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। ওর ভাই হাজির আলি ক্ষেতমজুর। বসতবাড়িটুকু ছাড়া আর কিছু নেই। সাত মেয়ে ওর। বেচারা বড় কষ্টে আছে। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, এখনো চারজন বাকি। কুতুবের সঙ্গে কাজলের বিয়ে দিতে পারলে একটা চিন্তার লাঘব হয়। কুতুবকে ওর পছন্দ হয়। বিয়ে করলে এখনকার মতো ভবঘুরে থাকবে না, নিশ্চয়ই সংসারী হবে। এটা সোনা মিয়ার ধারণা। ও আমতা আমতা করে সোজাসুজি কথাটা পাড়ে, তুমি একটা বিয়ে করো না কেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুতুব?

কুতুব ঘাড় ঘুরিয়ে সোনা মিয়ার দিকে তাকায়। ভীষণ সরল আর নিষ্পাপ মনে হয় ওকে। আজকের লঞ্চে কোনো মেয়ে আসেনি। আজ সারা দিন কাউকে ওর জোহরার মতো মনে হয়নি।

কি, কথা বলছো না যে? কথাটা পছন্দ হলো না বুঝি?

বিয়ে? খাওয়াব কি?

সোনা মিয়া হো-হো করে হাসে।

পুরুষ মানুষের আবার কাজের অভাব?

থাকবে কোথায়? ঘরে পানি পড়ে।

আমি তোমার ঘর ঠিক করে দেব।

কুতুব চুপ করে থাকে। সোনা মিয়ার প্রবল আগ্রহে মনে হয়, বিয়ে করলে কি জোহরার মতো বউ হবে? কি রাজি?

জোহরার মতো মেয়ে আছে?

কুতুব সোনা মিয়ার হাত চেপে ধরে। সোনা মিয়া বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। কত দিন আগে জোহরা মারা গেছে। ওর কথা কি সোনা মিয়ার মনে আছে? তবু কুতুবকে বলে, হ্যাঁ কাজল জোহরার মতোই। ও আমারই ভাস্তি।

সত্যি বলছো জোহরার মতো।

তুমি নিজে দেখো, তারপর বুঝবে কেমন।

কবে দেখাবে?

আগামী সপ্তায়। এখান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে। গেলে তোমার ভালো লাগবে। আমার ভায়ের ছেলে নাই। তুমি ওদের কাছে ছেলের আদর পাবে। তাছাড়া কাজল খুব ভালো মেয়ে। দেখবে তোমার মন ভরে যাবে।

কুতুব কথা বলে না। সোনা মিয়া কথা বলে আনন্দ পাচ্ছে, পাক। আসলে কারো মন ভরানো খুব কঠিন। বুকের অণু-পরমাণুতে মিলেমিশে না গেলে কি মন ভরে? কাজল কি ওর জন্য জোহরার মতো মরতে পারবে? বুকের ভেতর ভালোবাসার মহানন্দ কুলকুল করে অনবরত বইতে থাকলে মরা যায়। সেই নদী বালি পড়ে ভরে গেলে মানুষ অন্যরকম হয়, কুতুবের মতো বিমর্ষ এবং জীবনের দিকে পিঠ ফেরানো। ওকে কথা বলতে না দেখে সোনা মিয়া ওর কাঁধে চাপ দেয়, কি ভাবছো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু না।

বিয়ের জন্য মন কেমন করে? কোনো ভয় নাই। সাহস করে করে ফেললেই হয়।

কুতুব বিস্মিত হয়ে বলে, আমি তো ভয় পাইনি।

সোনা মিয়া বলে, তাহলে চলো, আমার বাসায় যাই। গিয়ে গরম ভাত খাব। বউ পথ চেয়ে আছে।

স্বামী না ফিরলে বউরা কি পথ চেয়ে থাকে?

থাকেই তো। সারেং ওর হাত ধরে টানে, চলো।

না, থাক। অন্যদিন যাব।

ঠিক আছে, একদিন তোমাকে আমি দাওয়াত দিয়ে খাওয়াব। কি খাবে বল?

কাঁচকি মাছ বেশি করে পেঁয়াজ-কাঁচা মরিচ মাখিয়ে কলাপাতায় মুড়ে খোলায় দিয়ে রাঁধতে বলবে।

সোনা মিয়া অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়। ও একা একা এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়, খাওয়া-দাওয়ার ঠিক-ঠিকানা নাই। কারো সাতে-পাঁচে যায় না, নিজের কথাও কাউকে বলে না। ভোলাহাট বাজারে দুদলের মধ্যে ঝগড়া বাঁধলে লাল ইটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে, শোনে না। কখনো রাস্তার পাশে উঁচু গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো উদ্দেশ্যহীনভাবে, নয়তো কারো অপেক্ষায়, কে বলবে? অথচ ওর বুকের ভেতর কাঁচকি মাছের মরিচ-খোলা খাবার সাধ? কে বলবে, ও গৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন? সোনা মিয়ার ভরসা হয় যে, ও নিশ্চয়ই ঘর করতে পারবে।

তাহলে আমি যাই। আমার বউকে বলব তোমার কথা।

ও মাথা নাড়ে। তারপর এক দৃষ্টে সোনা মিয়ার অপসৃয়মান দেহ দেখে। ওর মনে হয়, সোনা মিয়া খুশিতে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলছে, ওর পা বুঝি মাটিতে পড়ছে না। কুতুব প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে। হাসতে হাসতে ওর চোখে পানি এসে যায়।

বিকেলে আজমলের পলুঘরে যায় ও। আজমল পলুর কাসারীতে ব্যস্ত। কুতুব বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে। আজ ও একদম শান্ত। ওর ভেতরে যে ক্ষরণ হচ্ছে, তা টের পাওয়া যায়। ও তীব্র হিংস্রতায় কারো দিকে আক্রোশ ভরে তাকিয়ে নেই। আজমল কাজ শেষ করে ওর কাছে এসে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি খবর কুতুব?

ও আজমলের হাত জড়িয়ে ধরে, আমি বিয়ে করব আজমল ভাই।

বিয়ে?

ঝাঁকিয়ে ওঠে আজমলের শরীর। কুতুব প্রবল উত্তেজনায় বলে, সোনা মিয়ার ভায়ের মেয়ে। নাম কাজল। একদম জোহরার মতো দেখতে।

কে বলল?

সোনা মিয়া বলেছে। জোহরার মতো না হলে বিয়ে করব না। কেন তা করব? মুহূর্তে ফুঁসে ওঠে ও। আজমল স্বস্তি পায় না। একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হবে। কুতুব হাতে ধরে রাখা তুঁতের ডাল মটমটিয়ে ভাঙে।

বিয়ে করতে খরচ লাগে, তা তোমার আছে?

নাই। আপনি দেবেন। আমি আপনাকে আস্তে আস্তে শোধ দেব।

তোমার ঘরও তো নষ্ট হয়ে গেছে?

সোনা মিয়া ঠিক করে দেবে।

সত্যি তুমি বিয়ে করবে কুতুব?

হ্যাঁ করব। আপনি যাবেন আমার পক্ষে?

যাব।

হঠাৎ আজমলের মনে হয়, হয়তো বিয়ে করলে কুতুব ভালো হয়ে যাবে। কেন ও ভাবছে, একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হবে? কুতুবের ভালো হয়ে ওঠাটাও তো দরকার। এখন সবার উচিত ওকে সাহায্য করা।

তোমার বউ'র জন্য আমি একটা লাল শাড়ি কিনে আনব কুতুব।

শুধু শাড়ি, স্নো-পাউডার, ক্লিপ-ফিতা?

কুতুব খুশি হয়ে চলে যায়। আজমল সোনা মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে সব ঠিক করে ফেলে। ওরা তৈরি হয়েই যাবে। কুতুবের মেয়ে পছন্দ হলে সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে পড়িয়ে দেয়া হবে। পরদিন বউ নিয়ে চলে আসবে। আজমলের সমর্থনে সোনা মিয়া উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ও কানাহাটি গিয়ে হাজির আলির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে। হাজির আলি বারবার জিজ্ঞেস করছে, ছেলেটা ভালো তো? ওর বউ উচ্চবাক্য করেনি। মেয়েটার একটা গতি হচ্ছে, এই ভেবেই খুশি। এখন কুতুব আর আজমলকে নিয়ে যাবার সময় ওর কানে বারবার সোনা মিয়ার কণ্ঠ বেজে ওঠে। নিঃস্ব হাতে মেয়েকে উঠিয়ে দেবে, তবু পিতার শঙ্কিত হৃদয় থেকে দূরে যেতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। পথে ওরা কেউ তেমন কথা বলে না। আজমল দুচারবার কুতুবের সঙ্গে ইয়ার্কি করার চেষ্টা করলে, ও রেগে যায়। ও গম্ভীর, মনে হয় গভীরভাবে কোনো কিছুর মধ্যে ডুবে আছে। ওর ভঙ্গি কুতুবের পছন্দ হয় না। দুপুর গড়িয়ে গেলে ওরা হাজির আলির বাড়িতে এসে পৌঁছে। সোনা মিয়া হৈচৈ করে। আপ্যায়নের কি ব্যবস্থা হয়েছে, তার তদারকি করে। আপ্যায়ন যাতে খারাপ না হয়, সে জন্য ও গতবার এসে হাজির আলিকে পনেরো টাকা দিয়ে গেছে। কুতুব পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। কথাবার্তা আজমলই বলছে। শুধু কাজলকে দেখার সময় ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দেখা-পর্ব শেষ হলে ও ওর সম্মতির কথা জানায়। সন্ধ্যার পর বিয়ে হয়ে যায়। মৌলবি ডেকে বিয়ে পড়ানো হয়। মৌলবি সাহেবের কোনো কথা কুতুবের কানে ঢোকে না। ওর মাথার মধ্যে বিচিত্র ধরনের ভাবনা কাজ করে। কেবলই মনে হতে থাকে, এখানে ও কাজল ছাড়া কাউকে চেনে না।

অনেক রাতে আজমল ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। মেঝেতে মাদুরের ওপর ঘোমটা দিয়ে বসে আছে কাজল। আজমলের দেয়া লাল টুকটুকে শাড়ি ওর পারনে। ওর মুখ দেখা যায় না কিন্তু বোঝা যায়, ও কাঁদছে। মৃদু ধ্বনি আসছে, শরীর নড়ছে। কুতুব সোনা মিয়ার মুখের দিকে তাকায়, ও কাঁদে কেন?

বিয়ের সময় সব মেয়েরাই কাঁদে?

মিথ্যা কথা।

কেন?

একজন কাঁদেনি।

হতে পারে, আমি জানি না। সব মানুষ কি আর এক হয়?

না সবাই এক হয় না।

কিছুটা অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলে ও। আজমল চমকে ওঠে। এখানে আসার সময় থেকেই ও অন্যরকম আচরণ করছে। ওর অস্বস্তি লাগে। তড়িঘড়ি বলে, কুতুব এখন শুয়ে পড়ো। কাল আবার আমাদের যেতে হবে।

সোনা মিয়া কুতুবের হাত চেপে ধরে, তুমি কাজলকে দেখবে কিন্তু। ও বড় ভালো মেয়ে।

কুতুব মাথা নাড়ে। ওরা চলে গেলে ও দরজা বন্ধ করে দেয়। ঘোমটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়ালে কাজল গুনগুনিয়ে কেঁদেই যাচ্ছে। কুতুব ঘোমটা খুলে বলে, তুমি কাঁদো কেন?

কাজল উত্তর দেয় না। কুতুব ওর মুখ তুলে ধরে। গালে জলের রেখা, ভেজা চোখজোড়া যেন বৃষ্টি-ধোয়া দিগন্ত, ওখানে ভুরুর আকাশ এসে উপুড় হয়ে পড়েছে।

জোহরা, আমার জোহরা।

কুতুব কাজলকে বুকে টেনে নেয়। ওর স্পষ্ট মনে পড়ে, জোহরার গলার ডান দিকে একটি কালো রঙের বড় জড়ুল ছিল, কাজলেরও তাই। ও পাগলের মতো চুমুক খায়। আর কি ছিল জোহরার? জানে না, ও আর কিছুই জানে না। রাত বাড়তে থাকে, আর ও কাজলের শরীর হাতড়ায়, যেন এক বদ্ধ উন্মাদ তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না। কাজল বিরক্ত হয়।

আপনি এমন করেন কেন?

তুমি খুব ভালো। আমি তোমায় মাথায় করে রাখব।

কুতুবের পাগলামি থামে না। জোহরাকে ওর দেখা হয়নি। ও কাজলকে দিয়ে সেই সাধ মেটাচ্ছে। এক আশ্চর্য পিপাসা রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে হাহাকার করে। কাজলের সুগঠিত শরীর তার কাছে একটা বিন্দু।

কাজল তোমার তেঁতুল গাছ ভালো লাগে।

না।

কেন?

লোকে বলে তেঁতুল গাছে ভূত থাকে।

মিছা কথা।

না সত্যি।

আমি বললাম মিছা কথা।

কুতুবের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আগুন ঝরে। ও কাজলের হাত মুচড়ে ধরলে ও বুঝতে পারে, ওর স্বামী রাগে ফুঁসছে। ওর মনে হয়, লোকটা সুস্থ নয়। সোনা চাচা ওকে একটা পাগলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। ও চিৎ হয়ে শুয়ে, লোকটা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। দরজা বন্ধ করার পর থেকে লোকটা ইচ্ছে মতো ওর সঙ্গে আচরণ করছে। এখন ওর রাগ বাড়তে থাকে, জেদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং একরোখা রাগ। কুতুব ফুঁসতে ফুঁসতে বলে, আমাদের বাড়ির পেছনে আমরা একটা তেঁতুল গাছ লাগাব।

না।

কাজলের কণ্ঠ অসহিষ্ণু।

আমার ওপর কথা বলতে পারবে না।

বলব, একশোবার বলব। আমাকে একটা পাগলের সাথে বিয়ে দিয়েছে।

কাজল কাঁদতে আরম্ভ করে। কুতুব থমকে যায়। দেখে, কাজলের নগ্ন শরীরে কান্নার ঢেউ খেলে যায়, কী সুন্দর! ও একদিন জোহরাকে বলেছিল, তোমার জড়ুল কী সুন্দর! তোমার সাথে বিয়ে হলে আমি ঐখানে আগে চুমু খাব। জোহরা খিলখিলিয়ে হেসেছিল। সে কী বাঁধ ভাঙা হাসি! কাজল কি এখন তেমন করে হাসবে? ও কাজলের ঘাড়ের চারপাশে হাত রাখে, মমতার হাত। ও কোনোদিন জোহরাকে কাঁদতে দেখেনি। অথচ সারাক্ষণই কাঁদছে এই মেয়েটা। কী যে জঘন্য! ওর দুশ্রটা আঙুল গলার চারপাশে নিবিড় হয়ে ওঠে। কী প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা কুতুবের শরীরে! কাজলের মুখটা এখন তেঁতুল গাছে ঝোলা জোহরার মতো হয়ে যাচ্ছে, চোখ বেরিয়ে আসছে, মুখে গাঁজলা, কণ্ঠে গোঁ গোঁ ধ্বনি। কী আনন্দ, কী আনন্দ! এত কাছে জোহরাকে ও কোনোদিন পায়নি, এত নিবিড়, এত আপন! ওর হাতের মধ্যে কাজলের শরীর ঢলে পড়ে, নিষ্প্রাণ। কুতুব ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মনে হয়, ও নিজেই এখন একটা বিশাল তেঁতুল গাছ। ওর বুকের ওমে কাজল জোহরা হয়ে যাবে।

ভোরবেলা পুলিশ যখন ওকে ধরে নিয়ে যায়, তখন পর্যন্ত ও একটা কথাও বলেনি। আজমল অনেক প্রশ্ন করেছে, জবাব নেই। শুধু এক অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে ও পুরো ঘটনা অবলোকন করে। কাজলের মা-বোনেরা চিৎকার করে কাঁদছে। বাড়িতে ভেঙে পড়েছে গাঁয়ের লোক। সোনা মিয়া অপরাধী হয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে। গাঁয়ের লোক তীব্র আক্রমণে আজমলকে নাজেহাল করছে। মাফ চাওয়া ছাড়া ওর আর কিইবা করার আছে? ওর বুক ফেটে কান্না আসে। ও অনবরত হাতের তালুতে চোখ মোছে। একি করল কুতুব?

কাজলের বাবাকে কাফনের টাকা দিয়ে আজমল পুলিশের সঙ্গে থানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত আসে। পুলিশ ওকে নানা ধরনের প্রশ্ন করে। জবাব দিতে দিতে ও পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। এমনিতে মানসিক দিক থেকে বিধ্বস্ত, তার ওপর অনেকটা পথ হেঁটে আসার দরুন শরীর ধূলিধূসরিত। চিড়চিড় করছে চামড়া। কুতুব মাথা নিচু করে বসে আছে। পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। একটু পর ওকে ভেতরে নিয়ে আটকাবে। আজমল কুতুবের পাশে এসে বসলে, ও মুখ তুলে তাকায়। ঘোলাটে দৃষ্টিতে সব আলো নিভে এসেছে। আজমলের বুক ধক করে ওঠে। ও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? ও কুতুবের হাত চেপে ধরে, কেন এমন করলে কুতুব?

কুতুব একগাল হেসে বলে, ওকে তো আমি জোহরা বানাতে চেয়েছিলাম।

ওর হাসি থামে না। না, হাসিতে শব্দ নেই, শুধু দাঁত বেরিয়ে থাকে।

আজমলের শরীর ঘুলিয়ে ওঠে। ও বুঝে যায়, কুতুবের সঙ্গে এই পৃথিবীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে একটুও স্বস্তি পায় না। সারাদিন পলুঘরের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখে, নইলে পুকুরপাড়ের ঘন ঝোপের আড়ালে বসে থাকে। ও মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে চায়। সবাই দোষারোপ করে। বলে, আজমল জেনে-শুনে পাগলটার হাতে কাজলকে উঠিয়ে দিয়েছে। কেউ কারো এতবড় সর্বনাশ করে? এসব শুনলে গ্লানিতে, বেদনায় ও মরমে মরে যায়। কিন্তু ও তো চেয়েছিল, কুতুবের কল্যাণ? ভেবেছিল, কাজলের মধ্য দিয়ে কুতুব নতুন জীবন লাভ করবে। ওর অপরাধ কোথায়? ঘুমুতে পারে না ও। স্বপ্নের মধ্যে ঘুম ভেঙে যায়। দেখতে পায়, শাদা দাঁত বের করা কুতুবের আকর্ণ বিস্তৃর্ণ হাসি। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

তিন দিন পর চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ফিরে আসে ইয়াসিন বসনি। সব শুনে গর্জে ওঠে, তোমার জন্য একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হলো? তোমার উচিত ছিল কুতুবকে বিয়েতে বাধা দেয়া!

মুহূর্তে ঝরে যায় আজমলের গ্লানি। দপ করে দুচোখ জ্বলে ওঠে ওর, আপনার জন্য জোহরা মরেনি? আপনার জন্যই কুতুব পাগল হয়েছে এবং কাজল খুন হয়েছে।

কি! এতবড় কথা? আমার খেয়ে, আমার পরে আমার ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলাবাজি? বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

আজমল দৃঢ়কণ্ঠে মাথা নাড়ে, অনেক আগেই আমার যাওয়া উচিত ছিল।

ইয়াসিন বসনি দুমদাম পা ফেলে ঘরে যায়। আজমল বেরিয়ে আসে। ধীরে-সুস্থে আশিক আলির বাড়িতে আসে। রহিমুন ডালের বড়ি বানাচ্ছিল। ওকে দেখে একগাল হাসে, বাজান ক্যাংকা আছো?

ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় বসে। একজন লোক ওকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

ফুফু এক গ্লাস পানি দ্যান। চাচা কই?

রহিমুন ঘাড় নেড়ে জানায়, জানে না কোথায়। ও বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে গা ছেড়ে দেয়। এখন ওকে অনেকটা পথ যেতে হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭

ছেলের নাম রাখা হলো মোহন।

ষোল দিন পর নাতীকে নিয়ে জমিদার গিন্নী এলেন নিজের বাড়ি রামচন্দ্রপুর হাটে। ইলা আবার আত্মগোপন করল। প্রথম রাত মাতলার বাড়িতে ক্যাম্পে থাকবে, পরদিন চলে যাবে সুফল মাঝির ওখানে।

এর আগের দিন রাঙা মিয়া, চরণ মাঝি ও এছান মিয়ার খোলান থেকে ধান নিয়ে আসা হয়েছে। ওরা তেভাগা ও সাত আড়ি জিন মেনে নেয়নি। আজ ধান ভাগ করে ওদের হিস্যা ওদেরকে পৌঁছে দেয়া হবে। রাতে ঘুম আসে না ইলার। অনেক দিন পর পাকা ধানের ঘ্রাণ ওকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। বাইরে কুকুর ডাকছে একটা। ধান পাহারা দিচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ছেলেরা। মাতলার তত্ত্বাবধানে সব ব্যবস্থা নিখুঁত। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। অন্যদিকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্ব পালন করছে শেখ আজহার হোসেন। ওদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রত্যেক রাতে এলাকার প্রতি গ্রাম থেকে দুজন করে স্বেচ্ছাসেবক সারা রাত ক্যাম্প পাহারা দেয়। প্রায় তিন-চারশো স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্পের আশপাশে থাকে। দুপুরে রাতে খিচুড়ি রান্না হয়। ওরা শালপাতা কলাপাতায় খিচুড়ি খেয়ে রাত-দিন কাজ করে। নাচোল এখন মুক্ত এলাকা। নিজেদের শাসন চালু হয়েছে। জমিদার-জোতদাররা টু শব্দ করতে পারছে না। আইনমতো ধান ভাগ হয়ে চলে যাচ্ছে যার যার বাড়িতে। কৃষকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা। ওদের সুদিন এসে যাচ্ছে। এখন আর বুলবুলিতে ধান খেয়ে যেতে পারবে না।

ইলা ওদের কথা শুনতে পায়। ইচ্ছা করে কি ওরা আলাপ করে, শুনতে। কিন্তু ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। ও উঠে বাইরে আসে। গাদা করে রাখা ধানের আঁটির পাশে দাঁড়ায়। ছুটে আসে ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানীমা?

ওদের কণ্ঠে উদ্বেগ।

ইলা হেসে বলে, ঘুম আসছে না। মনে হচ্ছে, আমিও সারা রাত তোমাদের সঙ্গে পাহারা দেই।

না, না, রানীমা আপনি জাগবেন কেন? আপনার শরীর খারাপ হবে।

ধুর কিছু হবে না। এসো কথা বলি। দিনের বেলায় তো সময় হয় না।

ইলা উঠোনের একধারে বসে। একে-দুয়ে গুটিগুটি পায়ে আরো অনেকে এসে জড়ো হয়। চাঁদের আলোর ভেসে যাচ্ছে উঠোন। উঠোনের বড় কাঁঠাল গাছের ঘন-পাতার মাথায় বৃত্ত। ইলা মুগ্ধ হয়ে যায়। বড় সুন্দর রাত। মাতলা বাড়ি নেই। ও অন্য গ্রামে গেছে কৃষকদের সংগঠিত করতে।

রানীমা মুখে মুখে একটা গান তৈরি হয়েছে। আমরা আস্তে আস্তে গাই, আপনি শুনুন।

ভালোই তো, গাও।

হাবিব আর সন্তোষ গুনগুনিয়ে গায় :

ইলা মৈত্রী নারী
আইন করলো জারি
আধি জমি তেকুটি ভাগ
জিন হলো সাত আড়িয়ে ভাই
জিন হলো সাত আড়ি।

AMARBOI.COM

জানেন এই গানে খুব কাজ হচ্ছে। কৃষকরা উৎসাহে কাজ করে যাচ্ছে। জোতদাররা একদম কেঁচো হয়ে আছে।

সবাই একত্র হলে এমনই হয়। তোমাদের আজ আমি ময়মনসিংহের সুসং দুর্গাপুরের গল্প বলব। সেখানে এক দারুণ ঘটনা ঘটেছিল।

সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা গায়ে গা লাগিয়ে ঘন হয়ে বসে। পাথরের খোদাই করা কালো মুখের চাঙড়ে অন্ধকারের আঁকিবুঁকি রেখা। চাঁদের আলোয় সে রেখা বিদ্যুতের মতো ঝলকায়। ওদের দৃষ্টিতে প্রতিজ্ঞার আগুন। ওরা অধিকার আদায়ের দাবি থেকে এক পা পিছবে না। আজাহার হোসেন ক্যাম্পের দায়িত্ব পালন করে। নাচোল থানার বিভিন্ন গ্রামের রিপোর্ট এসে পৌঁছায় এখানে। রাজশাহী জেলারও খবর আসে। সেইসব খবর নিয়ে নেতাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়। কর্মসূচি ঠিক হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচণ্ড কর্মোদ্দীপনায় এখানকার দিনগুলো কেটে যায়। সাফল্যের আবেগে ইলার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে থাকে।

হরেক মৃদু কণ্ঠে বলে, রানীমা—

বলছি হরেক। তোমাদেরকে কৃষক আন্দোলনের কথা বলতে আমারও ভালো লাগে। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। আজ এখানে তোমরা যা করছো, তেমন ঘটনাই ঘটেছিল সুসং দুর্গাপুরে। সুসং জমিদারদের আয়ের প্রধান ক্ষেত্র ছিল গারো পাহাড়। ব্রিটিশ আমলে গারো পাহাড় সুসং জমিদারদের হাতছাড়া হয়ে ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কিছুদিন পর ব্রিটিশ সরকার জমিদারদের হাতি ধরার অধিকারও কেড়ে নেয়। পাহাড়ের পাদদেশে বাস করত হাজং, গারো, ডালু, কোচ, রাজবংশী ইত্যাদি উপজাতি। ওদের কোনো খাজনা দিতে হতো না। কারণ ওরা জমিদারদের হাতি ধরায় সাহায্য করত। হাতি ধরার সময় চার পাঁচশো লোকের দরকার হতো। হাতি-ধরা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জমিদাররা খাজনা আদায়ের দিকে নজর দিল। জমিদাররা বোঝাল, আমাদের এখন পাহাড় নেই, হাতি খেদা নেই, কাজেই তোমাদের খাজনা দিতে হবে। বিনা খাজনায় আমরা এত জমি রাখতে পারব না। হাজং কৃষকদের তো মাথায় বাড়ি। এদের মধ্যে গোরাচাঁদ হাজং ছিল বুদ্ধিমান লোক। সে বলল, আমাদের পূর্ব-পুরুষরা জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি গড়েছে, চাষাবাদের উপযুক্ত করেছে। ওদের বাঘে খেয়েছে, সাপে কেটেছে, ওরা বুনো মহিষের সঙ্গে লড়াই করে এসব জমি আবাদযোগ্য করেছে। হাতি খেদাতেও আমাদের অনেক লোক মারা গেছে। আমরা গরিব। আমরা খাজনা দিতে পারব না। আমরা সব সময় আপনাদের অনুগত, আপনাদের জন্য জীবন দেব, কিন্তু খাজনা নয়। জমিদাররা বুঝল, সহজ কথায় কাজ হবে না। ওরা লাঠিয়াল সংগ্রহ করল। ওদের ছিল বিহারি বরকন্দাজ বাহিনী, ছিল হাতি। সব একত্র করে ওরা হাজং এলাকায় পাঠাল। লাঠিয়ালরা উপজাতিদের কাছে প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে দুর্গাপুরে পালিয়ে গেল। খবর রটে গেল যে, হাজংরা জমিদার বাড়ি লুট করবে। তখন ওরা ওদের পরিবারের জং বাহাদুরের কাছে বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দিয়ে সপরিবারে কলকাতায় চলে যায়। দু বছর এই বিদ্রোহ চলছিল। পরে হাজং এলাকায় এক সংঘর্ষে হাজং নেতাদের কেউ কেউ নিহত হয়। তখনকার মতো বিদ্রোহ দমন হয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ১৯৩৮-এ আবার টংক আন্দোলন শুরু হলে কৃষকরা সে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মানুষের মনের আগুন অনুকূল বাতাসে দাউ দাউ জ্বলে উঠল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল মণি সিংহ। টংক মানে ছিল ধান কড়ারি খাজনা। হোক বা না হোক, কড়ার মতো ধান দিতে হবে। টংক জমির ওপর কৃষকদের কোনো স্বত্ব ছিল না। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্দি থানায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে সুসং জমিদারি এলাকায় এর প্রচলন ছিল ব্যাপক এবং বেশ কঠোর। সোয়া একর জমির জন্য বছরে ধান দিতে হতো সাত থেকে পনেরো মণ। অথচ ঐ সময়ে জোত-জমির খাজনা ছিল সোয়া একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা মাত্র। ঐ সময়ে ধানের দর ছিল প্রতিমণ সোয়া দুই টাকা। ফলে প্রতি সোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হতো এগারো টাকা থেকে প্রায় সতেরো টাকা। এই প্রথা শুধু জমিদারদের ছিল, তা নয়, মহাজনরাও টংক প্রথা দিয়ে কৃষকদের শোষণ করত। একমাত্র সুসং জমিদারই টংক প্রথা দিয়ে দুই লক্ষ মণ ধান আদায় করত। এই নিপীড়নে কৃষকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। শুরু হলো আন্দোলন। মণি সিংহ বললেন, 'কৃষকদের এক করতে হবে। কেউ ছটাক ধানও জমিদারদের দেবে না। আপনারা গ্রামে গ্রামে যান। টংক আন্দোলনের কথা মুখে মুখে প্রচার করুন।' কৃষকরা এক হয়ে গেল। মাঘ মাসে ধান আদায়ের সময় দেখা গেল জমিদাররা এক-চতুর্থাংশের বেশি ধান আদায় করতে পারেনি। আন্দোলনের ফলে টংক প্রথা পুরোপুরি উচ্ছেদ করা যায়নি, তবে ঠিক হয়েছিল যে, একজনের যদি বছরে পঞ্চাশ মণ টংক ধান দিতে হয়—তবে ঐ অতিরিক্ত পঞ্চাশ মণ আট কিস্তিতে পরিশোধ করে দিলে তার জমির স্বত্ব হয়ে যাবে। এইসব আন্দোলনের সময় বিভিন্ন সংঘর্ষে মানুষ যে কত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, তার তুলনা হয় না। এই সাহজ দিয়েই তো মানুষ জয় করে নিজেদের অধিকার।

ঠিক বলেছেন রানীমা। সাহস না করলে কিছুই হয় না।

তোমাদেরকে কি আমি কালীচরণের বউর গল্প করেছিলাম?

মৃদু গুঞ্জন ওঠে, না বলেননি। বলুন।

দূর থেকে বাঁশির শব্দ ভেসে আসে। কোনো সাঁওতাল ছেলে হয়তো নিজেদের গ্রামকে জাগিয়ে রাখার জন্য বাঁশি বাজাচ্ছে। ওরা পালা কমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমোয়। ওরা প্রতি মুহূর্তে সতর্ক হয়ে থাকে। রমেন কৃষক সংগঠনের কাজে অন্য জায়গায় আছে। ছেলেটি কেমন আছে? ছেলের জন্য বুক কেমন করে ইলার। মার কাছ থেকে যে মুহূর্তগুলো ঐ শিশুর পাওনা ছিল, সে তা পাচ্ছে না। এই সময়গুলো ইলার জন্য এখন অত্যন্ত জরুরি। মানুষের সমান অধিকারের প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে ওরা, প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। ছেলে তো ঠাকুরমার কাছে আদরে আছে, ভালো আছে। ভাবনা কি?

রানীমা?

হরেকের কণ্ঠে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়।

ইলা বলতে শুরু করে, কালীচরণ ছিল নেত্রকোনার বিসরপাশা গ্রামের কৃষক। সেখানে পার্টির নেতা কমরেড মণি সিংহ। সেই গ্রামে কালীচরণের সাত হাল জমি ছিল। জমিদারের নায়েবদের ঋণ দেয়ার ফাঁকি কালীচরণ বুঝতে পারেনি। একদিন জমি চাষ করতে গিয়ে দেখল, ওর জমির সাত হালের তিন হাল জমিদারের দখলে চলে গেছে। কালীচরণের তো চক্ষু চড়ক গাছ! রক্ত জল করা জমি, এ কি প্রাণে সয়! ও ছুটল গৌরীপুরের জমিদারদের কাছে নালিশ করতে। কিন্তু গৌরীপুর পর্যন্ত পৌঁছার আগেই ওর সঙ্গে দেখা হলো কৃষক সভার কর্মীদের সঙ্গে। ওরা ওকে বোঝাল যে, ওদের কাছে গিয়ে লাভ নেই। জমিদার হুকুম না দিলে নায়েবের সাধ্য কি এমন করে? তুমি নেত্রকোনা চলো। কমরেড মণি সিংহ তোমার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। উনি নিজে জমিদার হয়েও কৃষকদের জন্য লড়ছেন। কালীচরণ ওদের সঙ্গে কমরেড মণি সিংহের কাছে গেল। মণি সিংহ কালীচরণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আন্তরিক কথায় ওর উত্তেজনা প্রশমিত করলেন। তাঁর উদ্যোগে উকিল চন্দ্রবিনোদ দাস কালীচরণের পক্ষে মামলা লড়লেন এবং কালীচরণের পক্ষে রায় আদায় করলেন।

এই খবর গৌরীপুরের জমিদারের কাছে পৌঁছতেই তার রক্ত মাথায় চড়ে গেল। এতবড় সাহস নেংটিপরা মানুষেরা ছুঁচো হয়ে বাঘের সঙ্গে লড়তে চায়? জমিদার নিজে লোক-লস্কর নিয়ে হাতিতে চড়ে গেল জমি দখল করতে। শুনে কালীচরণের বউ তো রেগে আগুন। ও এক হাতে বটি আর এক হাতে ঝাঁটা নিয়ে কালীচরণকে বলল, দরকার হলে জীবন দেব, জমিদারকে কাটব এই বটি দিয়ে, তবু এক ফালি জমি দেব না। এই বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও জমির আলের পাশে দাঁড়াল। কৃষক সভার কর্মীরা খবর পেয়ে লাঠি, বল্লম, সড়কি নিয়ে ছুটে এল সবাই। জমিদারের সামনে উদ্যত বটি হাতে কালীচরণের বউ রণচণ্ডীমূর্তিতে চিৎকার করছে, নেমে আয় হাতি থেকে। পা ফেলে দেখ আমার জমিতে।

জমিদার হুঙ্কার দিয়ে উঠে মাহুতকে বলে, ওকে হাতির পায়ের নিচে পিষে ফেল।

কৃষক সভার কর্মীরা চোঙ মুখে গর্জে ওঠে, খবরদার? হুঁশিয়ার! স্লোগান ওঠে, জমিদারের জুলুমবাজি চলবে না, চলবে না। হাজার মানুষের কণ্ঠে কেঁপে ওঠে বিসরপাশার আকাশ। সেই সমবেত গর্জনে হাতি পেছনে ফিরে দৌড়। পেছন পেছন বটি হাতে ধাওয়া করে কালীচরণের বউ, তার পেছনে জনতা। যে তাড়ায় হাতি দাঁড়াতে পারে না, সে তাড়ায় কি পা-চাটা মানুষের দল দাঁড়াতে পারে? কালীচরণের বউ'র এই সাহসের কথা গল্পের মতো ছড়িয়ে গেল সবখানে।

সাঁওতাল নারী-পুরুষ হাঁ করে গিলছিল রানীমার গল্প। ওদের চোখে-মুখে মুগ্ধতা, ওরা অভিভূত হয়ে শোনে। হরেক বলে, এমন গল্প কে কবে শুনেছে?

আমি তোদের তন্নারায়ণের গল্প বলেছি?

হ্যাঁ।

কম্পরাম সিং-এর?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ। জয়মণি, সরলাদির?

হ্যাঁ।

মাস্টারদা সূর্য সেনের?

হ্যাঁ।

ক্ষুদিরামের?

হ্যাঁ।

তিতুমীরের?

হ্যাঁ।

ইলা কিছু বলার আগেই হরেক চিৎকার করে ওঠে, আমরাও ওদের মতো মরতে পারি রানীমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানি। আমরা সবকিছুর মোকাবেলা করব। আমরা নিজেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

মৃদু গুঞ্জন ওঠে, ঠিক, ঠিক।

আবার নীরবতা। খড়েরগাদার ও-পাশে শেয়াল ডাকে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে কুকুর। মুখরিত হয়ে ওঠে ক্যাম্পের চারপাশ। ইলা হাসতে হাসতে বলে, ওরা আমাদের হয়ে স্লোগান দিচ্ছে।

হাসির রোল ওঠে ওদের মধ্যে টুকরো মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়েছে। হালকা আলোয় ছেয়ে যায় প্রাঙ্গণ। ইলার বুক ভরে ওঠে। ওর মনে হয় যেন লম্বা বাঁশের মাথায় পতপত উড়ছে লাল পতাকা। সে সংকেতে ছুটে আসছে হাজার হাজার মানুষ। থেমে যায় শেয়ালের ডাক। ওর বুকের ভেতর পদধ্বনি। শত্রুর আগমনকে প্রতিহত করার জন্য সবাইকে একত্র করার প্রয়োজনে একটি ব্যবস্থা করেছে ওরা। গাঁয়ের সীমানার সবচেয়ে উঁচু তালগাছের মাথায় বাঁধা হয়েছে বিরাট লম্বা বাঁশ। প্রয়োজনে ঐ বাঁশের মাথায় উড়িয়ে দেয়া হবে কম্যুনিস্ট পার্টির লাল পতাকা। ঐ পতাকা উড়লেই পাঁচ-ছ' মাইল এলাকার মানুষ বুঝে নেবে যে পার্টিই তাদের ডাক দিয়েছে। ঐ পতাকা ওড়ার সাথে সাঁওতাল পল্লীতে বেড়ে উঠবে মাদল। ঐ শব্দের তরঙ্গ-সংকেত পৌঁছে যাবে হাজার মানুষের বুকে—ছড়িয়ে যাবে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়। ইলার মুহূর্তে মনে হয়, তেমন পরিস্থিতি হলে ওর সামনে বসে থাকা এসব মানুষ কালীচরণের বউ'র মতো অসীম সাহসী হয়ে উঠবে। ওরা নিজেদের অতিক্রম করে ফেলবে।

রানীমা, রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এল। আপনি ঘুমুতে যান?

যাই।

আসর ভেঙে যায়। যে যার মতো ছড়িয়ে পড়ে। ইলা বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে। সাঁওতালদের ভাষা ও ভালোভাবে রপ্ত করেছে বলেই এমন অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে। ওদের সঙ্গে কথা বললে বুক ভরে যায়। উপমহাদেশে বিপ্লব আসন্ন ভাবতে ভাবতে ও বিছানায় উঠে বসে। বি.টি. রণদীভে বলেছিলেন, এতদিন আমরা সংস্কারপন্থী পথে অগ্রসর হয়েছি, বুর্জোয়া নেতৃত্বের লেজুড়বৃত্তি করেছি। স্বাধীনভাবে উদ্যোগ নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারিনি। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম লীগ সমঝোতার ভিত্তিতে তথাকথিত স্বাধীনতা এনেছে। এই স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়—ইয়ে ঝুট আজাদী হ্যায়। যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থার মতো এখনও বিপ্লবী অবস্থা বিরাজ করছে, কাজেই সংগ্রাম করে বুর্জোয়া নেতৃত্বকে উচ্ছেদ করতে হবে। ইলা হাঁটুর ওপর দুই করতল স্থাপন করে জোর দিয়ে চেপে ধরে। বিড়বিড়িয়ে বলে, আমরা নাচোলে তেভাগা চালু করেছি। আমরা নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারছি। আমাদের জয় অনিবার্য। মানুষের মিলিত শক্তির কাছে সব অশুভ চক্রান্ত পরাভূত হয়।

সে রাতে ওর আর ঘুম আসে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮

বল, আজাহার হোসেন কোথায়?

জানি না হুজুর।

জানিস। কোথায় লুকিয়ে আছে বল? নইলে জানে বাঁচবি না।

দারোগা তফিজউদ্দিন মাটিতে বুটের বাড়ি দেয়।

জানি না হুজুর।

জানো না বললেই হলো? একশোবার জানিস। বল, ঠিক করে বল, না বললে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব।

হুজুর আমার মা-বাপ। আমি শুয়োরের বাচ্চা। খোদার কসম কিছু জানি না।

করম আলির পিঠে বেতের বাড়ি পড়ে।

উহ্ মাগো।

তেভাগা করার মজা দেখাচ্ছি। একেকজন সব বাদশা হয়েছে। ইচ্ছেমতো আইন জারি করলেই হলো? দেশে সরকার নেই?

পায়ে লুটিয়ে পড়ে করম আলি। তফিজউদ্দিন এক ঝটকায় পা ছড়িয়ে নেয়।

বিশ টাকা দে, মাফ করে দিচ্ছি।

টাকা! কোথায় পাব?

করম আলি অপার বিস্ময়ে দারোগার মুখের দিকে তাকায়। পাশ থেকে একজন পুলিশ ভেঙচি কাটে, ব্যাটা এমন ভাব করছে যেন টাকা কি জানে না?

ওর পাছার ওপর আরো দুটো বাড়ি দেয়। তাহলেই সোজা হয়ে যাবে।

হুজুর পেটে ভাত নাই, টাকা কোথায় পাব?

ঠিক আছে, দশ টাকা দে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করম আলির বউ ঘর থেকে একটা কাঁসার থালা নিয়ে আসে।

হুজুর, একে ছেড়ে দেন হুজুর। এই কাঁসার থালা ছাড়া ঘরে আর কিছু নাই।

দে, তাই দে।

চলে যায় পুলিশের দল। ওরা চারজন। সেদিকে তাকিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে করম আলি। সকিনা ওর পিঠে রেড়ির তেল লাগিয়ে দেয় আর দাঁত কিড়মিড় করে, শুয়োরের বাচ্চাগুলো এরপর এলে বটি দিয়ে কুপিয়ে খতম করব।

ওদের কাছে বন্দুক আছে যে?

থাকুক বন্দুক। একটাকে মেরে নিজে মরব।

সকিনার কণ্ঠে ঘৃণা উপচে পড়ে। করম আলি যন্ত্রণায় কাতরায়।

ওদিন রহিম চাচাকে থানায় নিয়ে যা মারাটা মারল! বেচারা এখন বিছানা থেকেই উঠতে পারে না। আল্লা যদি বিচার না করে, বিচার আমরাই করব।

এমন কথা বলিস না বউ।

ভীত করম আলির বুক কাঁপে। বেশি সাহসের কথা শুনলে ও স্থির থাকতে পারে না। কিন্তু সকিনার আক্রোশ নির্বাপিত হয় না। ও সরোষে বলে, কেন বলব না? নুলোর মতো বসে থেকে ওদের জুলুম সইব নাকি? আমি পারব না বাপু। আমি ঠিকই একটা কিছু ঘটিয়ে ফেলব। বিয়ের সময় বাপ কত কষ্ট করে কাঁসার থালাটা দিয়েছিল, গেল ঐ শুকন-খেকোর পেটে। আল্লারে।

সকিনা বিলাপের মতো অশ্রাব্য গালাগাল করে। করম আলি কিছু বলে না। সকিনার হাতের মালিশ উপভোগ করে।

তখন বড় সড়ক ছেড়ে আজমল গাঁয়ে ঢোকে। পুলিশের মুখোমুখি হয়। দারোগা দাঁত কিড়মিড়িয়ে ওর দিকে তাকায়, কোথা থেকে আসা হচ্ছে? এ গাঁয়ে দেখেছি বলে তো মনে হয় না?

ভোলাহাট থেকে আসছি।

কেন?

আজিজের কাছে।

আজিজ? ঐ নাসির জোতদারের কুলাঙ্গার ছেলেটা? নাই, পালিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ওকে থানায় নিয়ে চল। উত্তম-মধ্যম দিলেই বদমাশটার খোঁজ পাওয়া যাবে। নিশ্চয়ই ও সব জানে। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে খবর আদান-প্রদান করে।

ও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বলে, আমি কিছুই জানি না।

মুখ খিচিয়ে ওঠে দারোগা, কিছুই জানে না। ন্যাকা। প্যাঁদানি পড়লে সবই জানতে পারবে।

ও মরিয়া হয়ে বলে, আজিজ আমার মামাতো ভাই।

হয়েছে আর আত্মীয়তা ফলাতে হবে না। চল।

কেন, আমি থানায় যাব কেন? আমি কি দোষ করেছি?

আবার কথা? ছোটলোকের বড় বেশি...।

দারোগার রক্তচক্ষুতে পুলিশ দুজন ওর কোমরে দড়ি বেঁধে ফেলে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে যায়। রাগে, দুঃখে আজমলের চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। দুবার ঝাঁকুনি দিয়ে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে যায়। পিঠের ওপর দুঘা পড়লে আবার চলতে শুরু করে।

রাম-রাজত্ব নাকি? এসব কি হচ্ছে?

পুলিশ দুজন দাঁত বের করে হাসে। দারোগা বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে গেছে। ওরা আজমলকে মজা করছে।

পকেটে কিছু থাকলে দিয়ে ফেল? ছেড়ে দেব।

মানে?

কানাকড়ি কিছু নেই?

আজমলের মুখ কঠিন হয়ে যায়। বলে, না।

শালার তেজ মরে না। থুঃ।

একজন পথের মাঝে একদলা থুতু ফেলে। অন্যজন নাক ঝাড়ে।

খুব করে আজিজের কথা মনে হয় ওর। ও পালিয়েছে মানে কি? কোথায় পালাবে? হঠাৎ ওর মনে হয় তেভাগার জন্য নিশ্চয় পুলিশ ওকে খুঁজছে। তাহলে কেউ কি নেই গ্রামে? ওয়াজেদ মোড়লকে তো আগেই ধরে নিয়ে গেছে। হরেক কি আছে? ওর বুক তোলপাড় করে। মনে মনে বলে, কেউ না থাকুক, আমি তোমাদের জন্য থাকব। এদের এই নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে না পারলে আমি আর পুরুষ মানুষ কেন? নিজের যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে ও তেভাগার মর্ম উপলব্ধি করে।

থানার চত্বরে কুতুবকে দেখতে পায় ও। মুখভর্তি দাড়ি, সম্পূর্ণ নগ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও একটু দূরে বসে কি যেন খুঁটে খাচ্ছে। ওর সারা শরীরে ধুলো। কখনো আপন মনে হাসছে। আজমল চোখ ফিরিয়ে নেয়। ইচ্ছে করে, ওকে একটা কাপড় পরিয়ে দিতে। কিছুই করা হলো না। সারা দিন একটা ছোট ঘরে আটকে রাখল ওরা। কিছু খেতেও দিল না। প্রচণ্ড ক্ষুধায় ওর মাথা ঘোরে, অনবরত থুতু উঠে আসে। ওর মনে হয়, ও বুঝি পাগল হয়ে যাবে। জানালা দিয়ে কুতুবকে দেখা যায়। ওর এই অবস্থায় আর কোনো বিচার হয়নি। ও এখন এভাবেই ঘুরে বেড়ায়। আজমল ওকে হাত ইশারায় ডাকে। ও জানালার কাছে এসে শাদা দাঁত মেলে হাসে। তারপর হাতের মুঠি প্রসারিত করে দেয় আজমলের দিকে, কতকগুলো কাঁচা ছোলা সে মুঠিতে।

খাবি?

কুতুব!

ও গাঢ় স্বরে ডাকে। আজমলের চোখ ভিজে ওঠে। কুতুবের হাসি কমে না। ও একটা একটা করে ছোলা মুখে দেয়।

কুতুব?

ও ফিরে তাকায় না। ওর পিঠে ছড়ির দাগ। কেউ ওকে মেরেছে। একসময় ও পুরো মুঠি মুখে পুরে দিলে গাল ফুলে ওঠে। আজমল একদৃষ্টে ওকে দেখে। ও কোঁত করে ছোলা গিলে বলে, বাড়ি যাবি না?

আজমল মাথা নেড়ে বলে, যাব।

আমিও বাড়ি যাব, বাড়ি যাব।

একটা কথা বারবার বলে ও ধেই-ধেই করে নাচতে নাচতে চলে যায়। একটু দূরে গাছের নিচে বসে নেড়ি কুকুরের গলা জড়িয়ে ধরে কোলের ওপর টেনে নেয়। আজমলের ইচ্ছে করে চিৎকার করে কাঁদতে।

একটু পরে দরজা খুলে যায়, দুজন পুলিশ ওকে দারোগার সামনে এনে হাজির করে। হাত পিছ-মোড়া দিয়ে বাঁধা। ওকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়। দারোগা গরম চোখে তাকায়, আজিজ কোথায়? অকস্মাৎ ও চিৎকার করে বলে, যে ছেলেকে বাপ সামলাতে পারে না, তাকে খুঁজে বের করবে পুলিশ?

শুয়োরের বাচ্চা!

তারপর ও চোখে অন্ধকার দেখে। ওর আর কিছু মনে নেই। শুধু মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে, প্রচণ্ড বুটের লাথিতে ও মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। সারা রাত হাত বাঁধা অবস্থায় গাছের নিচে ফেলে রেখেছিল ওকে। অনেক রাতে কে যেন ওর মুখে পানি দিয়েছিল। ভোর রাতে জ্ঞান ফিরলে ও টের পায়, সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। ও ওঠার চেষ্টা করে, পারে না। আবাক হয়ে লক্ষ্য করে, কুতুব ওর হাতের বাঁধন খুলে দিচ্ছে। ওর মুখে শাদা দাঁত বের করা হাসি নেই। কুতুব একদম কয়েদ চাচার মতো বিষণ্ণ এবং গম্ভীর। কুতুব ওকে উঠে বসতে সাহায্য করে। শরীরে ব্যথা নিয়ে ও উঠে হাঁটতে আরম্ভ করে, পাহারাতে পুলিশ ওকে কিছু বলে না। ও বোঝে যে, ওরা ওকে ছেড়ে দিয়েছে। ওর কাছে ওদের আর কিছু চাওয়ার নেই। কোমরে হাত দিয়ে দেখে, পঞ্চাশটি টাকা ছিল, সেটি নেই। ও গাঁয়ের দিকে হাঁটতে থাকে। কুতুব আপন মনে খানিকটা পথ ওর সঙ্গে আসে। তারপর ও শিবগঞ্জের রাস্তায় চলে যায়। আজমল দাঁড়িয়ে দেখে, মাথা টলে উঠলে ও রাস্তার পাথে বসে পড়ে। কুতুব নগ্ন হয়ে চলে যাচ্ছে। ওকি এই অবস্থায় ভোলাহাট যাবে? ও একটুক্ষণ দম নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে। কুতুবকে মাথা থেকে নামিয়ে দেয়—ওর সামনে এখন বিস্তৃত পথ।

পরদিন আবার পুলিশ আসে গাঁয়ে। এবার ভগিরথের বাড়িতে।

বল, ধান লুটে অংশ নিয়েছিলি?

লুট কোথায়? নিজের হিস্যা বুঝে নিয়েছি।

হিস্যা? কে হিস্যা ঠিক করেছিল?

রানীমা।

কোথায় তাদের রানীমা?

জানি না।

চণ্ডিপুরে নেই?

জানি না।

শুয়োরের বাচ্চার কেবল জানি না।

দমাদম পিঠের ওপর কয়েক ঘা বেত পড়ে। 'বাবাগো' বলে চিৎকার করে ওঠে ভগিরথ। ছুটে আসে নয়নতারা। জড়িয়ে ধরে ভগিরথকে, টেনে ওঠাতে চায়। ভগিরথ উঠতে গিয়ে টলে যায়।

এই ছেড়ে দে ওকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারি কেন? ভাগ এখান থেকে।

পুলিশ চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় নয়নতারাকে। ওর কনুই ছিঁড়ে রক্ত ঝরে, দাঁতের ঘষায় ঠোঁট কেটে যায়। ভগিরথ নয়নতারাকে টেনে ওঠায়। আশেপাশে পুরুষরা কেউ নেই। নারী ও শিশুরা ভয়ে পালিয়েছে। আড়ালে থেকে দেখছে। এগিয়ে আসার সাহস নেই।

এই ওর খাসি দুটো নিয়ে চল। ঐ কলার কাঁদিটা বোধ হয় দু-একদিনে পাকবে। ওটাও কেটে নে।

না, না।

চিৎকার করে ওঠে নয়নতারা। ভগিরথ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা কলার কাঁদি কাটে। তারপর খাসির দড়ি খুলে নেয়।

না—।

ভগিরথের আর্তচিৎকার বাতাসে ভেসে যায়। ও ওদের পিছু পিছু ছুটে যায়।

ছেড়ে দেন, আমার খাসি দুটো ছেড়ে দেন। আমার এমন সর্বনাশ করবেন না হুজুর।

পুলিশ কটমটিয়ে তাকায়।

আর এক পা এলে হাড় গুঁড়িয়ে দেব। এখনো শিক্ষা হলো না।

ছাগলের দড়ি টানতে টানতে ওরা চলে যায়। ভগিরথ আর নয়নতারার বিলাপে ভেসে যায় গাঁয়ের আকাশ। আস্তে আস্তে মাঠ থেকে ফিরে আসে পুরুষরা। সবার মনে এক চিন্তা। এর প্রতিকার কি? আমরা কি এভাবে মরব?

তখন ক্যাম্পে আজমলকে শুশ্রূষা করে হরেক। ওর জ্বর এসেছে। সারা শরীরে ব্যথা। হরেক পিঠে তেল মালিশ করে। দড়ির বাঁধনে হাতের কব্জি ফুলে উঠেছে, নাড়াতে পারে না। প্রায় অচেতনের মতো শুয়ে আছে। টুটু ঝিনুক দিয়ে ওর মুখে একটু একটু দুধ দেয়। ইলা দিনের বেলায় সুফল মাঝির বাড়িতে চলে গেছে। সন্ধ্যার পর আসবে। হরেক অনেকক্ষণ নিজে নিজে পুলিশকে গালাগাল করে। ওর মাথা গরম হয়ে উঠেছে। মনে হয়, একটা রাম দা ঘোরাতে ঘোরাতে চলে যায়। ওদের মণ্ডুগুলো ফাটিয়ে দিয়ে আসে।

রানীমা আসুক, এর একটা বিহিত করতে হবে। যা খুশি তাই করবে নাকি? আমরা কি নুলো হয়ে গেছি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁপাতে হাঁপাতে আজিজ এসে ঘরে ঢোকে। আজমলের খবর ও বাজারে বসে পেয়েছে। বিশ্বাসই করতে পারছে না যে, এমনটি ঘটতে পারে। ও আজমলের কপালে হাত রাখে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

এই আজমল—

ও সাড়া দেয় না। কাঁথার নিচে ওর শরীর পুড়ে যায়।

থাক, ঘুমুতে দেন।

হরেকের কণ্ঠ থেকে আক্রোশ ছিঁড়ে-খুঁড়ে বেরিয়ে আসে। আজিজ চৌকির একধারে বসে।

শুনলাম এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে পুলিশ খুব জুলুম করছে।

হ্যাঁ, চারদিক থেকে পুলিশের নির্যাতনের খবর আসছে। একবার বাগে পেলে হয়। দুচারটা মেরে নিজে মরব।

হরেক আজমলের মাথায় জলপট্টি দেয়। টুটু হারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। বাইরে রাত নামছে। স্বেচ্ছাসেবকরা পাহারা দিচ্ছে ক্যাম্পে। একে একে এ-ও এসে পৌঁছে ক্যাম্পে। ভগিরথের ঘটনা বলে হেড়ম্ব, ওর দুচোখ উদ্দীপিত। সাঁওতাল নারী-পুরুষে ভরে গেছে প্রাঙ্গণ। ওরা গায়ে গা লাগিয়ে বসেছে। এখন হেমন্ত, রাতে কুয়াশা পড়ে। কুয়াশায় ভিজে থাকে ধানের স্তূপ। আজিজ উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে, হরেকও। টুকু বসে আছে আজমলের কাছে, ওর জ্বর কমে আসছে।

কিছুক্ষণ পর ইলা আসে, চাদর দিয়ে মাথা ঢাকা। সঙ্গে পাঁচ-ছয়জন যুবক। ওদের হাতে লণ্ঠন। ওরা সেটা এককোণে রেখে বসে পড়ে সবার সঙ্গে। পুলিশের খবর শুনে গুম হয়ে তাকে ইলা। আজাহার হোসেন আসে খানিকক্ষণ পর। তারও মুখে এক কথা, চারদিক থেকে পুলিশের নির্যাতনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। তখন অন্ধকার ছিন্ন করে গভীর-গম্ভীর কণ্ঠে ইলা মিত্র ফুঁসে ওঠে, প্রতিরোধ করতে হবে। জুলুমের প্রতিশোধ চাই।

প্রতিশোধ চাই।

কণ্ঠ তীর হয়ে বিঁধে থাকে কালো মানুষের হৃদয়ে। ওরা উস্‌খুস করে। মৃদু গুঞ্জন ওঠে। আজাহার হোসেন স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব নিয়ে কথা বলে। সবাই দায়িত্ব সচেতন। পার্টির নির্দেশে কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। সব কিছুই সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। আজাহার হোসেনের কথা শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে আবার সেই 'প্রতিশোধ চাই' শব্দের তীর দ্বিগুণ হয়ে ওদের বুকে ফুঁড়ে যায়। ইলা আজমলকে দেখে এসে আবার ওদের সামনে আসে। ওরা বিপ্লবের গল্প শুনবে। কত গল্পই তো বলা হলো। ওদের তৃষ্ণা মোটে না। ইলা ঠিক করেছে, আজ ওদের প্রীতিলতার কথা বলবে। প্রীতিলতা মানে দেশপ্রেম, প্রীতিলতা মানে অধিকারের লড়াই।

সাঁওতাল ভাষা ইলার কণ্ঠে আগুনে-পোড়া কাঠের মতো পট্‌পট্‌ শব্দে ফাটে। আকাশজুড়ে ফুটে ওঠে তিরিশ সালের বাংলাদেশ—ব্রিটিশ বিরোধী বারুদে পুড়ছে। ওরা স্থির-নিশ্চল থেকে উদগ্রীব হয়ে শোনে। কালো পাথুরে মুখে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ নেই—ভেতরে চলে নিজেদের তৈরি করার ক্ষণ। বলতে বলতে ইলা মিত্র ভুলে যায় ছেলের কথা—সংসারের কথা—রামচন্দ্রপুর হাটের বাড়িটার কথা। ও এখন প্রীতিলতা। ওর শ্যামলা মুখটা তিরিশের বাংলাদেশ—ম্যালেরিয়া আক্রান্ত, নিরন্ন, হাড়-জিরজিরে অথচ সূর্যসেনের মতো হাজার যুবকের পদভারে সে মুখের খানাখন্দ, ঝোপঝাড়, মেঠোপথ, চাষাক্ষেত রক্তে-বারুদে মাখামাখি। জীবনযাপনের এই অনিয়ম ঠিকমতো খাওয়া নেই-নাওয়া নেই—রোদ্দুরে পুড়ে-পুড়ে ইস্পাত হয়েছে শরীর—শিশুপুত্রের ছবি বুকের কন্দরে লুকিয়ে রেখে বিপ্লবের উজ্জ্বল আভায় বদলে নিয়েছে নিজেকে। ইলা মিত্র বুক-উজাড় করে প্রীতিলতার গল্প বলে। অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁর ডাকে মিশে সে কণ্ঠ চণ্ডিপুর ছাড়িয়ে ছড়িয়ে যায় দূর-দূরান্তে। ওর দৃষ্টিতে আশ্চর্য সুদূরতা, কণ্ঠে বজ্রপাত-আসন্ন বিপ্লব ওর চেতনায় সমুদ্রের শত বছরের গর্জন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯

ওদের কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে খুঁটির সঙ্গে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ছেলেরা ধরে এনেছে ঝড়ু, বিপিন আর বাসুকে। ওরা গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে পুলিশে খবর দেয়। আর পুলিশ চড়াও হয় সেই সব বাড়িতে। ওরা তিনজন বেয়াড়া, অপরাধের জন্য বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই।

আজাহার হোসেন প্রথমে ওদের বোঝাতে চেষ্টা করে, গাঁয়ের লোক তোদের ভাই। বিপদে-আপদে পাশে এসে দাঁড়াবে। পুলিশ তোদের কে?

ওরা কথা বলে না। তিনজনই চুপ।

কথা বলিস না যে? মনে ধরল না বুঝি?

ওরা তবু চুপ। চোখ গোল করে তাকিয়ে থাকে। এসবে ওদের আস্থা নেই। ওরা নিয়ম ভাঙতে চায় না।—ভাঙাটা অপছন্দ করে। আজাহার হোসেন গলা চড়িয়ে বলে, জানিস, তোরা নিজেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস? তোদের লজ্জা করে না? তোরা ভায়ের বুকে ছুরি দিচ্ছিস। বল, পুলিশকে খবর দিয়েছিস কেন?

বাসু ছেড়ে ওঠে, দেব না কেন? অন্যায় করলে পুলিশকে জানব না?

অন্যায়? কোথায় অন্যায়? কিসের অন্যায়?

সমান তেজে ঝাড়ু বলে, আমরা তেভাগা মানি না। গরিব মানুষের বেশি বাড় বাড়তে নেই।

আমরা তো গরিবের হক আদায় করছি। গরিব যাতে খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে, তার চেষ্টা করছি।

আধ-পেটা থাকাই গরিবের ভাগ্য। যার জমি নাই, তার আবার পেটভরে খাওয়ার শখ কেন? ভগবান একদলকে বড়লোক বানিয়েছে, একদলকে ছোটলোক। মানুষের সাধ্য কি তা রদ করার?

আজাহার হোসেন হাঁ করে বিপিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর বাক্য ব্যয়ের ইচ্ছে হয় না। এর সঙ্গে কথা বলা বৃথা। স্বেচ্ছাসেবকদের একজনকে ডেকে বলে এদের প্রত্যেককে বিশ টাকা করে জরিমানা করা হলো। বিকেলের মধ্যে ক্যাম্পে টাকা পৌঁছে দিয়ে যাবে।

ঝড়ু তখনো তড়পায়, না দিলে?

আজাহার হোসেন রক্তচক্ষু মেলে বলে, না দিলে তার উপযুক্ত শাস্তি পাবি।

হেড়ম্ব ওদের কোমরের দড়ি খুলে দিয়ে ধাক্কা দেয়, যা ভাগ। এরপর মাথা-মুড়িয়ে, মুখে কালি মাখিয়ে সারা গাঁয়ে ঘুরিয়ে বেড়াব।

পেছন থেকে কে যেন টিটকারি করে, কাপড়টাও খুলে নেব, একদম ন্যাংটো।

ওরা একটু হকচকিয়ে যায়। তারপর মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসে। পেছন ফিরে তাকায় না। আজাহার হোসেন কাগজপত্র গুছিয়ে নেয়, আমার এখন চলে যাওয়া উচিত। তোমরা সবকিছু দেখে শুনে থাকবে। দরকার হলে সঙ্কেত উড়িয়ে দেবে।

আজাহার হোসেন চলে যায়। ছেলেরা রাঙা মিয়া, চরণ মাঝি ও এচান মিয়ার ভাগের ধান গরুর গাড়িতে তোলায়। ওগুলো চলে যাবে যার যার বাড়িতে, সঙ্গে যাচ্ছে নীতের আর দিলকে। ওদের সংগঠিত আন্দোলনে এদের টু শব্দ করার সাধ্য নেই। আজিজ কয়েকজনকে নিয়ে ধবল শ্যামপুরের জোতদারদের কাছ থেকে লিখিত জবানবন্দী এনেছে। সংগঠিত কৃষকদের শক্তিতে ভীত হয়ে ওরা তেভাগা মেনে নেয়ার পক্ষে জবানবন্দী স্বাক্ষর করেছে। আজিজ কাগজপত্র ক্যাম্পে এনে রাখে। ওগুলো আগামীকাল আজাহার হোসেনের কাছে পৌঁছাতে হবে। সাফল্যের আনন্দ আজিজকে আবেগতাড়িত করে। ও গুনগুনিয়ে গান গায়। আজমল সুস্থ হয়ে উঠেছে। ওদের সঙ্গে কাজ করছে। ও আর বাড়ি ফিরে যাবে না। আজিজ ওর পিঠ চাপড়ে বলে, দেখ আজমল নীলামপুরের বরিন মাণ্ডল জরিমানার টাকা দিয়ে গেছে। ব্যাটা মস্ত ঘোড়েল। বদমাশিতে সেরা। এখন আর আমাদের সঙ্গে পারবে না। ওকে এভাবেই ঠিক রাখতে হবে। ওরা দেখতে পায়, দুই গরুর গাড়ি বোঝাই ধান নিয়ে অনিমেষ লাহিড়ী আসছে। সঙ্গে হৈ-হৈ করে আসছে একদল ছেলে। অনিমেষ লাহিড়ী হেসে ওদেরকে বুড়ো আঙুল দেখায়। ক্যাম্পের ছেলেরা ঝপাঝপ ধানের আঁটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠোনে নামায়। অনিমেষ লাহিড়ী বারান্দায় এসে বসে। গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

কোথা থেকে এলেন অনিমেষ দা?

জগদল গ্রাম থেকে। সূর্য আর তারিণ মাঝি আমাকে খবর পাঠাল যে মোহনলালের জমির বিশ মণ ধান পুলিশ নিতে আসছে। খবর পাওয়ার পর এক মুহূর্ত দেরি করিনি। ছুটলাম ধান আনতে। গ্রামের ছেলেরা গরুর গাড়ি ঠিক করে রেখেছিল। পুলিশ আসার আগেই আমি ক্যাম্পে পৌঁছে গেছি।

মোহনলাল তো ভারতে?

হ্যাঁ। ওর জমিজমার বন্দোবস্ত হয়নি। বাবুলালরা চাষবাস করে। চা খাবেন অনিমেষদা? টুটুকে চা করতে বলি?

বলো। আমার আবার তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।

আজিজ উঠে যায়। আজমল বিষণ্ন চোখে বসে থাকে। শরীরটা এখনো দুর্বল। অনিমেষ মমতায় ওর ঘাড়ে হাত রাখে।

শরীর এখন ভালো তো আজমল।

ও মাথা নাড়ে, ভালো।

অনিমেষ তীব্র কণ্ঠে বলে, পুলিশ এক নতুন শোষণ শুরু করেছে। এইসব দালালকে হালাল করতে হবে।

হরেক চেঁচিয়ে বলে, হ্যাঁ তাই করতে হবে। গলা কেটে কুচিকুচি করে কাক দিয়ে খাওয়াব।

অনিমেষ হরেকের দীপ্র চেহারা দেখে। তখন পেছনে স্লোগান ওঠে, দালালকে হালাল করো।

আজিজ ওদের নেতৃত্ব দেয়।

ছেলেরা ধান নামিয়ে উঠোনে স্তূপ করেছে। গরুর গাড়ি খালি হয়ে গেছে। ওদেরকে ভাড়া চুকিয়ে দিলে ওরা চলে যায়। অনিমেষ চা খেয়ে উঠে পড়ে। ওকে অনেক দূর যেতে হবে। এখন নষ্ট করার মতো সময় নেই। ও বেরিয়ে আসার পরও পেছন থেকে শুনতে পায় দালালকে হালাল করার স্লোগান।

দুপুরে কাঁঠাল পাতার ঠোঙায় সবাইকে খিচুড়ি পরিবেশন করে হরেক। চাল-ডালের খিচুড়ি মাত্র, আর কিছু নেই। খিদের মুখে তা অপূর্ব লাগে। সবাই এক নিমেষে খেয়ে ফেলে, কারো মুখে কথা নেই। খাবার নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিযোগ নেই। এ এমন এক সময়, যখন এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। যে যার ঠোঙা হাতে করে দূরে ফেলে আসে। টুটু আজমলের জন্য তারা মাঝির বাড়ি থেকে এক ভাঁড় ছাগলের দুধ এনেছে। একটু দুধ না খেলে ওর শরীরটা তাড়াতাড়ি সারবে না। ও আজমলকে ভাঁড় দেয়।

খাও।

আজমল প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলে, না, না, আমি খাব না।

খাও। মাতলার হুকুম। শরীরটা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত রোজ দুধ দিতে বলেছে।

আমি ঠিক হয়ে গেছি।

কে বলল? এখনো তোমার মাথা ঝিমঝিম করে।

মিথ্যে কথা।

বাজে বোকো না। মুখ দেখলেই বুঝতে পারি।

টুটু রেগে ওঠে। আজিজ ওকে থামিয়ে দিয়ে আজমলকে বলে, খেয়ে ফেল, মিছেমিছি তর্ক করছিস। সর্দারের হুকুম একটুও এদিক-ওদিক হবে না।

আজমল আর কোনো কথা না বলে টুটুর হাত থেকে ছোঁ মেরে ভাঁড়টা নিয়ে এক চুমুকে দুধ খেয়ে ফেলে। আজিজ হাসতে থাকে, টুটু রেগে গেলে ওকে কিন্তু ভীষণ দেখায়। আমারই ভয় করে।

টুটু গম্ভীর, মুখে কথা নেই। আজমলের হাত থেকে ভাঁড়টা ফেরত নেয়। তারপর হরেককে জিজ্ঞেস করে, রানীমা কখন আসবে হরেক?

আজ আসবে না। রানীমা এখন চণ্ডিপুরে নেই।

মানে?

টুটু অবাক হয়।

রাতদুপুরে রানীমা বারো মাইল পথ পেরিয়ে চলে গেছেন।

কোথায় গেছেন, তা ওদের বলতে নেই। টুটুও জিজ্ঞেস করে না। ও জানে, দু-একদিনের মধ্যে আবার ফিরে আসবেন। আত্মগোপনে আছে বলে এমন করে জায়গা বদল করতে হয়। কখন, কোথায় থাকবে, আগে থেকে তার কোনোকিছুই ঠিক থাকে না।

টুটু আর হরেক কথা বলতে বলতে চলে যায়। ক্যাম্পের পেছনে ছেলেরা বর্শা ছোঁড়া শিখছে, ওরা ওখানে গিয়ে বসে। আজিজ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল ধানের গাদার পাশে দাঁড়ায়। আজমল বিড়বিড় করে, রাতদুপুরে বারো মাইল পথ হেঁটে পেরিয়ে গেল?

তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। দিন নেই, রাত নেই, পেটে ভাত নেই, চুলে তেল নেই, চোখে ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, তিনি সবই পারেন।

কেমন করে?

মানুষের বিশ্বাস অটল হলে আর সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। বিশ্বাস মানুষকে অলৌকিক শক্তি দেয়। এ যে কী শক্তি, আদর্শে নিবেদিত না হলে, তা বোঝা যায় না। জানিস, এই তো মাস দুই আগের কথা, রানীমা পুলিশের বেড়াজাল এড়াতে নদী সাঁতরে চলে গিয়েছিল অনেক দূর। কখনো বিশ পঁচিশ মাইলও হেঁটে চলে গেছে। তাঁর কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে রে। যা বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে আপস নেই। মানুষের জন্য এমন ভালোবাসা হৃদয়ের গভীর থেকেই উঠে আসে। সব সময়ই কি বলে জানিস?

কি?

কৃষকদের অবস্থার উন্নতি না করা পর্যন্ত শান্তি নেই।

আজমলের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যায়। মানুষ এমন পারে, এ ওর অভিজ্ঞতায় নেই। বেশি কিছু ভাবা ওর সাধ্যের অতীত। শুধু এটুকু বোঝে যে, এদের সঙ্গে এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া ওর প্রাণের টান। ও বুঝতে পারছে এই শোষণ এবং নিপীড়নের প্রতিকার হওয়া দরকার। ওর দরদ এবং ভালোবাসা অকৃত্রিম—এই টানটুকু নিয়েই ও ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ও নিজেকে মুক্ত মানুষ করেছে, ওর আর পিছুটান নেই।

ইলা পার্টির জরুরি সভা শেষ করে পথে নামে। বাইরে ঘুরঘুটি রাত, মেঠো পথ, খানাখন্দে পা পড়ে যেতে পারে, তবু ও আজ ছেলেকে দেখতে যাবে। কতদিন দেখতে যাওয়া হয়নি। দিনে তো সম্ভব নয়। রাতে গিয়ে ভোরের আগেই ফিরে আসতে হবে।

রমেন বলে, আজ অমাবস্যা, আজ থাক। কাল না হয় যাব। মেঠো রাস্তায় হাঁটতে পারবে না।

শব্দ করে হেসে ওঠে ইলা।

তোমার মন চাইছে না, সেটা বল। পথের ভয় দেখাচ্ছ কেন আমাকে? কতভাবে কত পথই তো পেরুলাম। ছেলের জন্য এটুকু পারব না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইলার কণ্ঠে কিছুটা অভিমান ধ্বনিত হয়। কতদিন ছেলেটিকে দেখা হয়নি। বুকের ভেতর এক নিঃশব্দ স্রোত গত দুদিন থকে প্রবাহিত হচ্ছে। বারবারই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সবকিছু—ভাবতে গেলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সবকিছু থেকে—জোড়া লাগাতে পারে না আর। মনের এই অবস্থা দূর করার জন্য ছুটে গিয়ে বুকে তুলে নিতে ইচ্ছা করে সেই ক্ষুদ্র মানবশিশুটিকে, যে তার অস্তিত্বের অংশ, যাকে দেখলে ভুলে যাবে সব শ্রম এবং ক্লেশ।

তুমি রাগ করেছো ইলা? আমি অত ভেবে বলিনি। আজ অমাবস্যা। মেঠোপথে দিনের বেলাতেই হোঁচট খেতে হয় কি না?

রমেন মৃদু হাসিতে বিব্রত অবস্থা থেকে পার হতে চায়। ওর চাইতে কে আর বেশি চেনে ইলাকে? কষ্টসহিষ্ণু ইলা, বিয়ের পরে এখানে সে নিজের শ্রমেই তো মানুষের বুকের মাঝে গিয়ে পৌঁছেছে। এই দীর্ঘ পথ পাড়ি কি এমনিতে হয়েছে?

ইলা চুলের খোঁপায় কাঁটা গুঁজে দেয়, গুলো আর পিঠ বেয়ে ছড়িয়ে পড়বে না। শাড়িটা পায়ের গোড়ালি থেকে একটুখানি ওপরে উঠিয়ে পরে, কোমরে আঁচল গুঁজে নেয়। তারপর সহজভাবে বলে, চল।

নির্দেশ নয়, অনুরোধ নয়, শুধু এক আহ্বান। ধক্ করে ওঠে বুক। এ আহ্বান তো উপেক্ষার নয়। আবহমান বাংলার মায়েরা নিজের রক্তাক্ত হৃদয় দিয়ে আড়াল করেছে তার সন্তানদের, এ আহ্বান সেই পথঘাটের ওপর দিয়ে ছুটে এসে স্পর্শ করে রমেনকে। ও অভিভূত কণ্ঠে বলে, চল।

জিতেন আর বিপুল ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ওদের হাতে বাঁশের মোটা লাঠি আর হারিকেন। ওরা আগে আগে হাঁটছে। হারিকেনের ক্ষীণ আলো পথের ওপর দুলছে। অনেক দূর থেকে দেখলে মনে হবে, একগুচ্ছ জোনাকি যেন খোলা মাঠের বাসন্তী হাওয়ায় নৃত্যরত। জিতেন আর বিপুল মৃদুস্বরে কথা বলছে, কখনো চাপা হাসিতে হেসে উঠছে। রমেন ইলার হাত ধরে রেখেছে। অনেকিদন পর দুজন খুব কাছাকাছি হয়েছে। পালিয়ে বেড়ানো জীবনে নাওয়া-খাওয়ারই ঠিক নেই, কথা বলার সময় কৈ কিংবা হাত-ধরে বেড়ানোর?

রমেন ইলার কানে কানে বলে, এটুকুই আমার লাভ।

ইলা অবাক হয়ে বলে কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে তোমার হাত ধরে মেঠোপথে হেঁটে বেড়ানো। যেন যুবা বয়সের দিন ফিরে পেয়েছি। ইলা ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, ওরা শুনবে।

ওরা অনেকটা এগিয়ে আছে। শুনবে না। আর শুনলেই-বা কি? ওরা জানুক—

আহ্!

ইলা রমেনকে কথা বলতে দেয় না। রমেন মুখ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, এমন করে প্রাণের আবেগ রুদ্ধ করে দেয়া কি ঠিক?

ইলা শব্দ করে হেসে উঠলে থমকে দাঁড়ায় জিতেন আর বিপুল।

আমরা কি বেশি এগিয়ে গেছি রানীমা?

না না, ঠিক আছে। তোমরা যেভাবে যাচ্ছিলে, যাও।

তবে হাসিলেন যে?

এমনি, অন্য কথা বলছিলাম।

ওরা আবার হাঁটতে শুরু করে। এখন আর কথা বলছে না। সুনসান প্রকৃতি ঝিঁঝিঁদের ডাকে শব্দমুখর। সে ডাক থেমে যায় এক সময়। তখন অন্ধকার আরো প্রগাঢ় মনে হয়। গ্রেস-এ নীরেট দেয়াল ভেদ করে আলো আসবে না, বাতাস বইবে না, বন্ধ হয়ে যাবে মানুষের কথা শোনা। রমেনের মুঠিতে ইলার হাত চেপে থাকে। মাঝে মাঝে পায়ের কাছে ইঁদুর দৌড়ে যায়।

ইলার বলতে ইচ্ছে করে, তোমরা কথা বলছো না কেন? এমন করে থেমে রইলে কেন? কিন্তু সে কথা বলতে গিয়ে ও বলে অন্য কথা, মোহন কি আমাকে চিনবে? মা বলে কি ডাকবে?

পাগল, এত তাড়াতাড়ি কথা শিখবে কি করে? মাত্র তো সাত মাস বয়স।

আমি কাছে থাকলে হয়তো মা বলতে শিখে ফেলত? আমি ওকে শিখিয়ে দিতাম। কবে আমি মা ডাক শুনব?

তোমার সাঁওতাল ছেরেমেয়েরা এ কথা শুনলে হাসবে। ইলা চুপ করে থাকে। যে প্রচণ্ড আবেগ ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তা অনুধাবনের সামর্থ্য রমেনের নেই। এজন্যই ওরা পুরুষ।

এতটা পথ এলাম অথচ কর্মসূচির কোনো কথা তুমি বললে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের রাতের এই কয়েকটি ঘণ্টা শুধু মোহনের—আমার মোহন! ওকে ছাড়া এখন আমি কিছুই ভাবতে পারছি না।

ওকে দেখার পর তুমি ফিরতে চাইবে তো ইলা?

থমকে দাঁড়ায় ও। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শুধু অনুভব করা যায় যে, খররোদের প্রবল দহন ওর দৃষ্টিতে, ও পুড়িয়ে দিতে চায় রাতের আঁধার। তীব্র কণ্ঠে বলে, তুমি এমন করে বলতে পারলে? সংগ্রাম আমার সন্তানের মতো প্রিয়। এ আন্দোলনের জন্য আমি দুধের-শিশুর মুখ ভুলেছি, সবকিছু তুচ্ছ করেছি।

রমেন বুঝে যায়, আবার ভুল হয়েছে। আজ বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। আজ কি ভুল হবার দিন? ও নিজেকে তিরস্কার করে।

রানীমা আমরা মাঠ ছেড়ে পথে উঠেছি। আর অল্পক্ষণে পৌঁছে যাব।

জানি রে। সামনে বাঁশঝাড় না? পায়ের নিচে শুকনো পাতা মচমচ করবে। তোরা ভূতের ভয় পাবি নাতো?

ইলা উচ্ছ্বল হয়ে ওঠে। ওর কণ্ঠের চঞ্চলতা ছেলেদের কানেও ধরা পড়ে।

রানীমা আপনার ভূতের ভয় আছে?

একটুও না।

তাহলে আমাদেরও নেই।

তাই তো বলি, আমরা ছেলেরা সব কাজের ছেলে হয়ে গেছে। এমনই তো চাই। দূরে বট গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে না? উহ মনে হয় দৌড়ে যাই।

রমেন অবাক হয়। এই ইলা ওর কাছে একদম অচেনা। ষোল দিনের শিশুকে মা নিয়ে যাবার পর রমেনের কখনো মনে হয়নি, ইলা ছেলের জন্য এত ব্যাকুল। অনিমেষ, বৃন্দাবন, আজাহার, ফণীভূষণ কেউ কি ভাবতে পারবে, এই বালিকা-ইলা ওদের আন্দোলনের সহকর্মী? ওদের কমরেড ইলা মিত্র? রমেনের কাছে এক নতুন দুয়োর খুলে যায়। বটগাছের মাথা দেখার পর ও রমেনের হাত ছেড়ে দিয়ে জিতেন আর বিপুলের সঙ্গে দ্রুত হাঁটছে। মুহূর্তে ও পেরেয়ি যেতে চাইছে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

শাশুড়িকে কোনোরকমে প্রণাম করে ও দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। কাঁথাসহ বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ঘুমন্ত শিশুকে।

আমার সোনা, আমার মানিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুমোয় চুমোয় ভরে যায় শিশুর গাল। রমেন আর ওর মা দুয়োরে দাঁড়িয়ে থাকে। আচমকা ঘুম থেকে জেগে কেঁদে ওঠে শিশু।

না, কাঁদে না, সোনা আমার কাঁদে না।

তারপর শাশুড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, মা ও কি হামাগুড়ি দেয়?

হ্যাঁ, দেয়। যা দুষ্ট! কেবলই এটা-ওটা ধরতে চায়। একদিন তো টেবিলের নিচে রাখা একবাটি কেরোসিন খেয়ে ফেলল।

তারপর?

আমি গিয়েছিলাম চান করতে। ফিরে এসে দেখি এই অবস্থা। চোখ লাল হয়ে উঠেছে। মোহনও কাঁদছে, বাসন্তীও কাঁদছে। তারপর আমি তাড়াতাড়ি তেঁতুল-গোলা পানি খাইয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গেল।

অসুখ করেনি তো?

না, কিচ্ছু না। তোমার ছেলে দারুণ শক্ত।

রমেন হাসতে হাসতে বলে, আন্দোলন করতে পারবে মা?

তুই পারছিস, তোর ছেলে কি আর পারবে না?

দুধ ঠিকমতো খায় তো মা?

হ্যাঁ, লক্ষ্মী ছেলের মতো দুধ খায়। দুধ খাওয়ার বাটি আর ঝিনুক দেখলে তো হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। আর গল্প বলতে হয়, ছড়া বলতে হয়, গান গাইতে হয়। এসব না করলে তোমার ছেলে ঠোঁট উল্টে মান করে বৌমা।

ইলা অবাক হয়ে ওর বুকের মানুষটির গল্প শোনে। ও কেঁদে-কেটে আবার ঘুমিয়ে গেছে। চোখে কাজল টানা, কপালের ডান পাশে বড় করে কালো টিপ দেয়া, মাথাভর্তি চুল কী যে মায়াবী, কী যে অপূর্ব! দেখে দেখে আশ মেটে না ওর।

চল বৌমা দুটো খেয়ে নেবে তোমরা। বাসন্তী সব আয়োজন করেছে। ওকে শুইয়ে দাও।

না মা আমার কাছে থাক। আমি ওকে কোলে নিয়ে খাব।

রমেন উঠোন পেরিয়ে হাত-মুখ ধুতে যায়। ভুপেন জিতেন বিপুলকে বাইরের ঘরে খেতে দিয়েছে। হঠাৎ করে আসা। আয়োজন তেমন নেই। ভাত-মাছ যা রান্না ছিল, তাই দেয়া হয়েছে ওদের। ভোর রাতে উঠে ওরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার চলে যাবে। খেয়েদেয়ে একটুখানি গড়িয়ে নিতে হবে। এতটা পথ হেঁটে এসেই কি আর চলে যাওয়া যায়? কিন্তু ইলার যেন ক্লান্তি নেই। ওর শাশুড়ি যতকিছুই ভাবুক না কেন, ও একদম মগ্ন হয়ে থাকে। ওর পথের ক্লান্তি উবে গেছে, শরীরে এখন অফুরন্ত শক্তি। ওর শাশুড়ি বুঝে যায় যে, ইলার এখন ওর কথা শুনতে ইচ্ছে করছে। সে ভাবেই কথা বলে, জানো তোমার ছেলেকে যখন ঘুম পাড়ানোর জন্য পায়ের ওপর রেখে দোলাই, তখন একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর নিজের ডান হাতের আঙুল চোষে। পাশে নিয়ে বিছানায় শুলে তো কথাই নেই। কেবল হাঁ-হুঁ করে, যেন কত কথা বলতে চায়। দাও, ওকে আমার কাছে দাও। আমি কোলে নিয়ে বসি, তুমি দুটো খাও।

কতদিন যে আপনার হাতের রান্না খাইনি মা।

ইলা পিঁড়ির ওপর বসে থালা টেনে নেয়। রমেন এসে বসে। মার হাতের রান্না মনের সাধ মিটিয়ে খায়।

মোহনকে ভাত দিয়েছেন মা?

তা আবার দেইনি। চালে-ডালে আলুতে মিশিয়ে সেদ্ধ করে মুখে দিলে ঠেলে বের করে দেয়। একটুও খেতে চায় না। অনেক ঝাপটা-ঝাপটি করে একটুখানি খাওয়াতে পারি। পানিতে সেদ্ধ করে ডিমের কুসুম দিলে চুক্‌চুক্ করে খায়। কত কাণ্ড যে করে তোমার ছেলে যে হেসে বাঁচি না!

ইলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে শোনে। ওর খাওয়া থেমে যায়। একদৃষ্টে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অনেক সময় হামা দিয়ে খাটের নিচে চলে যায়। খুঁজে পেতে কী যে ঝামেলা হয়! আমার কি একমুহূর্ত চোখের আড়াল হবার জো আছে!

রমেন হেসে ওঠে, তোমার নাতি তোমাকে দখল করে ফেলেছে। বুঝেছি আমার আর জায়গা নেই। একবারও তো সেধে কিছু তুলে দিলে না?

শোনো ছেলের কথা! নিজের সঙ্গে রেষারেষি।

রমেন হো-হো করে হেসে ওঠে। ইলাও। গল্পে গল্পে ভাত খাওয়া শেষ। ইলা ছেলেকে বুকের কাছে নিয়ে শুয়ে থাকে। ঘুম আসে না, দাঁতের নিচে মৌরি চিবোয়। রমেন ঘুমিয়ে গেছে। নাক-ডাকার মৃদু শব্দ শোনা যায়। কত সহজে ঘুম এসে গেল রমেনের। ইলার বুক ভার হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একটু পর এই ক্ষুদ্র মানবটিকে রেখে চলে যেতে হবে। আবার কবে দেখা হবে, জানে না। ওর চোখ ভিজে ওঠে।

ভোর রাতের দিকে জেগে গিয়ে কেঁদে ওঠে মোহন। ইলার একটু তন্দ্রার মতো হয়েছিল। কান্নার শব্দে ও ধড়মড় করে উঠে বসে। জেগে যায় রমেনও। বলে, ও কি করে বুঝল যে, এখন আমাদের যেতে হবে?

আহ্ বল না।

ইলা অস্ফুট আর্তনাদ করে। ছেলেকে বুকে নিয়ে কান্না থামানোর চেষ্টা করে। পাশের ঘর থেকে আসে রমেনের মা।

কি হয়েছে বৌমা? ওকে আমার কাছে দাও। ওর বোধহয় খিদে পেয়েছে। বাসন্তীকে দুধ গরম করতে বলেছি।

আমি খাইয়ে দেব।

তুমি কি পারবে? অভ্যেস নেই তো।

পারব মা, আমি পারব।

শাশুড়ি চলে গেলে ও ছেলেকে নিয়ে বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়ে, আয় আয় চাঁদ মামা—চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা—কালো গরুর দুধ দেব—দুধ খাবার বাটি দেব—সোনার কপালে টিপ দিয়ে যায়। মোহনের মুখে হাসি, ও হাত-পা নেড়ে খেলে। ইলা ঝিনুকে করে ওর মুখে দুধ দেয়।

রমেন পাশে বসে হাসে। মনে হয়, দুধ খাওয়া হলেই ও তোমাকে মা বলে ডেকে ফেলবে।

দেখো ফাজলামো করো না।

মিথ্যা বলছি নাকি? ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।

হয়েছে থাম।

তুমি তাড়াতাড়ি করো। সময় বেশি নেই। আমি তৈরি হতে যাচ্ছি।

রমেন চলে যায়। ইলার বুক কেমন করে। ওর হাত থেমে যায়। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শাশুড়ি বলে, তুমি না হয় দুটো দিন থেকে যাও বৌমা?

তা হয় না মা।

ইলা শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, যেতে আমাকে হবেই। এখানে থাকলে ধরা পড়ে যেতে পারি। ছোট্ট ভুলের জন্য, বড় ক্ষতি কি সইবে মা?

কি জানি বাপু!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাশুড়ি অসন্তুষ্ট হয়। দুধ খাওয়া হয়ে গেলে নাতিকে নিয়ে বারান্দায় আসে। জিতেন আর বিপুল মুড়ি-গুড় খাচ্ছে, সঙ্গে এক বাটি করে দুধ। রমেন কুয়োতলা থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসেছে।

বাহ, ও তো দিব্যি আছে দেখছি? এখন আর কান্নাকাটি নেই। তুমিই ওর মায়ের মতো মা।

যেমন ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে ও। তুই কি খাবি?

এক বাটি দুধ, আর কিছু না। ইলা কি তৈরি হয়েছে?

কথা বলতে বলতে ঘরে এসে ঢোকে ও। ইলা বলে, আমি তৈরি।

কিছু ভাবে না?

এক বাটি দুধ খাব।

শুধু?

আর কি?

ইলা ম্লান হাসে। রমেন ওর কাছে এসে দাঁড়ায়, মন খারাপ করছে?

ইলার চোখ থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। রমেন হেসে আঙুলের ডগা দিয়ে মুছিয়ে দেয়, পাগল!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরে ইলা একবারও পেছনে ফিরে তাকায় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০

আছিয়ার রেড়ি বাগানের ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে কুতুব। দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত ও। ওর হাতের মুঠিতে একগুচ্ছ মরা ঘাস। ও হয়তো কোনো কিছু আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। ও গুটিসুটি শুয়ে আছে। হাঁটু মোড়ানো, মাথা প্রায় বুকের কাছে নেমে এসেছে। ওকে প্রথম দেখতে পায় তাহের। ওর ঘুম না ভাঙিয়ে ছুটে এসে আছিয়াকে খবর দেয়। আছিয়া বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, একদম ন্যাংটো?

হ্যাঁ, একগাছি সুতোও নেই।

তাহলে কি ছেলেটা পাগল হয়ে গেল?

ওর কপাল কুঁচকে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ঘরে ঢুকে একটা পুরনো লুঙ্গি নিয়ে আসে।

তুই এটা ওকে পরিয়ে দিয়ে আয়।

তাহের দুপা পিছিয়ে যায়, আমার ভয় করে। পাগলের গায়ে অনেক শক্তি, যদি মারে?

গিয়ে দেখ না!

আছিয়া ওকে ধমকে ওঠে। তাহের লুঙ্গি নিয়ে চলে যায়। গিয়ে দেখে কুতুবের ঘুম ভেঙেছে। ও একটু আড়ালে গিয়ে পেসাব করছে। লম্বা চুল-দাড়িতে ওকে বুনা দেখাচ্ছে, তাহেরের সাহস হয় না কিছু বলার। কুতুব দুপা এগিয়ে আসতেই তাহের লঙ্গিটা বাড়িয়ে দেয়। কুতুব একটুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর লুঙ্গিটা নিয়ে পরে এবং একগাল হেসে মাথা নাড়ে। তাহেরও হাসে। ওর ভালো লাগে যে, কুতুব লুঙ্গিটা পরেছে। তাহের ওকে হাত ইশারায় ওর সঙ্গে আসতে বলে, কুতুব ওর পিছু পিছু বাড়িতে প্রবেশ করে। আছিয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুতুবকে দেখে, কুতুবের পরিবর্তনে ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো ধরনের আবেগই প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে না। কুতুব ওকে সালাম দেয়, ওর মুখ থেকে হাসি মুছে যায় না। ও বারান্দার ওপর পা ছড়িয়ে বসে, বহুদিন পর ও যেন একটা নিশ্চিত জায়গা খুঁজে পেয়েছে। এখান থেকে ও আর কোথাও যাবে না। তাহের ওর জন্য এক সানকি পান্তা নিয়ে আসে, সঙ্গে মরিচ পোড়া। পানিতে ডোবানো ভাতগুলো ও মুহূর্তে শেষ করে ফেলে। ওকে আর এক সানকি ভাত দিলে সেটাও সে খেয়ে ফেলে। ওর কোনো দ্বিধা নেই, বরং মাথা নাড়িয়ে হাসে। ওর চারপাশে লোক জমে গেছে, ওদের কৌতূহল দৃষ্টির সামনে ও হাতের ওপর মাথা রেখে বারান্দায় শুয়ে পড়ে। ও এখন ঘুমুবে। আছিয়া সবাইকে চলে যেতে বলে। মুহূর্তের মধ্যে কুতুব ঘুমিয়ে পড়ে।

আছিয়ার নিত্যদিনের কাজ শুরু হবে। দুদিন ধরে শরীর ভালো না। ডান হাতের আঙুলের গিঁটে গিঁটে ব্যথা। একে দুয়ে কাটুনিরা আসছে। ওদের জন্য গুটি সেদ্ধ করতে হবে। অথচ আজ একদম ইচ্ছে করছে না। এদিকে তমির জোলা আসবে সুতো নিতে। সপ্তাহ শেষে সুতো নিতে না পারলে ব্যবসার ক্ষতি হয়ে যাবে। ভাঙাচি দেয়ার লোকের তো অভাব নেই। ওর পিছে লেগেই আছে। শুধু খুঁত ধরতে পারে না বলে, পারলে রক্ষে ছিল না। আছিয়া বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে দাঁড়ায়। ঠাণ্ডা বাতাস ভালো লাগে। কুতুব শিশুর মতো ঘুমুচ্ছে। ওকে কি চেষ্টা করে ভালো করা যায় না? এই টাকা-পয়সা কে খাবে? কুতুবের জন্য খরচ করে দেখলে কি হয়? ও মনে মনে ঠিক করে যে, কুতুবকে নিয়ে রাজশাহী যাবে। ভালো ডাক্তার দেখাবে। ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছে। কখনো রাজশাহী যায়নি। কিন্তু পরক্ষণে দমে যায়, পাগলকে সামাল দেয়া কষ্ট। ও শুনেছে, পাগলদের গায়ে দুগুণ, তিনগুণ বেশি শক্তি থাকে। ওকে একটা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত। তাহলে আর কোথাও যেতে পারবে না। কাজটি করবে বলে ঠিক করার পরও ওর ভুরু কুঁচকে যায়, ইয়াসিন বসনি কাজটি পছন্দ করবে না। তাতে কি? ও কি ইয়াসিন বসনির হুমুকের দাস? হ্যাঁ অনেকটা তাই। আছিয়ার মন খারাপ হয়ে যায়। ও হাঁটতে হাঁটতে কুয়োতলায় আসে। নিজে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করলেও ইয়াসিন বসনির কর্তৃত্বই এই সংসারে বহাল। যে কোনো কাজই তাকে জিজ্ঞেস না করে হয় না। জিহ্বা তেতো লাগছে, ও একদলা থুতু ফেলে, বুক শুকিয়ে আছে, প্রবল পিপাসা। সুগন্ধী লোহার কড়াইয়ে পানি বসিয়েছে। রান্নাঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়া দরকার। কাটুনিরা বসে বসে গল্প করছে। সুগন্ধী ওকে ডাকছে, আম্মা, গুটি দ্যাবেন না?

আছিয়ার মনে হয়, এই থ্যাবড়া চেহারার মেয়েটির নাম সুগন্ধী রাখল কে? বাবা-মার শখের শেষ নেই। মানুষের শখ কত বিচিত্র। আহারে আমার সুগন্ধী!

আম্মা?

তুই যা, আমি আসছি।

পানির বলক উঠ্যাছে।

কেবল কথা।

আছিয়া রেগে যায়। ও মেয়েটির ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। মেয়েটির কোথাও কোনো সৌন্দর্য নেই। না হাসিতে, না চলাফেরায়, না কথা বলায়। পরক্ষণে ও ভাবল, আসলে ইয়াসিন বসনির অলিখিত কর্তৃত্বের জন্য ওর মেজাজ খারাপ।

ও মুখ ধুয়ে ঘরে আসতেই ইয়াসিন বসনি এসে হাজির। কুতুবকে দেখে রুষ্ট হয়ে ওঠে, এটা এখানে কেন? কিভাবে এলো? কোথা থেকে এলো?

আছিয়া কিছুটা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, ও যেখান থেকে আসুক, এখন থেকে এখানে থাকবে। ও ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াবে, এ আমার সহ্য হয় না।

ইয়াসিন বসনি গম্ভীর, কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বলে, পাগলকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক নয়।

ও তেমন পাগল নয়। সারাক্ষণই হাসে।

যতই হাসুক, যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কিছু ঘটাতে পারে।

আমি ওকে বেঁধে রাখব এবং রাজশাহী নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাব।

হঠাৎ এত দরদ।

ইয়াসিন বসনির কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গ। আছিয়া গায়ে মাখে না। ঘর থেকে মোড়া এনে দেয় ইয়াসিনের বসার জন্য।

ইয়াসিন গজগজ্ করে, খামখেয়ালি আর কি!

আছিয়া উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে আসে। ও একপলক কুতুবের দিকে তাকায়। ও কেমন নিঃসাড় ঘুমুচ্ছে, বোধহীন, আশাহীন, ভরসাহীন একটি মানুষ। কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। ওর জন্য কারো কোনো মমতা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনমনা হয়ে যায় আছিয়া। এতদিন পর ও কোথা থেকে এলো ওর কাছে? আহা বেচারা! অন্যমনস্ক আছিয়া ফুটন্ত কড়াইয়ে গুটি ঢালতে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। পুড়ে যায় ডান হাতের আঙুল এবং তালু। চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ে ও। ছুটে আসে সবাই।

দুপুর পর্যন্ত যন্ত্রণায় কাতরায় ও। ডিম ফেটিয়ে এবং কাঁচা আলু বেটে হাতে লাগানো হয়েছে। কবিরাজ এসে ওষুধ দিয়েছে, তাতে যন্ত্রণা কমেনি। আছিয়ার মুখ দিয়ে গোঙানি বেরোয়, লালা ঝরে, চোখ টকটকে লাল। ওকে দেখে ভয় করে ইয়াসিন বসনির। কবিরাজের মুখ শুকনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে বড় ডাক্তার আনতে বলছে। ইয়াসিন বসনি লোক পাঠিয়েছে। আজ ডাক্তার আনা সম্ভব না। ডাক্তার পেলেও কাল আনতে হবে। তাও আবার আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। ইয়াসিন আছিয়ার মাথায় জলপট্টি দেয়। ও যদি ঘুমুতে পারত, সবচেয়ে ভালো হতো। ইয়াসিনের নির্দেশে কবিরাজ বারান্দায় বসে আছে।

বিকেলের দিকে কুতুবের ঘুম ভাঙে। কেউ ওকে কিছু বলে না। ও এদিক-ওদিক তাকায়। উঠোনে লোকের জটলা। কুতুবকে উঠতে দেখে ওদের কথা থেমে যায়। কুতুব কাউকে কিছু বলে না। পা ঝুলিয়ে বারান্দায় বসে থাকে। ওর মুখে সেই হাসি। তাহের এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কিছু খাবি? ও হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কিছুই বলে না। তাহের ইশারায় মুখ এবং পেট দেখালে, ও হেসে মাথা নাড়ে, খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাহের ওকে এক খাঁচা মুড়ি আর গুড় এনে দেয়। ও প্রবল খুশিতে গবগবিয়ে খায়। গুনগুন ধ্বনি বের হয় মুড়ি চিবুনোর ফাঁকে ফাঁকে। আছিয়ার দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে জটলা আবার সরব হয় ওঠে। সেই জটলায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে ইয়াসিন। বেরিয়ে এসে ওদের ধমকে দেয় এবং চলে যেতে বলে। পরমুহূর্তে কুতুবকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, এই তাহের, এই শুয়োরের বাচ্চাকে এখন থেকে বের করে দে।

ইয়াসিনের চিৎকারে মুড়ি খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় কুতুবের। ও স্থির দৃষ্টিতে ইয়াসিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ঠোঁটে অদৃশ্য হাসির রেখা। ওর কাছে এগুতে তাহের ভয় করে। ইয়াসিন চেঁচিয়ে ওঠে, এই হারামজাদা, দাঁড়িয়ে রইলি যে?

তাহের এগুতে পারে না। কুতুবের ঠোঁটের হাসি বিস্তৃত হয়। ও এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুঠো মুড়ি মুখে পোরে। তাহেরের অবস্থা দেখে ইয়াসিন নিজেই এগিয়ে এসে কুতুবের ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয়। উঠোনের মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে যায় ও। তাহের দৌড়ে এসে ওকে উঠতে সাহায্য করে। কুতুবের হাঁটু কেটে যায়।

বেরিয়ে যা শুয়োরের বাচ্চা।

ইয়াসিন খেঁকিয়ে উঠলে, কুতুব ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে। তাহের অবাক হয়ে লক্ষ্য করে যে, ওর ঠোঁটের কোণ থেকে হাসি মিলিয়ে যায় না। ও রেড়ি গাছের ছায়ায় এসে বসে। ওর শরীর থেকে উৎকট গন্ধ আসছে। ওর হাঁটু থেকে রক্ত বেরিয়ে লঙ্গি লাল হয়ে যায়। কুতুব হাত বাড়িয়ে মটমটিয়ে রেড়ির নরম ডাল ভাঙে।

তাহের ওকে বলে, তুই এই রেড়ি বাগানেই থাক। আমি তোকে লুকিয়ে ভাত দিয়ে যাব।

ও কি বুঝল কে জানে, অকারণ মাথা নাড়ে। তবু ওর জন্য তাহেরের কষ্ট থাকে। ও কিছুতেই ইয়াসিনের আচরণ সমর্থন করতে পারে না। কিন্তু মুখে কিছু বলার উপায় নেই।

সাত দিন পর আছিয়া কিছুটা সুস্থ হয়, কিন্তু ওর হাতের চারটে আঙুল একদম অকেজো হয়ে যায়। গতকাল জ্বর বেড়েছে, শরীর অসম্ভব দুর্বল। সুগন্ধী পায়ে তেল মালিশ করছে, ঘরে আর কেউ নেই। ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠ চিন্‌চিন্ করে, কুতুব কোথায় রে?

ও কুষ্ঠে গ্যাছে কাউক বুলে ন্যাই।

কেন, তোরা ভাত দিসনি?

সুগন্ধী চুপ করে থাকে। ইয়াসিন বসনি যে ওকে মেরেছে, এ কথা বলবে কি না, বুঝতে পারে না। ইয়াসিন বাড়ির সবাইকে কুতুবের ব্যাপারে ধমকেছে। ওর সম্পর্কে কোনো কথা বলা নিষেধ।

কথা বলছিস না যে?

আছিয়ার অসহিষ্ণু কণ্ঠে চমকে ওঠে ও।

হামি জ্যানি না। তাহের বুলবার প্যারে।

সুগন্ধী মুখ নিচু করে রাখে। আছিয়া চোখ বোঁজে। কবিরাজ আসে খবর নিতে। নতুন ওষুধ দিয়ে যায়। কিছুই ভালো লাগে না আছিয়ার। সুগন্ধীর কাঁধে ভর করে বারান্দায় এসে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মাথায় তেল দিয়ে দে। পা ধুয়ে দে। তাহের কোথায়?

সুগন্ধী গামলায় করে পানি এনে পা ধুইয়ে দেয়। সাবান পায়ে মাখায়। জবাকুসুম তেল দিয়ে মাথা আঁচড়ে দেয়। গন্ধ ভুর ভুর করে সারা বাড়িতে। পলু পোকার জন্য রেড়ি পাতা কেটে মাথায় করে নিয়ে আসে তাহের, হাতে ধারালো দা। বারান্দায় আছিয়াকে দেখে পাতা এবং দা রেখে আছিয়ার সামনে এসে বসে।

কুতুব কোথায় তাহের?

আছে।

আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়।

বাড়ির মধ্যে আসতে চায় না। দিনের বেলা রেড়ি বাগানে থাকে, রাত্রি হলে পলুঘরের বারান্দায় শুতে আসে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। নিজে নিজে কথা বলে।

তুই ওকে আমার কথা গিয়ে বল। বল, আমি ডেকেছি।

তাহের ইতস্তত করে বেরিয়ে আসে। ও নিজেও জানে না, কুতুব কোথায়। তিনদিন আগে কোথায় যে উধাও হলো! বাজারের দিকে গেলে হয়তো খুঁজে পাওয়া যেত, কিন্তু হাতে এত কাজ যে, বাজারে যাবার সময় কৈ ওর? ও বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। কুতুবের জন্য ওর নিজেরও মায়া আছে, কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা নেই। এজন্য বুকে দীর্ঘশ্বাস জমে এবং বেরিয়ে যায়, তাহের আপন বুকের সঙ্গে যোঝে।

আছিয়া বিস্ফারিত চোখে নিজের হাত দেখে। চামড়া পুড়ে গিয়ে চারটে আঙুল জোড়া হয়ে গেছে। ও আর নিজের হাতে গুটি সেদ্ধ করতে পারবে না। এখন থেকে হয়তো ওর সুতোর মান পড়ে যাবে। ওর সুতো কেনার জন্য হয়তো তাঁতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে না। এসব চিন্তা করলে নিজের মধ্যে প্রবল শক্তি জেগে ওঠে। বলে, অসম্ভব, এ হতে পারে না। এখনো আমার বাম হাত আছে। ও বাম হাতটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে। উজ্জ্বল আলোয় হাতের শিরা জেগে থাকে। বড় একটা দাগ আছে হাতের তালুর উল্টো দিকে। ছোটবেলায় প্লাস্টিকের চুড়িতে আগুন লেগে ওখানে একটা বড় ক্ষত হয়েছিল। শুকোতে সময় লেগেছিল। এখন দাগটা দেখলে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য হাসি পায়। কিন্তু ডান হাতটা? এটা এত আকস্মিক দুর্ঘটনা যে, ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে। এ ক্ষতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুষিয়ে নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টায় ও মানসিক দিক থেকে মরিয়া হয়ে ওঠে।

তিনদিন পর ভোরবেলা কুতুব এসে হাজির হয়। মুখে সেই হাসি, প্রথম দেখায় ধক্ করে ওঠে আছিয়ার বুক। কুতুব এদিক-ওদিক তাকিয়ে আগের দিন যেখানে বসেছিল, সেখানে গিয়ে বসে পড়ে। আছিয়া, ওকে হাত ইশারায় কাছে ডাকে, ও সে ডাক উপেক্ষা করে পা ঝুলিয়ে দিয়ে দোলাতে থাকে। তাহের পলুর জন্য রেড়ি পাতা কাটতে গেছে, অন্য কাজের ছেলেরা কুতুবের কাছাকাছি হতে সাহস পায় না। সুগন্ধী তো ওকে দেখলে উঠোনেই নামে না। আছিয়া ওদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে, সব পাগল এক রকম নয়, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না। ওর মন খারাপ হয়ে যায়। ও দূর থেকে কুতুবকে নিরিখ করে। তখন বিকেল শেষ, সন্ধ্যার শুরু। তাহের পাতা নিয়ে ফিরে আসে। কুতুব ওর পিছু পিছু পলুঘরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। তাহের দা আর পাতা বারান্দার ওপর ফেলে কুতুবের সামনে এসে দাঁড়ায়। হাতের ইশারায় মুখ আর পেট দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, খিদে পেয়েছে কি না? ও ঘাড় কাত করে। তাহের আছিয়ার কাছে খাবার আনতে যায়। কুতুব বারান্দায় বসে দা নাড়াচাড়া করে, জিনিসটা ওর পছন্দ হয়। একবার চুমু খায়, একবার গালে ঠেকায়, কোথায় রাখবে, কি করবে, বুঝতে পারে না। হঠাৎ করে ধারালো দায়ে ওর আঙুল কেটে যায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটা দেখে ও হতভম্ব হয়ে থাকে, ও আঙুল দিয়ে সে রক্ত দায়ের গায়ে মাখায়। এই মাখানো ওর কাছে খেলার মতো মনে হয়। আঙুল কাটার যন্ত্রণার চাইতে খেলা ওর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। তাহের ফিরে এলে সেই রক্তমাখা দা ও তাহেরকে দেখায়। তাহেরের বুক কেঁপে ওঠে। সেই নির্বোধ হাসি ওর ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকে। কিন্তু দায়ের পশ্চাৎভাগে কুতুবের মুখ এবং হাসি তাহেরের কাছে আর নির্বোধ মনে হয় না। ও কুতুবের দিকে মুড়ি-ভর্তি খাঁচা এগিয়ে দিলে কুতুব দায়ের মাথা দিয়ে সেই খাঁচা উল্টে দেয়। বারান্দায় মুড়ি ছড়িয়ে যায়। খাঁচা ফুটো হয়ে দায়ের মাথায় গেঁথে থাকে। কুতুব সেটা নিয়ে উঠেনে নেমে যায়। ইতস্তত ঘোরে। এক কোপে পেয়ারা গাছের ডাল কাটে। গরু-বাছুর এবং ছাগলের দড়ি কেটে দিয়ে এগুলোকে ভাগিয়ে দেয়। কুয়োর বালতির দড়ি কেটে সেটাকে কুয়োয় ফেলে দেয়। রান্নাঘরের বারান্দায় শুয়ে থাকা বেড়ালকে ধাওয়া করে। ওটা তিন লাফে পালিয়ে গেলে দা হাতে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় মুরগির পেছনে ছুটতে থাকে। আছিয়া ওকে বারান্দা থেকে ডাকে, ও কুতুব কি করছিস? এদিকে আয়? ও কুতুব, বাবা সোনা এমন করে না?

কুতুব তখন নেশার ঘোরে দৌড়াচ্ছে। সারা বাড়িতে ও একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে। দা হাতে বলে ওকে আর শান্ত, নিরীহ মন হচ্ছে না। কাজের দুতিনজন লোক রান্নাঘরে আড়ালে লুকিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে। পুলঘরের বারান্দা থেকে নামতে সাহস পায় না তাহের। সুগন্ধী আছিয়ার আড়লে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁদছে। হাঁস-মুরগিগুলো খোপে না ঢুকে উঠোনময় ছুটাছুটি করছে। গরু-ছাগলগুলো সমানে চেঁচাচ্ছে। দায়ের কোপে ধরাশায়ী হয়েছে তিন-চারটে হাঁস। লণ্ডভণ্ড এই অবস্থায় ইয়াসিন বসনি সদরে এসে দাঁড়ায়। আছিয়া ওকে দেখে ছুটে নেমে আসে।

ও যে কি পাগলামি শুরু করেছে!

ইয়াসিন রক্তচক্ষু মেলে কুতুবকে দেখে। দাঁত কিড়মিড় করে, শুয়োরের বাচ্চাটাকে আজ শেষ করে ছাড়ব।

কুতুব দা হাতে ওর দিকে ছুটে আসে। ইয়াসিন ভয় পায় না। ইচ্ছে চুপচাপ থেকে আচমকা ঘায়েল করা। তবু ওকে আসতে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, খবরদার! খবরদার!

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ও তীরের মতো ছুটে এসে সাঁই করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তারপর পেছন থেকে ইয়াসিনের ঘাড়ে একটা কোপ বসিয়ে দেয়। ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয় না, চামড়ার সঙ্গে ঝুলতে থাকে। গড়িয়ে-পড়া ইয়াসিনকে ও একবার দেখে মাত্র। তারপর রক্তে ভেসে যাওয়া মাটির ওপর দাটা ছুঁড়ে মারে।

আছিয়া অজ্ঞান হয়ে গেছে। কাজের লোকগুলো ছুটে আসছে। কুতুব ধীরে সুস্থে বারান্দার ওপর এসে বসে। ওর পায়ে রক্ত লেগেছে। মাটিতে ঘষে সে রক্ত মুছে ফেলার চেষ্টা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১

মাতলা সর্দারের শূন্য উঠোন ঝকঝকে তকতকে, ধানের স্তূপ নেই। ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে চলে গেছে বাড়ি-বাড়ি। ক্যাম্পের বারান্দায় আছে স্বেচ্ছাসেবীরা। আজ এখানে জরুরি সভা। নাচোলের বিভিন্ন এলাকা থেকে পার্টির নেতারা আসবে, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করা হবে।

স্বেচ্ছাসেবীরা চাদর দিয়ে কান-মাথা ঢেকে রেখেছে। শীতের রাত, হাত-পা হিম হয়ে যায়, ঘন কুয়াশা চারদিকে, অন্ধকার ছাড়া কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়। চারদিকে শেয়াল ডাকছে তার স্বরে, শব্দ বড় বেশি তীক্ষ্ণ, কানের ভেতর ঢুকে মাথা ঝিম করে দিচ্ছে। রুষ্ট কণ্ঠে আজমল বলে, জানোয়ারগুলো নাচোল থানার পুলিশের মতো। ইচ্ছে করছে পায়ের নিচে গলাটা চেপে ধরি। অন্যরা কোনো কথা বলে না। ঘরে ইলা শুয়ে আছে। সবাই এলে উঠবে।

প্রথমে বৃন্দাবন সাহা আসে। সঙ্গে চারজন স্বেচ্ছাসেবী, ওদের হাতে বল্লম। বৃন্দাবন সাহার গায়ে খদ্দরের চাদর, মাফলার দিয়ে কান-মাথা জড়ানো। গলায় খুসখুসে কাশির রুমালের মধ্যে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, হঠাৎ করে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। শরীরটা ভালো নেই।

বৃন্দাবনের গলা শুনে বেরিয়ে আসে ইলা, জ্বর আসেনি তো বৃন্দাবন দা?

না, জ্বর আসেনি, কাশিটাই মারাত্মক।

ওষুধ খাননি?

সময় কোথায় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার? যে বাসায় আছে, ওরা তুলসি পাতার রসে মধু মিশিয়ে দেয়। খেলে বেশ অনেকক্ষণ ভালো থাকি। তারপর আবার শুরু হয়।

ইলা হাসতে হাসতে বলে, কাশিটা তাহলে আপনার সঙ্গে বেশ লুকোচুরি খেলছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক রকম তাই।

বৃন্দাবন কাশতে কাশতে জবাব দেয়।

একে দুয়ে এসে পৌঁছুল অনিমেষ, শেখ আজাহার, ফণীভূষণ, রমেন মিত্র, অজয়, শিবু কোড়ামুদি, মাতলা সর্দার, বাদল, চিত্ত চক্রবর্তী এবং আরো কেউ কেউ। এদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবীরা ক্যাম্পের চারদিকে পাহারায় চলে গেছে। কুশল বিনিময়ের পর শুরু হয় কথাবার্তা। বৃন্দাবন কেশে নিয়ে বলে, এদিকের খবর সব ভালো তো? আমি তো ওদিকে অনেক এলাকা ঘুরে এলাম। ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুরের কোনা জায়গা বাদ রাখিনি। কৃষক-সভার সবার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। ওরা একবাক্যে জানাল এখন আর তেভাগা আন্দোলন শুরু করে লাভ নেই। অনেকেই বলল যে, এই মুহূর্তে কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামের যে লাইন নিয়েছে, তাও সঠিক নয়। ওদের ধারণা, এতে হিতে বিপরীত হবে।

যেমন? ইলা মিত্র প্রশ্ন করে।

যেমন জনগণ এখন সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়।

বাধা দেয় রমেন মিত্র, না, এ কথা ঠিক নয়। আমরা জানি, নাচোল থানা এখন অনেকটা মুক্ত এলাকা। এখানে জোতদার-জমিদারদের শিরদাঁড়া নুইয়ে দেয়া হয়েছে। ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে চলাফেরা করে। প্রকাশ্যে কোনো কিছু করার সাহস নেই। বরং তেভাগা আন্দোলনকারী কৃষক স্বেচ্ছাসেবীরা প্রকাশ্যে চলাফেরা করে, অন্যায়ের প্রতিবাদে সক্রিয় হয়ে ওঠে। গড়ে চার থেকে পাঁচশো স্বেচ্ছাসেবী চণ্ডিপুরে এই প্রধান ক্যাম্পে খাওয়া-দাওয়া করে। পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। সবাই প্রবলভাবে কাজে আগ্রহী। কখনো কোনো গোলমাল হয় না। এই সুশৃঙ্খল বাহিনী নিয়ে আন্দোলন এখন হবে না তো, হবে অন্য সময়? পার্টির সিদ্ধান্তই সঠিক বলে আমি মনে করি।

শেষের দিকে রমেন কিছুটা উত্তেজিত স্বরে কথা বলে। ওকে সমর্থন জানায় শেখ আজাহার, আমারও মনে হয় রমেন ঠিকই বলেছে। এখনই সময়। বিশেষ করে গোটা নাচোলের ষাট ভাগেরও বেশি সাঁওতাল কৃষক। প্রথম তেভাগার বীজ ওদের মধ্যেই রোপিত হয়েছে। মাতলা সর্দারের নেতৃত্বে ওরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। মাতলার কথা ওরা মন্ত্রের মতো মানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধা দেয় অনিমেষ, এসব সবই সত্যি, আমি কোনোটাই অস্বীকার করছি না। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রাম করার মতো অস্ত্র কই আমাদের? বন্দুকের সামনে আমরা কি দিয়ে লড়ব? আমাদের সম্বল তো তীরধনুক, বল্লম, বর্শা আর লাঠি-সড়কি?

পেছন থেকে কে যেন বলল, ভয় পাওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। আমরা ভয় পাই না।

বৃন্দাবন দৃঢ় গলায় বলে, ভয়ের কথা নয়। কথা হচ্ছে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সময়-অসময় নিয়ে।

সময় তৈরি করে নিতে হয়। সময়ের অপেক্ষা মানে কি? কেউ কি সময় হাতে তুলে দেয়?

বৃন্দাবন বাধা দেয়, কিন্তু এটাও আমাদের দেখতে হবে যে, হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘদিনের গড়ে তোলা আন্দোলন যেন নষ্ট না হয়।

রমেন ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, আন্দোলন আমরা সবাই প্রাণের মমতায় গড়ে তুলেছি। আমরা একে নষ্ট করতে চাই না। বরং যারা পার্টির রণদীভে লাইনকে হঠকারী বলছে, তারাই আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসতে চাইছে।

ঠিক, ঠিক।

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে। বৃন্দাবন, অনিমেষ চুপ করে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক আন্দোলনের পক্ষে। ওরা দুজন এদের সঙ্গে পারবে না। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নেয়াই ভালো। তবু এরা কিছুটা দ্বিধায় থাকে, আশঙ্কা তাড়াতে পারে না। রমেন উত্তেজিত ভাষায় বক্তৃতার ঢঙে কথা বলছে, ও সেই বন্ধুদের সমালোচনা করছে, যারা পার্টির গৃহীত সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনকে হঠকারী এবং আত্মঘাতী বলে সমালোচনা করেছে। ও বলে, যারা এমন কথা বলছে, তারা বিশ্বাসঘাতক। তারা আন্দোলনের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় অধিকার আদায়ের সাফল্য। এই মুহূর্তে আমরা যদি পিছিয়ে থাকি, তাহলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। মুসলিম লীগ সরকার আমাদের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালাচ্ছে। ওরা বলছে, সব কম্যুনিস্ট হিন্দু। হিন্দুরা ভারতের দালাল। ওরা জনগণকে এভাবে বিভ্রান্ত করে আমাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছে। এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণাকে আমাদের রুখতে হবে এবং এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথই হলো সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া।

আবার সমবেত ধ্বনি ওঠে, ঠিক, ঠিক।

শেখ আজাহার রমেনকে জোর সমর্থন জানায়, রমেন যথার্থ বলেছে। মুসলিম লীগ সরকার সাম্প্রদায়িক ধুয়া তুলে কথা বলছে। এ একটা বিপজ্জনক দিক। অশিক্ষিত মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার পথ থাকে। কিন্তু আমাদের উচিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ মনোভাবকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। এর জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

রমেন উঁচু গলায় বরে, বৃন্দাবন তুমি কি বলো?

সংখ্যাগরিষ্ঠের মত তো অবশ্যই আমাদের মানতে হবে। কর্মসূচি যা গৃহীত হবে, সেটা আমরাও মানব।

অনিমেষ?

আমারও তাই মত।

রমেন মিত্র বলে, যদিও আমরা আত্মগোপন করে কাজ করছি, তবে মুসলিম লীগ সরকার এখনো কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। কিন্তু এটাকে বড় করে দেখার কোনো কারণ নেই। ওরা যে সর্বনাশ করছে, সেটা হলো সাম্প্রদায়িক ধুয়া তুলেছে। এটা পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার চাইতে শতগুণ বেশি মারাত্মক। তাই আমাদের এখন কর্মসূচি নির্ধারণ করার সময়।

স্বেচ্ছাসেবীদের কণ্ঠ গমগম করে ওঠে, বলে আমরা কি করব?

এবার ইলা মিত্রের কণ্ঠ শোনা যায়। অনেকক্ষণ পর ও কথা বলে, আমন ধান পাকার সময় হয়ে এসেছে। আমাদের প্রথম কর্মসূচি হবে, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নাচোলের সর্বত্র একসঙ্গে আমন ধান কেটে আমাদের দখলে নিয়ে আসা।

ঠিক, ঠিক কথা।

সবাই একবাক্যে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।

রমেন দৃঢ়কণ্ঠে বলে, তাহলে এই খবর ঘরে ঘরে পৌঁছে দাও সবাই।

বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায় স্বেচ্ছাসেবীরা। আজিজ বলে, কিষাণের শাণিত কাস্তে আরো শাণিত হোক।

ধ্বনি ওঠে, হোক হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একে একে চলে যায় সবাই। এখন আর শেয়ালের ডাক নেই। রাতের মধ্যযাম, আকাশে নক্ষত্র। মেঠো পথে হেঁটে যায় মানুষ।

বাকি রাতটুকু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায় ইলা। যেন প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর প্রবল প্রশান্তি। ছেলেকে স্বপ্ন দেখে-কোলে নিয়ে কাঁসার বাটিতে দুধ খাওয়াচ্ছে। কখনো শিশুটি হাত দিয়ে ফেলে দেয় দুধ। ইলার কণ্ঠে ঘুমপাড়ানি গান।

কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য নেতারা একেকজন একেকদিকে চলে গেছেন। নাচোলে শুধু ইলা একা। রমেন মিত্র, মাতলা সর্দার এক জায়গায়, শেখ আজাহার, অনিমেষ লাহিড়ী আরেক জায়গার দায়িত্বে নিয়োজিত। চিত্র চৌধুরী বদরপুরে কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত। ইলার সঙ্গে রয়েছে কয়েকশো লড়াকু জঙ্গি সাঁওতাল কৃষক। ইলার কথা হরেক ওদের কাছে পৌঁছে দেয়, রানীমা বলেছে আগে আক্রমণ করবে না। আগে পরিস্থিতি বুঝবে। ওরা সংখ্যায় আর কয়জন? আমরা তো শত শত। আমাদের এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে ওরা।

কেউ কেউ প্রশ্ন করে, ওরা যদি আক্রমণ করে?

রানীমা বলেছেন, তা ঠেকাতে হবে।

যদি গুলি চালায়?

আমরা প্রতিশোধ নেব।

টুটু চেঁচিয়ে ওঠে, মনে নেই, মাতলা সর্দার কি বলেছে? বলেছে, আমাদের তো কিছু নেই। আমরা আর খোয়াব কি? তাহলে কেন শত্রুকে ভয় পাব? ওরা একটা গুলি চালাবে তো আমরা কয়েকশত বল্লম ছুঁড়ব।

ঠিক বলেছিস, ওদের চাইতে আমাদের শক্তি কম নয়।

শীতের ঝকঝকে রোদে শাণিত কাস্তে চকচক করে—চকচক করে কৃষকের দৃষ্টি। আমন ধান ঘরে উঠবে। নতুন ধানের গন্ধ ভেসে বেড়াবে বাতাসে—নবান্নের উৎসব হবে ঘরে ঘরে। আর মাত্র ক'টা দিন।

ইলার চোখে ঘুম নেই। দিনের বেলায় বিভিন্ন বাড়িতে থেকে রাতে চলে আসে ক্যাম্পে। শুক্র মাডাং গলা ছেড়ে গান গায়, সে কণ্ঠ আবেগতাড়িত করে ওকে। পারবে কি এইসব তাজা প্রাণের স্বস্তি ধরে রাখতে? পারবে কি গরে ঘরে আনন্দ পৌঁছে দিতে? হয়তো পারবে, প্রচণ্ডভাবে আশাবাদী হয়ে ওঠে ইলা। উত্তেজনায় পায়চারি করে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীতেও ওর গরম লাগে। গায়ের চাদর খুলে রাখে চৌকির ওপর। বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ভাবে, এই মুক্ত এলাকার মতো অসংখ্য এলাকা গড়ে তুলবে, যেখানে সবাই একসঙ্গে ধান কাটবে—একসঙ্গে উৎসব করবে এবং সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেবে। ওর সামনে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত—বাতাসে লুটোপুটি খায় শীষ। জোতদারদের বড় বড় বাড়িগুলোও মিউজিয়াম বানাবে। ওখানে এই এলাকার মানুষের হাতের তৈরি জিনিসগুলো সাজাবে। চমৎকার কাপড়ের পুতুল বানায় মুলি বাঁশ দিয়ে কত রকম জিনিস যে বানাতে পারে হেড়ম্ব, দেখলে বিস্ময় লাগে। সকিনার ঘর থেকে আনবে ওর বানানো নকসী কাঁথাগুলো। আর মাটির হাঁড়ি-কুড়ি, পট, কলসীতে চমৎকার নকসা আঁকে মহাদেব। আরো রাখবে ছোট আকারের ঢেঁকি, গরুর গাড়ি, টমটম, সাঁওদালদের হাজার রকমের অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার। ভাবতে ভাবতে ইলার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। স্বপ্ন যে এত সুন্দর হতে পারে ও কখনো ভাবেনি। শুধু কি স্বপ্ন? না, বাস্তব, হতেই হবে বাস্তব। ও দ্রুত কণ্ঠে হরেককে ডাকে, হরেক, হরেক?

রানীমা?

ইলা হঠাৎ করে কিছু বলতে পারে। ও একটুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, হরেকের, মুখের মতো মুখ মিউজিয়ামে রাখা যায়। এ মুখ হাজারে একটা মেলে।

রানীমা কিছু বলবেন?

বলছিলাম কি, কাল তো পাঁচ তারিখ।

হ্যাঁ, রানীমা।

ধান কাটার সব প্রস্তুতি তো শেষ?

হ্যাঁ, রানীমা।

হরেক অবাক হয়। ইলা তো সবই জানে, তবু কেন এমন করে জিজ্ঞেস করছে। ইলার কপালে ঘাম। মিউজিয়ামে আর কি রাখা যাবে? হরেকের কাপড়? চুল? দাঁত? পুরো শরীর।

আপনি কিছু ভাববেন না, রানীমা। আমরা প্রস্তুত।

ইলা বিড়বিড় করে, আমি তা জানি হরেক। আমি তো সবই জানি।

স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য রান্না শেষ হয়েছে হরেক?

হ্যাঁ, রানীমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই হরেক।

আমি যাই রানীমা?

শোনো, যে কাঁঠাল পাতায় তুমি খিচুড়ি খাও, সেটি আমাকে দিও।

ও ঘাড় নেড়ে চলে যায়। ওর হাতে অনেক কাজ।

ইলা ঘরে প্রবেশ করে। ওর মাথায় মিউজিয়াম। এখান থেকেই আগামী দিনের ছেলেমেয়েরা জানবে ইতিহাস। ও ঠিক করে, শুক্র মাডাং-এর বাদ্যযন্ত্রটি নেবে, নিধিরাম-এর বাঁশি, দিনমণির শাঁখা, সুখিয়ার চমৎকার সিঁদুরের কৌটা, সুচন্দর কাছ থেকে শাবল। এভাবেই ভরে যাবে মিউজিয়াম—একশো বছর পরও লোকে জানবে, এ অঞ্চলের মানুষ লড়াইয়ে জিতেছিল এবং নিজেদের মতো করে একটি স্বাধীন এলাকা গড়েছিল। তারপর থেকে ওখানকার কোনো ঘরে অভাব নেই। এখন কোনো শিশু ন্যাংটো থাকে না, কোনো গৃহবধূ খেতে না পেয়ে বারবণিতা হয় না, কোনো পুরুষ মানুষ অক্ষমতার লজ্জায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরে না।

ইলা চৌকির ওপর পা উঠিয়ে বসে গায়ে চাদর জড়িয়ে নেয়। আবেগে ওর চোখের কোণ চিকচিক করে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২

উনিশশো পঞ্চাশের জানুয়ারির পাঁচ তারিখের ঝলমলে সকাল। চকচকে কাস্তে হাতে হাজার কৃষক নেমে এসেছে মাঠে। অভ্যস্ত হাতে কোপ পড়ে ধানগাছের গোড়ায়। মাঠজুড়ে কাত হয়ে পড়ে সোনালি শীষ। একদল দ্রুত হাতে আঁটি বাঁধে।

তখন দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে খবর দেয় স্বেচ্ছাসেবী, বুকে হাঁফ ধরেছে, ঠিকমতো কথা বলতে পারে না, পুলিশ আসছে, পুলিশ!

পুলিশ! সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সবাই।

জোতদাররা থানায় খবর দিয়ে পুলিশ আনছে।

কে এসেছে?

কে আর, নাচোল থানার তফিজউদ্দীন দারোগা। সঙ্গে তিনজন কনস্টেবল।

ইলা মিত্র দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আসতে দাও।

কৃষকরা ঘিরে ধরে ইলাকে। রানীমা আপনি ক্যাম্পে চলে যান। আমরা সামলাব দারোগা-পুলিশ।

তা হয় না, তোমাদের রেখে আমি যেতে পারি না। তোমরা গ্রামের সীমানার তালগাছের মাথায় পার্টির লাল পতাকা উড়িয়ে দাও, নাকাড়া বাজাতে বলো শুক্র মাড়াংকে। ভয় নেই, ওরা মাত্র চারজন।

হরেক করজোড়ে বলে, আপনি চলে যান রানীমা। এ দিকটা আমরা দেখব।

আজিজ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, এতদিন আপনার কাছে যা শিখেছি, তার পরীক্ষা নিন আজ। দেখুন, আমরা সামলাতে পারি কি না।

তখন চারদিকে কাড়া-নাকাড়া বেজে ওঠে। তফিজউদ্দীন দারোগা বাদান আর ফালুকে ধরে নিয়ে ঘাসুরা প্রাইমারি স্কুলে আটকিয়েছে। ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই খবর প্রবল উত্তেজনায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় চার-পাঁচ হাজার নারী-পুরুষ তীর-ধনুক-লাঠি-সোটা-বল্লম-বর্শা নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে জড়ো হয়। পিঁপড়ের সারির মতো আসতে থাকে ওরা। ডানে-বামে তাকায় না—লক্ষ্য নাচোল থানার দারোগা।

চারদিকে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী দিয়ে ঘেরাও হতে দেখে বিগড়ে যায় তফিজউদ্দীন দারোগার মেজাজ। ক্রোধে ফেটে পড়ে চিৎকার করতে থাকে, তোমাদের সাহস তো কম নয়, তোমরা এসেছো আমাকে আক্রমণ করতে? তোমরা দেশদ্রোহী, রাষ্ট্রের দুশমন, ভারতের দালাল। তোমরা চাও পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে, চাও আমাদের স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে। তোমরা নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছ, প্রশাসন চালু করেছ। পিঁপড়ের মতো গলা টিপে মারলে তবে তোমাদের উচিত শাস্তি হবে। এখুনি এখান থেকে চলে যাও, নইলে পরিণাম ভয়াবহ হবে। তোমাদের লজ্জা করে না, অন্যের জমির ধান কেটে নিতে?

সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে আজিজ, খবরদার, আর একটা কথাও বলবে না। এতক্ষণ যা বলেছো, তার জন্য তোমার জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলা উচিত ছিল। তোমার জানা উচিত যে, আমরা অন্যের জমির ধান কাটি না, আমরা নিজেদের হিস্যা আদায় করি। জোতদারদের তাদের হিস্যা বুঝিয়ে দেই।

হরেক চেঁচিয়ে ওঠে, সে জন্য রানীমা আমাদের জন্য আইন করেছেন। আমরা সেই আইনে চলি। এটা মাতলা সর্দারের এলাকা। তোমরাই দেশের শত্রু। তোমরা আমাদের রক্ত শুষে খাও।

তফিজউদ্দীন কনস্টেবলদের ধমকে ওঠে, ওদের বেঁধে ফেল। থানায় নিয়ে চলো। শেয়াল দিয়ে ওদের খাওয়াব।

কনস্টেবলরা এক পা এগুতেই হাজার হাজার কণ্ঠ গর্জে ওঠে, খবরদার!

থমকে যায় ওরা। ওদের রক্তহীন ফ্যাকাশে চেহারায় জীবনের আলো নির্বাপিত হয়ে যেতে চায়। ওরা এগুবার সাহস পায় না।

আজিজ দর্পিত ভঙ্গিতে বলে, কোথায় পা-চাটা জোতদাররা? ওদের ডাকো তোমাদের বাঁচানোর জন্য?

বেয়াদব, বেতমিজ, ছোটলোকের দল, বেশি বাড় বেড়েছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে, সাবধান! মুখ সামলে কথা বল।

তফিজউদ্দীনের বুকের ভেতর ধস্ নামে, ভয় দ্রবীভূত করে দিচ্ছে সব সাহস।

ওরা চিৎকার করে, ছেড়ে দাও আমাদের কৃষক ভাইদের।

না।

মরিয়া হয়ে গুলি চালায় তফিজউদ্দীন। মুহূর্তে পড়ে যায় একজন কৃষক।

ক্ষিপ্ত মানুষের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ওপর। কেড়ে নেয় অস্ত্র এবং থেঁতলে ফেলে চারজনকে। যতক্ষণ না মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়, যতক্ষণ হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুক্ শব্দ বন্ধ না হয়, ততক্ষণ গণপিটুনি থামে না।

একজন কৃষকের শোণিত থেকে ক্রোধের নদী উৎসারিত হয়েছে, একজন কৃষকের শোণিত থেকে প্রতিশোধের স্পৃহা প্রবাহিত হয়েছে, একজন কৃষকের শোণিত লাল পতাকা হয়ে ওদের চেতনায় উড়ছে—ওরা তেভাগা চায়—চায় জোতদারদের শোষণের অবসান।

পেছন দিকে দাঁড়িয়ে থাকা দারোগার গরুর গাড়ির গাড়োয়ান লালুনাথ কর্মকারের শরীর শিহরিত হয়, এমন হত্যাকাণ্ড ওর জীবনে দেখেনি। এমনকি শোনেওনি বাপ-ঠাকুরদার কাছে। ভয়ে বস্ত্রস্ত লালুনাথ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়তে থাকে। দুবার হোঁচট খায়, আলোর ধারে পা পিছলে যায়, শামুকে পা কাটে, ইঁদুরের গর্তে পা বেঁধে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। ও বুঝতে পারে, পা কেটেছে, নয়তো হাত, নয়তো থুত্‌নি কিংবা চোয়াল, কিন্তু কোনো কিছু দেখার অবস্থা ওর নেই। উত্তুরে হাওয়া আঁচড়ে কেটে যায় চোখে-মুখে। লালুনাথ কর্মকার গায়ের চাদর খুলে হাতে জড়িয়ে নেয়। ওর শরীর বেয়ে ঘাম ঝরে। ও এখন ওর গাড়িতে-জোড়া গরুর মতো। দারোগার মৃত চোখ চাবুকের মতো ওকে তাড়াচ্ছে, ও প্রভুর ভয়ে তটস্থ। নাচোল থানায় গিয়ে খবরটা পৌঁছে দেয়ার জন্য ওর ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের গতি ক্রমাগত ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। লালুনাথ লবণের ঋণ শোধ করতে চায়।

লাশের সামনে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। আজমল বলে, ওদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হোক। পুঁতে ফেল মাটিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজ চিবিয়ে বলে, জালিমদের যোগ্য শাস্তি এটা।

হরেকও এই মতে সায় দেয়। গর্জে ওঠে হাজার কৃষক, পুঁতে ফেল শুকুনদের।

তফিজউদ্দীন দারোগা, শাহাদাত আলম, নওয়াজেস আলী ও তপেশচন্দ্র আচার্যসহ মানুষের ক্রোধ এবং ঘৃণায় মারপুকুর আর শ্যামপুরের মাটির নিচে চলে যায়। ওদের কখনো হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কখনো চ্যাংদোলা করে। ওদের থ্যাঁতলানো শরীর মাটির সঙ্গে ঘঁষে গেছে, লাথি খেয়েছে এবং গর্তের ভেতর ধপাস করে ফেলা হয়েছে। দারোগার চোখ জোড়া খোলা ছিল, সেটা কেউ বুঁজিয়ে দেয়নি। দারোগার মুখ কাদামাখা ছিল, ঠোঁটের পাশে রক্তের রেখা ছিল এবং হাজার মানুষের থুতু ছিল মুখজুড়ে। উপেন কোচ কোদাল দিয়ে গর্তগুলো বুঁজিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে হাজার মানুষ পা দিয়ে দাবিয়ে সমান করে দিয়েছে সে মাটি।

কাজ শেষ হবার পর আজিজ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, দুটো দালাল আছে এ গাঁয়ে, ওদের হালাল করতে হবে? উপেন কোচ কাদা-মাখানো শাবল মাথার ওপর তুলে ধরে, বলুন কে? এখনই সাবাড় করে দেই।

না, সাবাড় করতে হবে না। এগুলোকে ধরে আটকাই, তারপর রানীমার কাছে নিয়ে যাব। একজন খাদ্য বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর আফজাল হোসেন, অন্যজন পরিমাপক সফল খান।

হ্যাঁ, ঠিক, দুটো আস্ত হারামজাদা। সব সময় থানায় গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লাগায়।

হয়তো এরাই পুলিশ ডেকে এনেছে।

তাই হবে। জোতদারগুলো তো লুকিয়ে-ছাপেয় আছে। বের হয় না। এই শয়তান দুটোকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করেছে।

চলো, ধরি ওদের।

শুধু ধরলে হবে না। জালিমদের শাস্তি একটাই।

ঠিক আছে, শাস্তি আমরা দেব, তবে রানীমার সামনে।

নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যায় জনতা। ওদের ধরা খুব কঠিন হয় না। দুজন বাড়িতেই ছিল, ভয়ে লুকিয়ে চৌকির নিচে, উঠোনে দাঁড়িয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবার কথা বলতেই সুড়সুড় করে বের হয়ে আসে। আফজাল হোসেন পা জড়িয়ে ধরে আজিজের, আমার কি দোষ? আমি তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো অন্যায় করিনি? আমাকে প্রাণে মেরো না তোমরা। ঘরে আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আল্লাহ তোমাদের ভালো করবে।

চুপ!

চিৎকার করে ওঠে আজমল।

শুয়োরের বাচ্চার কত ভণিতা! অন্যায় করেনি? বললেই হলো। আমাদের ওপর জুলুম করার সময় মনে ছিল না? কথায় কথায় পুলিশ ডাকার সময় মনে ছিল না?

তোমরা আমাকে মাফ করে দাও। আমার দুধের শিশুর দোহাই।

বদমাশ!

পিঠের পর দুঘা পড়ে। ও কঁকিয়ে ওঠে। মুখ দিয়ে গ্যাঁক করে শব্দ বের হয়। বারান্দা থেকে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে ওর বৌ। মুহূর্তে শত বল্লম উঠে আসে ওর মুখের সামনে, কান্না থামিয়ে চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে ও।

ওর হাতে-কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে চলে।

অন্য আরেকদল সফল খানকে বেঁধে এনেছে। এ লোকটি আফজাল হোসেনের মতো অতটা ভীরু নয়, ধূর্ত এবং সাহসী। এর মুখে কোনো কথা নেই। নীরবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে মাত্র। দুচার ঘা খেয়েছে, তবু একটা কথা বলেনি। হাতে-কোমরে দড়ি বাঁধার সময় মৃদু আপত্তি করে বলেছে, বাঁধতে হবে না, আমি তো এমনিই যাচ্ছি।

চুপ, কথা বললে এই বল্লমের মাথায় গেঁথে নিয়ে যাব।

সফল খান কাশির ভঙ্গি করে একদলা থুতু ফেলে। তারপর ধীর পায়ে ওদের সঙ্গে হেঁটে আসে। এই জঙ্গি সাঁওতালগুলো ওকে এই মুহূর্তে মেরে ফেলবে, এমন চিন্তা ক্ষণিকের জন্যও ওর মাথায় স্থান পায় না। বরং ও লোক চিনতে থাকে। কারা ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে, কাদের ওপর কি ধরনের প্রতিশোধ নিতে হবে, মনে মনে সে চিন্তা করতে থাকে। ওরা আপাত নির্লিপ্ততার অন্তরালে প্রবল প্রতিরোধ গুমরে মরে। ক্রন্দনরত আফজাল হোসেনের ভয়ার্ত চেহারা দেখে ওর রাগ হয়। ওর চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। মেরুদণ্ডহীন এই লোকটি দুষ্কর্ম করতে চায় অন্ধকারে, বুক ফুলিয়ে সামনে আসতে পারে না। সফল খান এজন্য ওকে দুচোখে দেখতে পারে না। নিজের কৃতকর্মকে হালাল করতে না পারলে আবার পৌরুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসের? সফল খান শান্ত স্থিরভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। শুধু হাতে-কোমরে দড়ি ওকে অপমানের আগুনে পুড়িয়ে দেয়। ও জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে।

উপেন কোচ তড়পায়, এ দুটোকে কি পুঁতে ফেলা হবে? ভোতন মাঝি দুপা এগিয়ে আসে, তাই করা হোক। পেছন থেকে হাজারজন সায় দেয়। হরেক ওদের বাধা দেয়।

আজ রাত উপেন কোচের খালি ঘরে ওদের আটকে রাখা হোক। কাল রানীমার সামনে বিচার হবে।

আজিজ, আজমল দুজনে মাথা নাড়ে, সেই ভালো। ওদের আটকে রাখো।

জঙ্গি সাঁওতালরা সেদিনের মতো ফিরে যায়।

হরেক, আজমল আর আজিজ অন্যদের চাইতে এগিয়ে গেছে। ক্যাম্পে ফিরে ইলার সঙ্গে বসতে হবে। পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করতে হবে। শীতের বেলা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। মাঠে হাজার পাখির কিচিরমিচির কানে তালা ধরিয়ে দেয়। চণ্ডিপুরের মোড়ে সতু ব্যাপারীর সঙ্গে দেখা হয় ওদের। সতু ব্যাপারী ভোলাহাটে ইয়াসিন বসনির পলুচাষি। আজমলকে দেখে সতু ব্যাপারী হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, সর্বনাশ হয়্যা গ্যাছে গো? আজমল ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়, কান্না থামাও, কি খবর বলো?

কুতুব তোমার বাপকে খুন কর‍্যা ফ্যালছে।

খুন! কুতুব?

আজমল আজিজ আর হরেকের মুখের দিকে তাকায়। চিত্র-চিচিত্র ওদের মুখের রেখা, চিত্র-বিচিত্র ওদের মুখের রঙ—কোথাও সন্ধ্যার অন্ধকার নেই। আজমলের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যায়। আজিজ ওর হাত ধরে—শক্ত মুঠিতে চেপে রাখে।

হরেক প্রশ্ন করে, কি করে খুন করল?

দাও দিয়্যা মুণ্ডু ফ্যাড়া ফ্যাফেছে।

বাবাগো!

আজমল দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে। ইয়াসিন বসনির ওপর যত রাগই থাক, পিতৃত্বকে অস্বীকার করবে কি করে? ওর বুক শূন্য হয়ে যায়। ওর চোখের জল বাঁধ মানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুতুব এখন কোথায়?

পুলিশ লিয়্যা গ্যাছে। পাগলাটা কথ্যা কহে না, ক্যাবল হ্যাসে।

চলো সতু আমরা ক্যাম্পে যাই। কাল সকালে রওনা করবে তোমরা।

আজমল আজিজের হাত চেপে ধরে, তুই যাবি না?

কেমন করে? এই সময় কি যাওয়া ঠিক হবে? তুই বুঝতে পারিস না?

আজমল চুপ করে থাকে। বারবার ওর শরীর শিউরে ওঠে। চোখ বুঁজলে বিচ্ছিন্ন মাথা দেখতে পায়। ওর মাথা ঝিমঝিম করে, তফিজউদ্দীনের মতো ওর বাবার চোখও কি খোলা ছিল? কেউ কি বুঁজিয়ে দেয়নি? সতু ব্যাপারীকে জিজ্ঞেস করতে পারে না। ওর হাঁটু কাঁপে ঠকঠক করে, বারবার ওর বাবার মুখটা তফিজউদ্দীনের মুখ হয়ে যায়।

তিনজন একসঙ্গে হাঁটে। হরেক আর সতু ব্যাপারী এগিয়ে যায়। আজমল পিছিয়ে পড়ে। একসময় আজিজ ওকে ফিসফিসিয়ে বলে, কুতুব প্রতিশোধ নিয়েছে আজমল।

হবে হয়তো।

আজমল অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পাখির ডাক থেমে গেছে। ওরা দ্রুত পা চালায়। ক্যাম্পে উৎকণ্ঠিত রানীরা ওদের অপেক্ষায়।

থানায় ছোট দারোগার ঘরে লালুনাথ কর্মকার উত্তেজিত ভাষায় ঘটনা বর্ণনা করছে। ছোট ঘরে ভিড় করে আছে থানার কর্মচারী এবং পুলিশরা।

আহারে মরার সময় দারোগা মুখে এক ফোঁটা পানিও পায়নি।

বেচারা বউ ছেলেমেয়ের মুখও দেখতে পেল না।

ঠিকমতো দাফনও হলো না।

জানাজাও না।

ধমকে ওঠে ছোট দারোগা। তার চোখ লাল।

তোমরা সবাই চুপ করো। বেটাদের কেমন করে শায়েস্তা করতে হবে, তা আমি জানি। ওদের প্রতিটি গায়ের লোম টেনে ওঠানোর ব্যবস্থা করব। থানার দারোগার গায়ে হাত দেয়ার মজাটা টের পাবে।

ছোট দারোগা একটা নথি খোলে, ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট লজ্‌ড্ বাই লালুনাথ কর্মকার, লালুনাথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয় নথিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থানা থেকে সাথে সাথে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীতে খবর পাঠানো হয়। দারোগা অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় তার কর্তব্য সমাধান করে। এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতে চায় না।

রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থানায় আসে নাসির জোতদার আর মাহবুব হোসেন। ঘটনার অতিরঞ্জন বর্ণনা দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হয় না, ওদের কঠোর শাস্তি দাবি করে। পার্থক্য এই যে, লালুনাথ চোখে দেখে এসে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে আর এরা না দেখে বলছে।

জানেন মাটিতে যে পুঁতেছে, তাও ভালো করে পুঁতেনি, হাত-পা বেরিয়ে আছে। এতক্ষণে বোধহয় শেয়াল অর্ধেক শরীর খেয়ে ফেলেছে।

চারদিকে অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

নাসির জোতদার গলা পরিষ্কার করে বলে, এমন কর্তব্যপরায়ণ অফিসার কয় জন হয়! কর্তব্য পালন করতে গিয়ে নিজের জীবনটা পর্যন্ত দিয়ে দিলেন।

আহারে আমাদের সোনার দারোগা!

লালুনাথের কণ্ঠে বিলাপ ওঠে। ছোট দারোগার টেবিলের ওপর রাখা হারিকেনের চারপাশে হাজার হাজার পোকা উড়ে আসে। সেদিকে তাকিয়ে দারোগা ব্যঙ্গের হাসি হাসে, পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। নাসির জোতদার মফলারে মাথা ঢেকে রেখেছে, নাকের ওপর দিয়ে মাফলার টেনে মাথার ফলে শুধু চোখ জোড়া বেরিয়ে আছে, কুতকুতে চোখে শেয়ালের ধূর্ততা, পালকহীন দৃষ্টি দারোগার হারিকেনের ওপর নিবদ্ধ।

নাসির সাহেব আপনার ছেলেও তো তেভাগার পক্ষে আন্দোলন করছে?

ঐ কুলাঙ্গারের কথা বলবেন না। আমার ঔরসে ওর জন্ম, ভাবতেও আমার ঘৃণা হয়, লজ্জা হয়। ওকে তো আমি কবেই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি।

সব খবরই রাখি। বের করে দেননি। বেরিয়ে গেছে।

ছোট দারোগার মুখে ব্যঙ্গের হাসি।

কুপুত্রের বাপ হওয়া কী যে যন্ত্রণা, তা আমি কাউকে বোঝাতে পারব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রণা আর কিসের? এই অঞ্চলে তেভাগা কায়েম হয়ে গেলে তো আপনার ছেলে নেতা হবে এবং আপনি ছেলের জোরে বেঁচে যাবেন। কি বলেন?

নাসির জোতদার খোঁচাটুকু গায়ে মেখে চুপ করে তাকে। দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। দারোগা খাতাপত্র গুছিয়ে ঘরে ফেরার তোড়জোড় করছে। থানার সঙ্গেই বাসা, একাই থাকে, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছে। তফিজউদ্দীনের ফ্যামিলিও এখানে নেই। ভাগ্যিস নেই। ছোট দারোগা মনে মনে হাঁফ ছাড়ে। থাকলে যে করুণ দৃশ্যের সূচনা হতো, না ভাবতেও ভালো লাগে না।

তখন ধাক্কা দিয়ে দরজা ঠেলে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢোকে আফজাল হোসেন ও সফল খান।

আপনারা?

পালিয়ে এসেছি।

কিভাবে?

মাটির ঘরের জানালা তেমন মজবুত ছিল না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করতেই ভেঙে গেল।

ওরা কেউ পাহারায় ছিল না?

জানি না।

কোনোমতে বেরিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে থানায় এসেছি। ডানে-বায়ে-তাকাবার অবস্থা ছিল না।

আফজাল হোসেন এবং সফল খানকে দুটো চেয়ার দেয়া হয়। ওরা বসে মাথা এলিয়ে দেয়।

সব বুদ্ধি সফল খানের। ও না হলে এ যাত্রা হয়তো বাঁচতাম না।

সফল খান দর্পিত ভঙ্গিতে বলে, আমি অনেক সময় অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু কখনো ধৈর্য হারাইনি।

আফজাল হোসেন ঠোঁট চাটে, এক গ্লাস পানি খাওয়ান দারোগা সাহেব।

থানার ছোট ঘরে সবাই বসে থাকে। এটা-ওটা কথা বলছে নাসির জোতদার। সবাইকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। পরিস্থিতি কি হবে, বুঝতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু ছোট দারোগা অন্ধকারে নিজের বাসায় ফিরে আসে। কাজের ছেলেটি ভাত বেড়ে দেয়। দারোগা খেতে বসে মনে মনে হিসেব করে, বাথরুমে গিয়ে মনে মনে হিসেব করে, ঘুমুতে যাবার আগ পর্যন্ত তার হিসেব থামে না। শুধু সে জানে পরিস্থিতি কি হবে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩

দাউদাউ পুড়ে যাচ্ছে গ্রাম। ঘাসুরা, চণ্ডিপুর, কেন্দুয়া, জগদল, ধরল, শ্যামপুর, নাপিতপাড়া সর্বত্র আগুনের লেলিহান শিখা—কালো ধোঁয়া বিস্তৃত হচ্ছে এক গ্রামের সীমানা পেরিয়ে অন্য গ্রামে—নদীতীর এবং তারও ওপার। গুলির মুখে লুটিয়ে পড়ছে মানুষ।

রেঙ্গাবালির গোয়াল ঘরে পিঠে গুলি নিয়ে বুড়ো মা গরুর সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। দাউদাউ জ্বলে ওঠে গোয়াল ঘর। রেঙ্গাবালি বউ-মেয়ে নিয়ে পালিয়েছে। বুড়ি পায়ে বিশাল গোদ নিয়ে পালাতে পারেনি। তাই গোয়ালে আশ্রয় নিয়েছিল। শোবার ঘর, রান্নাঘর জ্বলে ওঠার আগেই বুড়ির রক্তে মাখামাখি হয়ে যায় গরুর লাদাচোনা। পালাতে পারেনি তোমল কামার। ওর বউ ছয় মাসের বাচ্চাটা বুকে জড়িয়ে কাঁদছিল। তোমল ভীতু স্বভাবের লোক। গুলির শব্দে বল্লমটা চেপে ধরেছিল, কিন্তু কিছু একটা করবে ভেবেছিল, কিন্তু তার আগেই ওর বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায়। আগের রাতে ও প্রচুর পরিমাণে হাঁড়িয়া খেলেছিল, ওর পেট ফুলে থাকে, ও হাত বাড়িয়ে বউকে ধরতে চেয়েছিল, নাগাল পায়নি। বউটা মুখ থুবড়ে পড়ার আগে গড়িয়ে অন্যপাশে পড়ে যায়। ছ'মাসের শিশু তার স্বরে চিৎকার করে, ওর কিছু হয়নি, প্রবল ধোঁয়ায় ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, ও হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে নিস্তেজ হয়ে যায়। বটি এবং বল্লম হাতে ঘর থেকে লাফিয়ে নেমেছিল মঙলি আর ভুদেব, সাধ ছিল শেষ হবার আগে একটাকে শেষ করবে, সাধ মেটেনি। পুলিশরা আগুন ধরানো মশাল ছুঁড়ে ওদের ঘরে আগুন দিয়েছিল, চড়চড় শব্দে ফেটে যায় বাঁশ। ঘর থেকে ইঁদুর ছুটে পালায়। ভুদেব আর মঙলি শুনতে পায় অসংখ্য মানুষের আর্তচিৎকার। মঙলি ভুদেবের গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে। একজন পুলিশ বুটের লাথিতে থেঁতলে দেয় ওদের মুখ। সতু ব্যাপারীকে নিয়ে গ্রামের সীমানা পেরুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে না আজমল। পুলিশের আক্রমণের মুখে পালাতে হয় ওদের। ভয়-আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে যায় সতু ব্যাপারীর চোখ, ও আজমল ভাই হামি ক্যাকংক কর‍্যা ভোলাহাট য্যামো?

আজমল ধমকে ওঠে, চুপ থাকো।

কিন্তু সতু ব্যাপারী চুপ থাকতে পারে না। ও অনবরত একই কথা বলে, ওর হেঁচকি ওঠে, ঘনঘন পেসাব পায়। ঝোপের আড়াল পেলেই পেসার করতে বসে।

আজমল খেপে যায়, তোমার জন্য ধরা পড়ে যাব। জানে বাঁচতে চাও তো দৌড়ে চলো।

ছাগল বাঁধতে গিয়ে ঘরে ফিরে আসতে পারে না দিনমণি। দূর থেকেই দেখে, দাউদাউ পুড়ছে ঘর—ওর বুক কেঁপে ওঠে—স্বামী-ছেলে তো ঘরে, ওরা কি বেরুতে পেরেছে? ও ছুটতে থাকে, পথ আটকায় সুচন্দ।

ওদিকে যেও না।

ওরা তো ঘরে।

কেউ বেরুতে পারেনি?

না। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে দিনমণি। সুচন্দ ওকে প্রবলভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে।

এখুনি পালাতে হবে দিনমণি।

না, আমি যাব না। ওদের রেখে যাব না।

পাগলামি করে না। দেখছো না যে-যেদিকে পারছে, ছুটছে।

ওহ্!

সুচন্দ প্রবল তৃষ্ণায় চুমু খায়। তারপর হাত ধরে দৌড়ুতে থাকে। একসময় থমকে দাঁড়ায় দিনমণি, সুখিয়া কোথায়?

ভোরবেলা উঠেইতো বেরিয়ে গেছে। এখন কোথায়, জানি না।

এতকিছুর মধ্যে আমি তোমাকে খুঁজতে এসেছি দিনমণি।

দিনমণি সুচন্দর চোখে চোখ রাখে, আমরা কোথায় যাব?

সীমান্ত পেরিয়ে চলে যাব। আমরা ঘর বাঁধব।

সুচন্দর হাতের মুঠোয় দিনমণি নির্ভার হয়ে যায়। তখন বারুয়া মাঝির ষোল বছরের মেয়েটাকে নিষ্পেষিত করে একজন পুলিশ। ওর বাড়-বাড়ন্ত যৌবনে ফাগের রঙ। উঠোনে বাবা-মা গুলিবিদ্ধ—তখনো মরেনি, যন্ত্রণায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাতরাচ্ছে। ঘরে মনিয়া প্রথমে পুলিশটির হাত কামড়ে দেয় তারপর ঘামচে দেয় মুখ। কিন্তু কতক্ষণ, আর কতক্ষণ—ওর সমস্ত বাঁধ ভেঙে যায়। এই ষোল বছরে ওকে কেউ স্পর্শ করেনি—ওর কুমারী যোনিতে দারুণ যন্ত্রণা—ও মরে যেতে চায়। প্রবল বিতৃষ্ণায় ও ভাবে, ওদের ঘরে আগুন নেই কেন? পাশের বাড়িতে গুলির শব্দ। সোমেনের পুরো পরিবার কলাগাছের ঝোপের আড়ালে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। ওরা পাঁচজন ছিল। চুলোয় ভাত ছিল, শুটকি পোড়ানো হচ্ছিল ভাত খাবে বলে, সে ভাত ফোটেনি, আগুন নিভে গেছে। হাঁড়িতে গত দিনের গুগলি-রাঁধা, মাটির হাঁড়ি ভর্তি হাঁড়িয়া—এক চুমুকও খেতে পায়নি কেউ। মুরগির খোপ বন্ধ, ওগুলো ভেতরে দাপাদাপি করছে। বাতাসে আগুনের হালকা। যারা পালাচ্ছে, তারা টের পাচ্ছে। সতু ব্যাপারী রাস্তার পাশে বসে পড়ে, বমি করছে—এ আর দৌড়ুতে পারছে না। আজমল ওর হাত ধরে টেনে ওঠায়, কিছুতেই বসতে দেবে না। ও জানে, আজিজ কোথায়। আজিজের কাছে পৌঁছুতে হবে। প্রাণপ্রিয় শুয়োর দুটো ফেলে রেখেই বাড়ি ছাড়তে হয় হরেকের বাবা-মাকে। ওরা জানে না, হরেক কোথায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা সুচন্দ আর দিনমণিকে পেয়ে যায়। আরো অনেকে একসঙ্গে জুটেছে—বিরাট বাহিনী, শ'চারেক তো হবেই। ওরা সীমান্তের পথে যাচ্ছে। বাতাসে মাংস পোড়ার গন্ধ—নিঃশ্বাস নিলে নাড়ি-ভুঁড়ি উপড়ে আসতে চায়। পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে চুতোর মাঝির বউ, দুই ছেলে এবং দুই দিনের মেয়ে। একই সঙ্গে ওদের পোষা বেড়াল—মোটাসোটা কালো রঙের হুলোটা, যার নাম ছিল তুষণ।

রাত্রিবেলা ওটা চুতোর মাঝির মাথার কাছে শুয়ে থাকত। তাড়াতে চাইলেও নড়ত না। চুরি করার অভ্যেস ছিল না। ওরা খেতে না ডাকলে নিজের থেকে কোনো খাবারে মুখ দিত না। বিশেষ সময়ে মেয়ে-বেড়ালের পিছে যখন ছুটত, লেজ ফুলে মোটা হয়ে যেত। তখন ওকে একটা পুরুষের মতো মনে হতো চুতোর মাঝির। মেয়েকে বুকের মাঝে নিয়ে শুয়ে ছিল ওর বউ, সঙ্গে ছেলে দুটোও, দূর থেকে ঘরে আগুন লাগতে দেখেছে ও, সারা বেলা গলা পানিতে দাঁড়িয়ে থেকেছে, এত পানির ভেতরেও ওর বুক পুড়ে যায়, শুধু চোখে পানি নেই, প্রবল যন্ত্রণায় হাত নিশপিশ করে, যদি একটা বল্লম থাকত, যদি একটাকে মেরে শেষ করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেত! চুতোর মাঝি রানীমার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে থাকে। ও জানে না, বউ ছেলেমেয়ে কি অবস্থায় আছে। ধলু মণ্ডলের গাইটার বিয়োনের সময় হয়েছিল, পেটে নাদুস-নুদুস বাচ্চা, মুখ উঁচিয়ে হাম্বা করে ডাকে, যেন কিছুটা উদাসীন, দূরের কিছু খোঁজার ছায়া ওর বড় কালো চোখে ভাসে, গুলি খেয়ে গরুটা উঠোনে তড়পায়, পা ছোঁড়ে, ওর মরণ হয় না, চোখ বেরিয়ে আসতে চায়, মুখ দিয়ে লালা গড়ায়। ধলু মণ্ডল বউ-বাচ্চা নিয়ে পালাতে পেরেছে। বউ প্রথম পালাতে চায়নি, বলেছিল, মরতে হলে এখানে মরব, আমি যাব না। ধলু মণ্ডল রক্তচক্ষু মেলে চিৎকার করে উঠেছিল, এখুনি বেরিয়ে আয়। ধান ক্ষেতের আইল দিয়ে দৌড়ুনোর সময় পড়ে গিয়ে বাচ্চাটার থুতনি কেটে যায়, গলগলিয়ে রক্ত পড়ে, ও চেঁচিয়ে কাঁদে, ধলু মণ্ডল ছাগলের মতো টানতে টানতে নিয়ে যায়। মৃত্যুর কাছে থুতনির যন্ত্রণা কিছু না, ছেলেটির হেঁচকি থামে না, ও হাত দিয়ে রক্ত মোছে। ধলু মোড়লের বউ'র থ্যাবড়া পায়ের পাতা মচকে গেছে। হাঁটতে কষ্ট হয়, কিন্তু উপায় নেই, সবকিছু উপেক্ষা করে দৌড়ুতে হচ্ছে। তারিণ মাঝির মেয়ে সুফলাকে ধরতে গিয়েছিল একজন পুলিশ, ও ধারালো দা নিয়ে রুখে দাঁড়ায়, এক পা এগুলে জবাই করে ফেলব। পুলিশটি ওকে বন্দুকের ভয় দেখায়। সুফলা চেঁচিয়ে ওঠে, মারো, মেরে ফেল। রাগে দিশেহারা হয়ে পুলিশটি ওকে মেরেই ফেলে, ওর ফুসফুস ফুটো হয়ে গুলি চলে যায়, ও ঘরের কোণে রাখা হাঁড়ি-কুড়ির ওপর চিৎ হয়ে পড়ে। ওর পিঠের নিচে মাটির সরা গুঁড়িয়ে যায়, পায়ে ধাক্কা লেগে উল্টে যায় জলভরা কলসি। ওর প্রিয় হাঁস জোড়া প্যাকপ্যাক শব্দে দৌড়ে ঘরের পেছনে চলে যায়। সারা বাড়ি তছনছ করে পুলিশ। মেরে ফেলেও গায়ের ঝাল মেটে না। সুফলার বাবা-মা গোয়ালের সামনে পড়ে আছে। ওদের ভাই সুদেব পালাতে পেরেছে, কাল রাতে ও ঘরে ছিল না। ও স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে ক্যাম্পে ছিল। সুফলাদের বাড়ি ঝকঝকে তকতকে, লেপাপোছা, উঠোনে মহুয়া গাছ, কামরাঙা গাছও আছে একটা। ওদের ঘরের লাল মাটির দেয়াল শক্ত, কোনো জানালা নেই, একটাই দরজা—দরজার কাছে সুদেবের বাঁশি দুটুকরো হয়ে পড়ে আছে। ও চমৎকার বাঁশি বাজাত। চাঁদনি রাতে ওদের বাড়িতে হাঁড়িয়া উৎসব হতো। সুদেবের বন্ধুরা আসত, সারা রাত নাচা হতো, ঢোল বাজত। আর অল্পদিনের মধ্যে বাবুরামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে বিয়ে হতো সুফলার—বাবুরাম ওকে ভীষণ ভালোবাসত। কতদিন বাবুরামের সঙ্গে বাঁশঝাড়ের ভেতর বসে গল্প করেছে, বাবুরাম বলেছিল, সামনের ফাগ উৎসবের পরে বিয়ে, বিয়ের সময় ওকে রুপোর পৈঁছা বানিয়ে দেবে। ফাগের তো আর বেশি দেরি নেই! সুফলার শরীর এখন ফাগের রঙে রঞ্জিত, ঠোঁটের কোণ বেয়ে মহুয়ার কষ গড়িয়ে পড়ে, গুলির শব্দ তো নয়, সারা বাড়ি জুড়ে মাদল বাজে, আজ উৎসব। দলটা মহানন্দার পাড়ে এসে থামে। ওরা অনেক ভেতরে চলে এসেছে, এখানে পুলিশের ভয় নেই, কেউ কেউ বুক উজাড় করে কাঁদে, কারো কান্না স্তব্ধ। শিশুরা চিৎকার করছে, ওদের খিদে পেয়েছে। মহানন্দার পানি আঁজলা ভরে পান করে সবাই, এখন পানিই সম্বল। আশেপাশের লোকজনের বাড়ি থেকে কিছু চিঁড়া-মুড়ি পাওয়া যায়, শিশুদের দেয়া হয়, যারা এসব খেতে পারে না, তাদের চিৎকার থামে না। কেউ কেউ আঙুল চুষতে চুষতে মার কোলে ঘুমিয়ে যায়। মায়েরা বিপর্যস্ত, গাছের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসে ভিটেমাটির জন্য চোখের জলে একাকার হয়। দিনমণির কান্না থামে না, চোখের পাপড়ি ফুলে চেহারা গোল হয়ে গেছে। সুচন্দের সান্ত্বনা ওর দুঃখে প্রলেপ দেয় না। ছেলের জন্য বুক ফেটে যায় দিনমণির। সুচন্দ ওর আঁচলে দুমুঠি মুড়ি দেয়, দিনমণির খাবার ইচ্ছে নেই। ও কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে মাথা ঠেকিয়ে বসে থাকে। সুচন্দ কি করবে, বুঝতে পারে না। বড়ুকোচ এসে সুচন্দকে অন্য পাশে ডেকে নিয়ে যায়।

কোনো খবর আছে বড়ু?

হ্যাঁ! সুখিয়ার খবর কি?

বুঝতে পারছি না। হয়তো কোনো দলের সঙ্গে এসে পড়বে। গণ্ডগোল শুরু হবার সময়তো ও ঘরে ছিল না।

ও আর কখনো আসবে না। আমি ওকে ক্ষেতের ধারে মরে পড়ে থাকতে দেখেছি।

সুচন্দ বড়ুর হাত চেপে ধরে, বড়ু!

ওর গায়ের ওপর কাক বসেছিল, ও ন্যাংটো ছিল।

আহ্ বড়ু!

এতক্ষণে কাক হয়তো ওর মাংস থুবলে খেয়েছে।

দিনমণিরও তো স্বামী-ছেলে পুড়ে মরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুচন্দর আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে না। ও বড়ুকে উপেক্ষা করে হাঁটতে থাকে।

সুচন্দ তোদের দুজনেরই এখন আর কেউ নেই।

পেছন থেকে ভেসে আসা বড়ুর কণ্ঠস্বর দুঃখের, না ব্যঙ্গের, সুচন্দ বুঝতে পারে না। ও বুঝতে চায়ও না। ও দিনমণির পাশে এসে বসে। ওর দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বলে, আমাদের কেউ আর নেই দিনমণি। দিনমণি ফুঁপিয়ে ওঠে, চোখে আঁচল চাপা দেয়, যে কান্না থেমে ছিল, সেটা আবার শুরু হয়।

দীর্ঘপথ হেঁটে এবং একরকম এলোপাতাড়িভাবেই আরো দশজনের একটা দল ওদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। এরা সবাই পুরো পরিবার নিয়ে পালাতে পেরেছে। ওদের বসতবাটি গেছে, ধান-গরু-শূকর গেছে, কিন্তু জীবন যায়নি—ওরা পোটলায় বেঁধে চাল-ডাল, আলু-মুড়ি-চিড়া-গুড় আনতে পেরেছে। ওরা পরিশ্রান্ত—পা কেটে গেছে—শুয়ে পড়ে মেয়েরা। যারা এতক্ষণে কিছুটা সুস্থ হয়েছে, তারা নদী থেকে পানি এনে ওদের দেয়। পানি খেয়ে ওদের চোখে বুঁজে আসে, ঘুম নয়, ক্লান্তি এবং অবসাদ ওদের সর্বাঙ্গ বিচূর্ণ করে। ওরা একটু অবলম্বন চায়।

সন্ধ্যার আগেই ওদের সঙ্গে মিলিত হয় রমেন ও মাতলাসহ আরো অনেকে। মাতলা পথ চেনে, সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া ওদের জন্য অসুবিধে হবে না। ওদের দেখে খুশির হিল্লোল বয়ে যায় মৃতপ্রায় মানুষগুলোর মধ্যে। সবার কুশল বিনিময়ের পর মাতলা জিজ্ঞেস করে, তোমরা রানীমার খবর জানো?

সবাই চুপ, কেউ কিছু বলতে পারে না।

রানীমা এখন কোথায়? কেমন আছে?

পেছন থেকে কে যেন আর্তনাদ করে।

আপনারা রানীমাকে খুঁজে আনুন।

পেছন থেকে আবার আর্তনাদ ওঠে। সেই সঙ্গে শিশুরা কাঁদতে শুরু করে—শীতের বিকেল—দ্রুত আলো নিভে আসছে। রমেনের বুকের ভেতর যত অস্থিরতাই থাক, প্রকাশ করতে পারে না। কেবলই মনে হয়, কেমন আছে ইলা? ওকি ধরা পড়ল? কেউ কিছু জানে না কেন? ও তখন বসে থাকা মানুষগুলোর মুখ জরিপ করে। এরা সবাই সাধারণ কৃষক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বেচ্ছাসেবীদের কেউ নয়, ও আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে, স্বেচ্ছাসেবী ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ইলা নিরাপদ জায়গায় আছে। বেশি কিছু ভাবনার নেই।

সুচন্দ এগিয়ে আসে ওর কাছে, দাদা যাদের কাছে চাল-ডাল আছে, তাই দিয়ে খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা করি?

ভালো বলেছো, তাই করো। সবাই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত।

রাতটা খিচুড়ি খেয়ে কাটিয়ে পরদিন ভোরে আমরা সীমান্ত পেরিয়ে চলে যাব। আমাদের কোনো ভয় নেই। বাপ-দাদার ভিটে গো—

রমণী কণ্ঠের আর্তনাদ জেগে ওঠে।

চুপ, কান্না কিসের!

কে ধমকায় ওকে? রমেন কান পেতে থাকে।

আরেকজন রুষ্ট হয়ে বলে, কাঁদবে না? কাঁদারই তো কথা। আমাদের সর্বনাশ—

তোমরা চুপ করো, আমাদের ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে তোমরা নিজেদের শক্ত করো, আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছি, আমরা পরাজিত হয়েছি, কিন্তু মাথা নিচু করিনি। আবার আমরা শক্তি সঞ্চয় করব, আবার আমরা লড়ব। মনে রেখো, আমরা শোক করব না।

মাতলার কণ্ঠস্বর জাদুর মতো কাজ করে। সবাই কিছুটা উদ্দীপিত হয়, কিছুটা নিশ্চিন্তও। যাদের বুকের মধ্যে অনুতাপ আছে, ওরা সরবে কিছু বলে না। বরং রান্নার আয়োজনে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। আশেপাশের বাড়ি থেকে হাঁড়ি সংগ্রহ করে নদী থেকে চাল-ডাল ধুয়ে নিয়ে আসে সুচন্দ। এর মধ্যে খেয়াল করে দিনমণি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে, ওর মুখ দেখা যায় না।

রমেন এবং মাতলা গাছের নিচে বসে নিচুস্বরে কথা বলছে। ওদের কথা কেউ শুনতে পায় না। চুলোয় আগুন জ্বলে উঠলে সুচন্দ দিনমণির কথা ভাবে, বেচারা ঘুমিয়েছে, ঘুমোক, ঘুম হয়তো ওর দরকার, ঘুমুলে ও ভালো থাকবে। খারাপ লাগে সুখিয়ার জন্য, এত বছর ঘর করার পরও সুখিয়া ওর হতে পারেনি, সুখিয়ার জন্য ওর বুক পোড়ে না, ওরা কেবল দায়সারা সংসার করেছে। ভালোই হয়েছে, চুকেবুকে গেছে। আবার সংগ্রাম এবং নতুন করে শুরু—সুচন্দ ভাবতে ভাবতে চুলোয় কাঠ গুঁজে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিনে শ্মশান হয়ে যায় গ্রামগুলো। যারা কোনোভাবে বেঁচে গেছে, ওরা কেউ কেউ ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে। কণ্ঠে বিলাপ নেই, চোখে অশ্রুও না, বুকে হা-হুতাশও নয়। ওরা পাথর।

দুহাজার সৈন্য এসে নেমেছে রোহনপুর রেল স্টেশনে। ক্যাম্প করেছে ওখানে, শিকারী কুকুরের মতো ইলা মিত্রকে খুঁজছে। হুলিয়া বের হয়েছে ওর নামে। রমেন এবং মাতলার নামও হুলিয়া থেকে বাদ যায়নি। এই ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন দিকে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। ইলা মিত্রকে পেতেই হবে, জীবিত অথবা মৃত। প্রতিশোধ নিতে হবে, কেননা, এই নারী চারজন পুলিশ হত্যার নির্দেশ দিয়েছে।

চারশো স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে ইলা মিত্র আপাতত নিরাপদ আশ্রয়ে এসে পৌঁছেছে। ওরা ঘিরে রেখেছে ওকে। হরেক বলছে, রানীমাকে পেলে ওরা মেরে ফেলবে। রানীমাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।

কোথায়? কোন জায়গা নিরাপদ?

নাচোল থানার কোনো জায়গা নিরাপদ নয়।

ভিড়ের মধ্যে কথা বাড়ে। কে কেন বলে, আমরা রানীমাকে সীমান্ত পার করে দেব।

ইলা চুপ করে বসে থাকে, সবকিছুই শোনে ও। ওর বুক ফেটে যায়, চোখে জল আসতে চায়, কিন্তু এদের সামনে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করা চলবে না। এই ক্ষরণ নিজের ভেতর ধারণ করতে হবে, ও বিড়বিড় করে, তোমরা আমাকে নীলকণ্ঠ হবার সাহস দাও। ধ্বংসযজ্ঞ একদিকে ওক বিমূঢ় করেছে, অন্যদিকে প্রেরণা দিচ্ছে, ভাবছে, ধ্বংসযজ্ঞের মাঝেই প্রস্ফুটিত হয় সৃষ্টির ফুল। আমরা আবার শুরু করব, আমরা থেমে যাব না।

ও তখন দৃঢ়কণ্ঠে বলে, আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না হরেক।

বৃন্দাবন সাহা ইলার মুখের দিকে তাকায়। ও এমনই, সাহসের বারুদ, শ্যামলা চেহারায় চাপা আগুনের আভা থাকে, তা কখনো ফ্যাকাসে হয় না। কিন্তু এই মুহূর্তে বৃন্দাবন সাহার কাছে সাহস কোনো স্বস্তি নয়। শীতের রাতেও ওর কপাল ঘামে, এই মুহূর্তে কাশি নেই, হয়তো মানসিক উত্তেজনার কারণে কাশি উবে গেছে। ও বোঝে, মুসলিম লীগ সরকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটাই শেষ নিপীড়ন নয়, এটা কেবল শুরু। এই পরিণতি আরো ভয়াবহ হবে। ওরা ধরতে পারলে চরম প্রতিশোধ নেবে, একটু একটু করে মারবে।

ইলা বলে, আমরা আবার নতুন করে শুরু করব বৃন্দাবন দা।

কিভাবে? আমাদের অস্ত্র কৈ? আমরা খালি হাতে কেমন করে লড়ব?

ইলা চুপ করে থেকে বলে, জানি, ওরা এখন ক্ষ্যাপা কুকুর হয়েছে। ওরা তছনছই করবে।

সে জন্য আমাদের আপাতত নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে। তারপর দেখে-শুনে এগুতে হবে।

নিরাপদ আশ্রয়?

আমাদের সীমান্তের ওপারেই যেতে হবে।

আপনিও বলছেন?

ওরা ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। আমারও তাই মনে হয়।

ইলা একটুক্ষণ ভাবে। বৃন্দাবন নিজে নিজেই বলে, রমেন, মাতলা যে কোথায় আছে কে জানে?

ইলা ম্লান হাসে। বৃন্দাবন সাহার মুখে নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রমেনকে ও বিচ্ছিন্নভাবে ভাবে। এই ভাবনা এই এতটা সময় ধরে ওকে তাড়িত করেনি। ওর মন খারাপ হয়ে যায়। ভাবে, আশঙ্কা করার কিছু নেই। রমেন নিশ্চয় ভালোই আছে এবং মোহনও। ছেলের কথা মনে পড়তেই ওর বাঁধ ভেঙে যায়। ও হাঁটুতে মুখ গুঁজে নিজেকে আড়াল করতে চায়।

কিছুক্ষণ পর হরেক সাঁওতাল মেয়েদের পোশাক নিয়ে আসে।

রানীমা এগুলো আপনি পরে ফেলেন। সাঁওতাল মেয়েদের ছদ্মবেশে থাকলে পুলিশ আপনাকে চিনতে পারবে না।

বৃন্দাবন সাহা উৎসাহিত হয়, ও ঠিকই বলেছে। কাপড়টা পরে চুলটাও ওদের মতো করে বাঁধুন। আর ওদের ভাষা তো আপনি জানেনই। কোনো অসুবিধে হবে না।

ইলা স্বগতোক্তি করে, আমিও জানি, এই মুহূর্তে ধরা পড়া চলবে না।

ও উঠে পাশের ঘরে চলে যায়। ওর মনে হয়, ওর কিছুক্ষণ একলা থাকা দরকার। এতটা সময় ধরে কেবল ছুটেছে, কোনো কিছু ভাবার সময় পায়নি। এখন নিজের মুখোমুখি হতে হবে, বুঝতে হবে আলো-হাওয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়ই দুঃসময়। ওর শীত করে না, পৌষের হিম গায়ে মেখেও খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। বাইরে জ্যোৎস্না।

সুমন্তর ঘরের বান্দারায় বসে সতু ব্যাপারীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে আজমল আর আজিজ। ও কান্নাকাটি করছে, হামি ক্যাংকা কর‍্যা ভোলাহাট য্যামো? আজমল ওকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেয় ও বুঝতে চায় না। ওর ঘ্যানঘেনিতে বিরক্ত হয়ে আজিজ ধমকে ওঠে, থ্যামো বাহে। ধমকে কাজ হয়। সতুর কান্নার শব্দ কমে আসে, কেবল মাঝে-মধ্যে একটা করে টান ওঠায়। আজমল চাপা স্বরে বলে, আজ মামার ফুর্তি। আজিজ দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, হারামজাদা। নাসির জোতদার এতদিন নেংটি ইঁদুর ছিল, আজ থেকে বাঘ হবে। আজমল প্রচণ্ড শব্দে উরু চাপড়ে বলে, আমাদের দিন আবার আসবে। আজিজ সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, আসতেই হবে। কিছুক্ষণ নীরবতা। সতু ব্যাপারীর কোনো সাড়া-শব্দ নেই, বোধহয় ঘুমিয়ে গেছে। আজমল বিষণ্ন স্বরে বলে, দুটোই বাপের মতো বাপ পেলাম না। দুটোই লুচ্চা, বদমাশ। আজিজ হাসতে হাসতে বলে, আমরা চেষ্টা করব আমাদের ছেলেমেয়েদের যেন এই দুঃখ না থাকে। আজমল শব্দ করে হেসে ফেলে, আমাদের ছেলেমেয়ে? গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। আজিজ ফুঁসে ওঠে, তুই কি ভেবেছিস আমাদের ঘর-সংসার হবে না? আজমল উদাস হয়ে বলে, ঘর-সংসার? কে জানে, হবে কি না? আজিজ ওর পিছে থাপ্পড় দেয়, ধুস্ শালা, তুই নিরামিষ হয়ে যাচ্ছিস। আমি তো বিয়ে করবই, তোর বউও আমি পছন্দ করে দে। আজমল প্রতিবাদ করে, না, তা হবে না। আমার বউ, আমার পছন্দ। তুই পছন্দ করলে মনে হবে, ও তোর পছন্দ, তোর সঙ্গেই ওকে মানায়। শেষে ওর সঙ্গে আমার ঘর করাই দায় হবে। দরকার নেই তোর ভালোবাসার। নিজেরটা নিজেই বুঝব।

আজিজ হো-হো করে হাসে, ও বাব্বা, একদম জাত সেয়ানা। তুই শালা তলে তলে এত মোড়েল, এ আমি বুঝতেই পারিনি। আজমল বিষণ্ন হয়ে থাকে। জবাব দেয় না। এই মুহূর্তে একজন ভালো বাবার অভাব ওকে প্রবলভাবে পীড়িত করে। ওর মনে হয়, মা এবং বাবা হারিয়ে ও কেবল ক্ষ্যাপার মতো ছুটেই বেড়াল, কোথাও স্বস্তি পেল না। ভেবেছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজের সঙ্গে থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ও ওর নিজস্ব জগৎ খুঁজে নেবে। ও পেয়েও ছিল, এসব ওকে পরিতৃপ্ত করত, কিন্তু আজকের ঘটনায় ও একদম দুমড়ে যায়। প্রবল অনিশ্চয়তা ওকে চিন্তিত করে রাখে। বাইরে ঘন কুয়াশায় রাত বাড়ে, কানাকুয়া ডাকে একটা। পেটে প্রচণ্ড খিদে, আজমলের মুখে থুতু আসে, ও বাইরে নেমে আসে। কলাগাছের ঝোপের নিচে এসে দাঁড়ায়। চারদিকে মানুষ, এখানে-ওখানে জটলা পাকিয়ে জড়ো হয়ে আছে, মৃদু আর্তনাদ কিংবা গুঞ্জন দুটোই কানে এসে লাগে। ওর পায়ের কাছ দিয়ে ইঁদুর দৌড়ে যায়। একটু দূরে ছাইয়ের গাদা, পচা শামুকের গন্ধ আসছে। ও ভাবল, আমার নাক চেপে রাখা উচিত, গন্ধটা শরীরে গেলে বমির ভাব হয়, কিন্তু না এখন এসব ওকে স্পর্শ করে না। বাতাসে কলাপাতা কাঁপে, ওর শরীর শিরশির করে। এই পাতা শাদা রঙের কাফনের কাপড় হয়ে ওর মগ্নতা আচ্ছন্ন করে, ও ইয়াসিন বসনির ছায়া অবলোকন করে এবং গ্রামের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য থেকে মুঠি মুঠি ছাই নিয়ে এসে ঐ মুখ আড়াল করতে চায়। ও হাত বাড়িয়ে কলাপাতা ছিঁড়ে ওটার অখণ্ডতা নষ্ট করে চিরল পাতা বানায়, সে পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ে। ও মাথার মধ্যে অদ্ভুত সব শব্দ শোনে, গুলি এবং আর্তনাদের চাইতেও সে শব্দ ভয়াবহ। ও মনেপ্রাণে নিজের মধ্যে কুতুবের অস্তিত্ব অনুভব করে, ছেলেটি ভালোবাসার জন্য জীবনকে ছিন্নভিন্ন করেছে, ভালো না খারাপ, সে প্রশ্ন নয়, কুতুব ভালোবাসার জন্য জীবনের বাইরে চলে গেছে, কোনো কিছুই ওকে ধরে রাখতে পারেনি। আজমল কেঁপে ওঠে এবং শামুকের পচা গন্ধ ভরা ভাইয়ের গাদায় অনেকক্ষণ ধরে পেসাব করে। ওর শরীর হালকা হতে থাকে, মগজও, ওর মধ্যে প্রবল স্বপ্ন দানা বেঁধে ওঠে। আজকে গ্রাম পুড়ে ছাই হয়েছে, সেই ছাই কালো নয়, এই জ্যোৎস্নার মতো নরম, পেলব, এখান থেকেই তৈরি হতে পারে স্বপ্নের ঘর। এক আচ্ছন্নতার মধ্যে ও বারান্দায় ফিরে আসে। আজিজ তখন ঘুমিয়ে গেছে। আজমল ঘুমুতে পারে না।

মধ্যরাতে ওরা আবার যাত্রা শুরু করে। নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে না পারলে বিপদ। চন্দ্রালোকে মানুষগুলো ছায়া হয়ে গেছে। পথ দেখানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপযুক্ত লোক নেই। কোনদিকে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে না। অনুমান-নির্ভর করে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। বৃন্দাবন সাহা মনে মনে ইলার প্রশংসা করে, সাঁওতাল মেয়ের পোশাকের আড়ালে ও নিজেকে লুকোতে পেরেছে। আর অনর্গল সাঁওতালি ভাষা বলতে পারে, হয়তো অসুবিধে হবে না। এখন কোনোরকমে সীমান্ত পেরুতে পারলে হয়। ভোর হয়ে গেছে, কোথায় এলো কিছুই ঠাহর করতে পারে না। রেললাইন ধরে এগুতে থাকে।

হরেক আমরা এখন কোথায়?

বুঝতে পারছি না রানীমা।

আজমল এগিয়ে আসে, এই পথে আমি এসেছি। মনে হয়, আমরা রোহনপুর স্টেশনের দিকে এগোচ্ছি।

স্টেশন হলেতো মন্দ হয় না। আমরা ট্রেনে উঠে কোথাও চলে যাব।

ইলার কথায় সাড়া দেয় না বৃন্দাবন সাহা, চিন্তিত হয়ে থাকে।

হরেক বলে, রানীমাকে গরুর গাড়িতে পোলো দিয়ে ঢেকে সীমান্ত পার করিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো।

কাউকে ছেড়ে তো আমি একা যেতে চাই না। সবাইকে নিয়ে যাব।

স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছুতেই রক্তশূন্য হয়ে যায় ইলার চেহারা। এ কোথায় এসেছি? এরা কারা? সামনে সেনাবাহিনীর ছাউনি, খাকি পোশাক পরা রাইফেলধারী বাহিনী ঘেরে দিচ্ছে চারদিকে। পথ ভুল করে ওরা শত্রুর ঘাঁটিতে এসে উঠেছে, এখন আর পিছু-হটার উপায় নেই। সাঁওতালদের এতবড় দল দেখে সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা ঘিরে ফেলে।

তোমরা কারা? কোথা থেকে আসছো?

ওরা সবাই বিমূঢ়, ওদের দৃষ্টিতে আতঙ্ক, চেহারা ফ্যাকাশে, পথ-শ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, বলে দিতে হয় না, এরা কারা, এরা কোথা থেকে এসেছে। পুরো দলকে ঘেরাও করে নিয়ে যাওয়া হয় ছাউনিতে। পুলিশ এবং স্থানীয় জোতদারদের অনুচররা জানিয়ে দিল, এরাই নাচোল থানার শত্রু, পুলিশ হত্যাকারী এবং আন্দোলনের হোতা। গোটা দলের ওপর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে অফিসার, যাক বাবা, তাহলে তোমরা নিজেরাই ধরা দিলে আমাদের কাছে! ভালোই করেছো। তোমাদের জন্যই তো আমাদের এত আয়োজন। এত পুলিশ, সেনাবাহিনী! সোনার চাঁদ সব কেমন এসে ফাঁদে পা দিয়েছো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোতদারদের অনুচর একজন ফোড়ন কাটে, দিতেই হবে, পাপ কি আল্লাহ্ সইবে? না ধরণী সইবে?

সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে কানাকানি, ফিসফিস, ওরা কিছু একটা অনুমান করেছে, ভিড়ের মধ্যে বসে থেকে সেটা আঁচ করতে পারে ইলা, ওর ভেতরে কম্পন। বাম হাত দিয়ে হরেকের হাত চেপে ধরে। অফিসার নির্নিমেষ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কে এই রমণী? না, ও সাঁওতাল রমণী নয়। ওর চোখ অন্য কথা বলছে, ঐ দৃষ্টি কোনো সাঁওতাল রমণীর হতে পারে না। এই ছদ্মবেশের অন্তরালে অন্য কেউ আছে।

ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হয় না। আন্দোলন পরিচালনা করে, গোটা এলাকার রানীমা হতে পারার যোগ্যতা অর্জন করে যে একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ডে পৌঁছেছে, সে কি ইচ্ছে করলেই সাধারণ হতে পারে? না হয়? শুধু দৃষ্টি নয়, তার প্রতিটি মুখের রেখা বলে দেয়, কে কি? কি তার পরিচয়? মাটিতে পা ঠোকে অফিসার, কিছুতেই আমাদের ভুল হয়নি। আমরা চিনেছি এঁকে। ঐ পোশাক খুলে ফেললেই বেরিয়ে আসবে আসল মানুষ। এঁকে হাতে পাওয়ার জন্যই তো এই সেমছোউনি। অফিসার এগিয়ে এসে হাত ধরে টেনে ওঠায় ইলাকে। চুলের মুঠি ধরতেই খোঁপা খুলে ছড়িয়ে যায় চুল। ভিড়ের একপাশে এসে দাঁড়ায় অফিসার। ইলার মুখে কথা নেই, দপ করে জ্বলে ওঠে চোখ। সে দৃষ্টি গায়ে মেখে ঠা-ঠা হাসে অফিসার, তুমি ইলা মিত্র! ঠিকই বুঝেছি, তুমি ডাইনি, যে হত্যার আগুন জ্বালিয়ে নরক বানিয়েছো। বুঝবে, আমাদের গায়ে হাত দিলে সে আগুন কেমন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে নিজের গায়ে। কি, মুখে কথা নেই যে? না, তোমার জিহ্বা শুধু নয়, কথা বলবে তোমার শরীরে প্রতিটি রোমকূপ। প্রতিশোধ! আহ্ প্রতিশোধ!

হাসতে হাসতে ইলার মুখের ওপর একদলা থুতু দেয় অফিসার। ভিড়ের মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে যায় অনেকে। গুঞ্জন ওঠে সাঁওতালদের মধ্যে।

খবরদার! একচুল নড়বে না কেউ?

রাইফেলের কালো নল উঁচু হয়ে ওঠে। চকচকে চিকন সে নলের গায়ে আছড়ে পড়ে হাজার দৃষ্টি।

চলো থানায়।

গর্জে সৈনিকের কণ্ঠ। ইলা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলে থুতু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নলের মুখে পরাস্ত হয়ে ওরা থানার দিকে যাচ্ছে। গরু-ছাগলের মতো ডাণ্ডা-পেটা করে ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নাচোল থানায়, যে থানায় তফিজউদ্দীনের প্রেতাত্মা এখনো নির্মম নিষ্ঠুরতায় চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সৈনিকদের হিংস্র দৃষ্টিতে পৈশাচিক উন্মাত্ততা, ইলা মিত্রকে ধরা হয়েছে। ওরা চিৎকার করছে অশ্লীল ভাষায়, ধরা হয়েছে ডাইনি মাগিকে, ওকে এখন ন্যাংটো করে চামড়া তুলে ফেলে সারা শরীরে লবণ মাখিয়ে দাও। আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা ওকে শায়েস্তা করি, বুঝিয়ে দেই, যে পুলিশ হত্যার কাজটি এত সহজ নয়।

দুকান বধির করে থানার চত্বরে এসে পৌঁছে ওরা। লোকজনের মধ্যে ছুটোছুটি পড়ে যায় ইলাকে দেখার জন্য।

এই সেই নারী! কৃশকায় শীর্ণাঙ্গী তরুণী! এই এতবড় আন্দোলনের নেত্রী!

যারা ওকে দেখেনি, তারা বিশ্বাস করতে চায় না। যারা আক্রোশে উন্মত্ত, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর, বুটের লাথি, ঘুষি, বেত্রাঘাত এবং চাবুক কোনোটাই বাদ যায় না। তারপর ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় একটি কক্ষে।

ইলা পাথরের মতো অনড়, নির্যাতনে ওর মুখে শব্দ নেই, যন্ত্রণায় ওর চোখে জল নেই। ও মহাকালের আকাশের নিচে কালো পাথরের মূর্তি, যার শরীরের ওপর দিয়ে শতাব্দীর ঝড় বয়ে যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪

বল, পুলিশ হত্যার হুকুম দিয়েছিল ইলা মিত্র? বল, বললে শাস্তি মাফ করে দেব।

কথা নেই, গরুর মতো নির্বোধ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে ওরা।

কথা নেই। বাতাসে চাবুক নড়ে ওঠে, সে চাবুক সপাং সপাং পড়ে পিঠে, ছিঁড়ে যায় জামা কিংবা ফতুয়া, উদোম হয়ে যায় কালো কুচ্‌কুচে পিঠ। বুটের লাথিতে ফেটে যায় চামড়া, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে। সে রক্ত গড়িয়ে স্পর্শ করে অপরের শরীর। ওরা কথা বলে না, কেউ কারো দিকে তাকায় না। ওরা রক্ত দিয়ে নিজেদের বন্ধন দৃঢ় করে।

বল, ইলা মিত্র হুকুম দিয়েছিল? স্বীকারোক্তি দিলে তোরা ফিরে যেতে পারবি নিজেদের বাড়িঘরে। বল, একটা কথা বল?

সাড়া নেই। প্রচণ্ড মারপিটের পর বৃন্দাবন সাহার ডান হাতের আঙুলের মধ্যে লোহার পিন পুঁতে দেয়া হয়। অজ্ঞান হয়ে যায় বৃন্দাবন সাহা। প্রবল ঘৃণায় দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রাখে ইলা।

বল তোদের সঙ্গী মতিলা কোথায়?

তলপেটে বুটের লাথিতে হৃৎপিণ্ড নড়ে ওঠে।

বল কোথায়?

জানি না।

রমেন মিত্র, শুয়োরের বাচ্চা, ভারতের দালাল, কোথায় সে?

জানি না।

নষ্ট মেয়ে মানুষ, পাকিস্তানের শত্রু, তেজ এখনো কমেনি দেখছি? জানি না কোথায়? দেখাচ্ছি মজা!

বাতাসে চিরে যায় চাবুক, শূন্যে উঠলে শব্দ ওঠে, নিচে নামলে শব্দ ওঠে। শারীরিক নির্যাতনে মুমূর্ষু হয়ে নেতিয়ে পড়লে ওকে টেনে-হিঁচড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারান্দায় আনা হয়। ও বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে প্রিয় মানুষগুলোর দিকে। প্রতিটি মুখ লাঙলের ফলায় ক্ষত-বিক্ষত চষা ক্ষেত, রুক্ষ ধু-ধু ধূসরতা শাদা আস্তর বিছিয়ে দিয়েছে সে চেহারায়। কাউকে আলাদা করে চেনা যায় না—সবাই এক। ইলার দৃষ্টি ওদের মুখ, চুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরতে থাকে।

জানোয়ারগুলোর একটারও মুখে কথা নেই। স্বীকার কর যে, তোরা পুলিশকে মারতে চাসনি। মারবার হুকুম দিয়েছিল ইলা মিত্র। বল, একবার বল!

থমথম করছে থানার প্রাঙ্গণ। চাবুক এবং বুটের লাথিতে লুটিয়ে পড়ে ওরা। ঝাড়ু কোচ আর বিজু মাঝি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নিথর হয়ে যায়। আস্তে আস্তে শীতল হয়ে আসে দেহ। ওদের জন্য কারো কোনো কান্না নেই। শুধু ইলা মিত্রের দুচোখ জলে টলটল করে। ও বোঝে, এ শোক অর্থহীন।

এখনো কথা বলবি না তোরা?

ওরা একদৃষ্টে উদ্যত চাবুকের দিকে তাকিয়ে থাকে, বুক ফেটে যায়, শব্দহীন চোখের মণিতে ফুটে ওঠে ভাষা, আমরা মৌনব্রত অবলম্বন করেছি। এই কণ্ঠ দিয়ে কোনোদিন কোনো বর্ণমালা নির্ঝরিত হয়েছিল কি না, আমরা জানি না। আমরা ভুলে গেছি পূর্বপুরুষের ভাষা। আমরা পারি এখন গরুর মতো তাকিয়ে থাকতে। বুঝতে পারছি না, ওরা কি বলছে। আমাদের বোধশক্তি স্তব্ধ, আমাদের কর্ণ বধির, আমাদের জিহ্বা কর্তিত। দোহাই লাগে, তোমরা আমাদের কোনো কিছু উচ্চারণ করতে বলো না। আমরা ভুলে যেতে চাই পূর্বপুরুষদের ভাষা। প্রভু জিঁয়ো আমাদের শক্তি দাও, শক্তি দাও।

তোরা যতক্ষণ না কিছু স্বীকার করবি, ততক্ষণ তোদের ছাড়া হবে না। প্রয়োজন হলে গোটা দলকে মেরে শুটকি বানিয়ে রাখব এখানে।

তোমাদের মুখের ওপর ঠা-ঠা হাসতে পারলে আনন্দ হয় আমাদের, তোমাদের মুখগুলো থুতু দিয়ে মাখামাখি করে দিতে চাই। তোমরা ভুলে যাচ্ছ যে, বিশ্বাসঘাতকতা কাকে বলে আমরা তা জানি না। আমরা মাটি চিনি, মা চিনি, বিশ্বাসঘাতক চিনি না। তোমরা মিছেই আমাদের পিছে শক্তি ব্যয় করছো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবল পিটুনির মুখে মাথা নিচু করে আছে হরেক। ওর মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত পড়ে। ওকে পেটাচ্ছে তিন চারজনে একসঙ্গে। সবাই উদগ্রীব হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, এই বুঝি হরেক বলে দেয় রানীমার নাম। কিন্তু না, হরেক এক ঝটকায় মাথা সোজা করে, মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়। ওরা ওকে চিৎ করে ফেলে। তারপর সমানে বুটের লাথি চালায় বুকের ওপর। মুখে ওদের বীভৎস হাসি, ঠোঁটে একটাই বাক্য, ওদের মুখ থেকে ইলা মিত্রের নামটা উচ্চারণ করানোর আপ্রাণ চেষ্টা। যতক্ষণ না হরেকের কালো-পাথরের খোদাই করা পোটানা শরীর নিঃসাড় হয়ে আসে, ততক্ষণ চলতে থাকে নির্মম নিষ্ঠুরতা। হরেকের মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে প্রবল স্রোতস্বিনী হয়ে বেরিয়ে আসছে রজঃ, মুখে গোঙানি কিসের ও ধ্বনি? ও কিসের ধ্বনি? প্রভু জিঁয়ে, আমাদের পাথর করে দাও। অল্পক্ষণে পাথর হয়ে যাক হরেক। একজনের পর আরেকজন, তারপর আরেকজন, তারপর আরো। একে একে অনেকগুলো মানুষ মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের না করে, রক্ত উঠিয়ে ঘরে যায়। ভিড়ের মধ্যে সতু ব্যাপারী পিটুনি খেয়ে নিঃসাড় পড়ে আছে, ওর কোনো শারীরিক বোধ নেই। আজমল তখনো অজ্ঞান হয়নি, প্রবল যন্ত্রণায় ছটফট করে। দেখতে পায়, দুহাত সামনে নিশ্চল বসে থাকা আজিজ ধনুকের মতো বাঁকা হয় এবং পরমুহূর্তে কাটিয়ে পড়ে। ও বোবার মতো তাকিয়ে থাকে। দূরে বারান্দায় ইলা মিত্র, তখনো তার দৃষ্টি ওদেরকে ছুঁয়ে যায়, এক মুহূর্তের জন্য চোখ ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব হয় না। ওর ঠোঁট কাঁপে থরথর করে।

জ্ঞান ফিরলে বৃন্দাবন সাহা দেখতে পায়, তখনো বেলা আছে, অন্ধকার গাঢ় হয়নি। একজন পুলিশ লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ঘর, নোংরা, দুর্গন্ধও আসছে। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুটো মোটা লাঠি দিয়ে ওর শরীর চেপে ধরা হয়। ওর দম বন্ধ হয়ে আসে, ছটফটিয়ে উঠলে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় শরীর। একসময় ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়, তারপর শুরু হয় লাঠি দিয়ে পায়ে-পিঠে আঘাত। মারের চোটে ডান হাতের কব্জি এবং বাম হাতের কাপ ভেঙে যায়। থানার দারোগা বুকে লাথি মারলে গলা দিয়ে রক্ত পড়ে।

ও অস্ফুট আর্তনাদ করে, জল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন সেপাই মুখে পেশাব করে দেয়। বৃন্দাবন সাহার আর কিছু মনে থাকে না। ইলাকে আবার ছোট ঘরে নিয়ে আটক করা হয়েছে। ও মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকে।

বাইরে কালো মানুষগুলোর বুকের মধ্যে মহাকাল স্তব্ধ। ওরা মৃত্যু দিয়ে স্বদেশের ঋণ শোধ করেছে। যারা বেঁচে আছে, ওদের আটক করার দরকার হয় না। ওদের নড়ার কোনো শক্তি নেই, পালিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষাও না। খোলা আকাশের নিচে দিগন্ত-ছোঁয়া অন্ধকারের পটভূমিতে মানুষগুলো মাথা কুটে মরে, প্রভু আমাদের আলো দাও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫

কুঁকড়ে যাচ্ছে শরীর, শীতের কাঁপুনিও এখন আর অনুভূত হচ্ছে না, নির্জন সেলে ভৌতিক নিস্তব্ধতা, মেঝেতে নিস্পন্দ পড়ে আছে ইলা, পিঠে দাগ, জ্বালা করছে। কপালের কাছ থেকে হয়তো রক্ত ঝরছে, ও হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখে না। পা টনটন করছে, বুকে যেন কিসের শব্দ, ও চোখ বুঁজতে পারছে না, বুঁজলেই হরেকের মুখ দেখতে পায়। এ কেমন হরেক? মুখে একটাও শব্দ নেই, ওরা প্রিয় গরুটির মতো অসহায়, কেবল দৃষ্টি প্রসারিত করে রাখে, বুটের নিচে সঙ্কুচিত হয়, প্রসারিত হয় এবং একসময় সব শক্তি ঊর্ধ্বে চলে যায়। ভেসে আসে এস আই-র জল্লাদ কণ্ঠ, হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করলে তোমাকে উলঙ্গ করে ফেলা হবে। ও এখন নগ্ন। ওর বস্ত্র হরণ করা হয়েছে। ও ছোট্ট কুঠুরিতে বন্দী। বস্ত্র তো একটা বাইরের আবরণ মাত্র, ওটুকু নিয়ে গেলে কি হয়? হরেক তো আরো বিশাল কিছু দিয়েছে, এই পৃথিবীর সমান একটা কালো রঙের হৃৎপিণ্ড। ওর মাথা টনটন করছে। মাথা ধরলে কপালে হাত বুলিয়ে দিত রমেন, বেশি কষ্ট পেলে ওর শাশুড়ি জবাফুলের সঙ্গে জল মিশিয়ে মাথার তালুতে ঘষে দিতে দিতে বলত, বৌমা শরীরে যত্ন নিতে হয়। তুমি একদম শরীরের যত্ন নাও না।

শরীর? যত্ন নেয়ার সময় তো ছিল না। সেই শরীরের ওপর এখন হাজার শকুনের নখর। অসংখ্য তালগাছ ছিল বারোটা গ্রামের চারপাশে। সেই তালগাছের মাথায় ডানা মেলে রোদ পোহাত কতশত শকুন। কখনো তো মনে হয়নি ওগুলোর নখ এত বিষাক্ত, নিমেষে পুড়িয়ে খাক করে দেয় পা থেকে মাথা পর্যন্ত, ছিন্নভিন্ন করে ফেলে মানবজীবন? আহ্, ইলা যন্ত্রণায় কাতরায়। জল? শুকনো জিহ্বা জল চায়। কে দেবে? এখানে সুখিয়া নেই। পুকুরের জল ফুটিয়ে ন্যাকড়ায় ছেঁকে ওর জন্য ঘড়া ভরে রাখেনি। চাইলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি জল পাওয়া যায়। ও জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে, কোথাও বিন্দুমাত্র সিক্ত বস্তু নেই, বৈশাখে চণ্ডিপুরের মাটি এমন কঠিন হয়, ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আহ্, ইলার কণ্ঠে আবার গোঙানি। মাগো, ওর হাত উঠে আসে, মাথায় কপালে বুলোয়। আমার কি আছে, ওরা আর কিইবা নিতে পারে। আমার সবই তো ত্যাগ করেছি। ওরা যা নেবে তা নিয়ে যদি এই জীবন সার্থক হয় তাতে আমি রাজি। তার বদলে এই জনপদের মানুষগুলো আমাকে ফিরিয়ে দিক, ধুয়ে যাক রক্তের দাগ।

আহ্, ও মেঝেতে মাথা রাখে। সন্ধ্যায় সেপাইরা বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথায় মেরেছে, তখন কানের ভেতর কেমন শব্দ হচ্ছিল, ভোঁ-ভোঁ। ছোটবেলার খেলা কানামাছি ভোঁ-ভোঁ। কিছুদিন আগে চন্দরার বাড়িতে একটা বড় বোলতা ওর নাকের পাশ দিয়ে অমন ভোঁ-ভোঁ শব্দ করছিল। ওর ভালোই লাগছিল। বেশ একটা রাজকীয় ভঙ্গি ছিল বোলতারটার রঙিন শরীরে। কিন্তু চন্দরার পছন্দ হয়নি। ও একটা ঝাঁটা এনে বেশ খানিকক্ষণের চেষ্টায় বোলতাটাকে পিটিয়ে মারে। চন্দরার ঘরের বারান্দায় ওটা চিৎ হয়ে পড়েছিল। ইলা বলেছিল, মারলে কেন চন্দরা?

আপনাকে জ্বালাতন করছিল যে।

ওটা তো আপন মনে উড়ছিল।

আপনাকে জ্বালাতন করলে আমি সইব কেন?

এখন চন্দরা কোথায়? সেপাইরা ওর কানের মধ্যে হাজার বোলতা ঢুকিয়ে দিয়েছে। মারের চোটে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করে, প্রচুর রক্ত। ভিজে যায় ওর কাপড়। সাঁওতালদের কার কাছ থেকে যে কাপড় চেয়ে এনেছিল হরেক, এখন সেটা রক্তে ভিজে যাচ্ছে। কি করলে এই রক্ত বন্ধ হবে? ওর সামনে এস আই বসে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে।

এখনো কিছুই করিনি, হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে স্বীকার কর। নইলে ভালো হবে না বলছি?

কাকে বলছে, কে শুনবে এই জানোয়ারের কথা? ইলা রক্তভেজা কাপড় দেখে। চারপাশের মানুষগুলো দেখে। সবার চেহারা এক রকম, সবার শরীর এক রকম, পোশাকও তাই। ওরা কেউ কারো চাইতে আলাদা নয়। ওর ঠোঁট কাঁপে। সে ঠোঁট ফাঁক হয় না। কৈশোরে খেলার মাঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঠোঁট চেপে কষে দৌড় দিত। মনে হতো পাখির মতো উড়ে পৌঁছে যাচ্ছে লক্ষ্যস্থলে।

এস আই বুটের বাড়িতে পা দাপিয়ে বলে, এই কুত্তি, মুখ খুলবি কিনা বল?

কুত্তি? আহ মানবজীবন সার্থক হয়ে গেল। এমন সম্ভাষণ তো কেউ ওকে জানায়নি।

বুঝেছি, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। কুত্তির বাচ্চা কুত্তি। এই তোমরা ওকে নিয়ে সেলে আটকাও।

কতটুকু ঘর এই সেলটা? একজন মানুষ শুতে পারে এমন। তাতে কি, এইটুকু জায়গাই তো আমি চাই। শুধু তাই নয় দাঁড়াবার মতো জায়গা পেলেও আমার চলে। আমি দেখেছি আলো-বাতাসহীন সাঁওতালদের ঘর, জীবনভর অন্ধকারে থাকে ওরা। ঠিকমতো ঘুমুতে পারে না, বর্ষায় ঘরে পানি পড়ে, গ্রীষ্মে সেদ্ধ হয়ে যায়, হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে কি জোটে? তবু তো তোমরা আমাকে শোবার মতো জায়গা দিয়েছো। ইলার কণ্ঠে গোঙানি কমে আসে। ও নিস্তেজ হয়ে যায়। চোখ বুঁজলে এখন আর হরেককে দেখতে পায় না, দেখে হাজার হাজার তীর উড়ে আসছে চণ্ডীপুরের তালগাছের ওপর দিয়ে।

খুট করে দরজা খুলে যায়। টর্চের আলো এসে পড়ে ওর শরীরে। ও নড়ে না, শব্দ করে না, যেন ওরা ওর কোনো নড়াচড়াই দেখতে না পায়, কোনো শব্দ শুনতে না পায়। মুহূর্তে কয়েকটা কাপড় এসে পড়ে ওর সামনে।

তোর কাপড় দেয়া হলো, এগুলো পরে নে।

নিভে যায় চর্টের আলো। ও অন্ধকারে কাপড় পরে নেয়। দরজা খোলা, শীতের বাতাসে ওর হাঁটু কাঁপে ঠকঠক করে। তবু ভালো লাগে। মনে হয় মাথার যন্ত্রণা কমে যাচ্ছে। এ এক স্নিগ্ধ পরশ, ওষুধের মতো কাজ করে। ও দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে বসে থাকে। বাইরে সেপাইগুলোর কথা শোনা যাচ্ছে। ওদের কথা থেকে বুঝতে পারে সে, এখন রাত বারোটা। বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। ইলা তবু সেদিকে তাকিয়ে থাকে। ওর বুকে পিপাসা, গতকাল থেকে ওর সঙ্গে বাইরের কোনো যোগাযোগ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মাগী, ওঠ, চল।

একজন সেপাই হেঁচকা টানে ওকে দাঁড় করিয়ে দেয়। কোথায় যেতে হবে, ও জানে না। জানার ইচ্ছে নেই। অন্ধকার পেরিয়ে যে ঘরে এলো, মনে হলো ওটা কারো বাড়ি। হয়তো এস আই-র হতে পারে। আবার সেই কর্কশ কণ্ঠ গর্জে ওঠে, এখনো সবকিছু স্বীকার কর। একটা স্বীকারোক্তি না দেয়া পর্যন্ত তোর রেহাই নেই।

ইলা বিরক্ত হয়। বারবার একটা কথা শোনার ইচ্ছে হয় না। ও মুখ ফিরিয়ে রাখে, বুঝতে পারে না ওর চোখের নিচে কালো দাগ পড়েছে। ও যেদিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে একটা জানালা। কাছেধারে কোথাও প্যাঁচা ডাকছে। রামচন্দ্রপুর হাটের বাড়িতে প্যাঁচা ডাকলে ওর শাশুড়ি কুপির আলোতে লোহা পোড়াত। বলত, প্যাঁচার ডাক অশুভ। লোহা পুড়িয়ে দিলে অমঙ্গল দূর হয়। ইলা মনে মনে ভাবে, এখানে কোথাও অমঙ্গল নেই। আমি দুকান ভরে প্যাঁচার ডাক শুনতে চাই। তবুও বাইরের খোলা হাওয়া বয়ে আনছে এই শব্দ। এই জানোয়ারগুলোর কোনো কথা শুনলে আমার রক্তপাত শুরু হয়, আমার শরীর খারাপ করে। আবার সেই শরীর খারাপ করা কণ্ঠধ্বনিত হয়, বুঝেছি, ও মুখ খুলবে না। তোমরা ওর মুখ খোলানোর ব্যবস্থা প্রয়োগ করো। বুঝবে কত ধানে কত চাল।

আসলেই স্যার, এমন বজ্জাত মেয়েমানুষ আমরা জীবনে দেখিনি।

হ্যাঁ, আমিও। কোন মা ওকে জন্ম দিয়েছে, তাকে দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

মা, না ছিনালি। কে জানে?

হাসির রোল ওঠে সেপাইদের মধ্যে। অন্ধকার থেকে ঘরের শাদা দেয়ালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ইলা। প্যাঁচার ডাক থেমে গেছে। ঐ ডাকটুকু ওকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল। ডাক থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর আশ্রয়টুকু ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়।

দুজন সেপাই এসে ওর দুবাহু ধরে ঘরের মেঝেতে চিৎ করে শুইয়ে দেয়। ওর দুপায়ের ওপরে নিচে দুটো লাঠি রেখে ওর পায়ে চাপ দিতে থাকে। রুমাল দিয়ে শক্ত করে ওর মুখ বেঁধে দেয়া হয়। যাতে কোনো আর্তনাদ ছড়িয়ে না পড়ে। প্রবল যন্ত্রণায় ওর শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ও হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে চায়, না পেয়ে নিজের চুল ধরে। ও অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের কণ্ঠ শুনতে পায়, এই পাকিস্তানি ইনজেকশনেই মুখ খুলবে।

দেখ না কেমন কুঁকড়ে উঠছে, মুখ না খুলেই পারবে না।

ওর বাপ বোধ হয় ওকে বেড়ালের মাংস খাইয়েছিল। এজন্য এত শক্ত।

ইলা ভাবে, ওর কানের মধ্যেও কেন ওরা পাকিস্তানি ইনজেকশন দেয় না, তাহলে তো সবকিছুর বাইরে চলে যেতে পারে। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে ওরা ওকে ছেড়ে দেয়। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই একজন সেপাই ওর এক গাদা চুল উপড়ে ফেলে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ওর চোখে জল এসে যায়। ও রুমাল বাঁধা মুখে গোঁ গোঁ করে। ওর মনে হয় চেতনা লুপ্ত হচ্ছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, ও হরেককে খুঁজতে যাচ্ছে। হরেকের বাবা একবার বলেছিল, রানীমা এবার হরেকের বিয়ে দেব। মেয়ে দেখেছি। ইলা খুশি হয়ে বলেছিল, সে তো ভালো কথা। আমরা কত ফুর্তি করব। হরেক প্রবলভাবে আপত্তি করেছিল, আমি এখন বিয়ে করব না। রানীমা আমি আপনার মতো সারা জীবন আন্দোলন করব। ইলা পিঠ চাপড়ে বলেছিল, দূর বোকা ছেলে। হরেক মুখ গোমড়া করে বলেছিল, আন্দোলন না করলে আমি বনে গিয়ে থাকব, ফলমূল খাব, পাখি ধরব। আর ফিরব না গাঁয়ে।

এস আই-র কণ্ঠ গর্জে ওঠে, এই ওকে সেলে নিয়ে যা।

ওরা ওর মুখের রুমাল খোলে, মাথা কাত হয়ে যায়। নিঃশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসে। ও উঠতে পারে না। পাকিস্তানি ইনজকেশনের ফলে ও উঠতে পারে না। সেপাইরা ওর পা এবং হাত ধরে ধরাধরি করে সেলে নিয়ে আসে। ইলা চোখ বুঁজে থাকে, মুখ দিয়ে কোনো ক্ষীণ শব্দও বেরুতে চায় না।

সেলে আনার পর এস আই চেঁচিয়ে বলে, এবার ওকে কথা বলতে হবে। কেমন করে কথা বলাতে হয় আমি জানি। এই চারটে গরম সেদ্ধ ডিম নিয়ে আয়।

ইলা একজন সেপাই চলে যাওয়ার পদশব্দ পায়। আবার কি নরক অপেক্ষা করছে ওর জন্য? আর কত করবে ওরা? বাইরে পায়চারি করছে কেউ, বুটের ধ্বনি এসে পড়ছে ওর হৃৎপিণ্ডে। ও লাল-নীল সবুজ হলুদ আলো দেখতে পায়—মাথার ভেতর হাজার প্রজাপতি—রঙের ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। রামচন্দ্রপুর হাটের বাঁশঝাড়ের পাশে বেশ খানিকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গাজুড়ে শত শত লজ্জাবতী ফুল ফুঠে থাকত। ও কখনো নীরবে দাঁড়িয়ে সে ফুল দেখত। হরেক বলত, রানীমা ছিঁড়ে দিই কতকগুলো? ইলা ওকে বাধা দিত, নারে ছিঁড়লে বুঁজে যাবে। এইত সুন্দর লাগছে। নিশিকান্তর মেয়ে পরাগের খুব শখ ছিল খোঁপায় ফুল পরার। ওকে কখনো ফুল ছাড়া দেখেনি ইলা। চমৎকার গড়ন ছিল মেয়েটির। দেখলে চোখ ফেরানো যেত না। ও কি বেঁচে আছে? ও অবচেতনে বিড়বিড় করে, পলাশ ফুলে তোকে চমৎকার লাগছে পরাগ। তুই ভালো থাক, সুখে থাক। ইলার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পলাশ। ও পলাশ ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। তখন প্রচণ্ড এক আর্তনাদে থরথর করে কেঁপে ওঠে ওর শরীর। চার-পাঁচজন সেপাই ওকে জোর করে চেপে ধরে রাখে। একজন ওর যৌন অঙ্গে ঢুকিয়ে দেয় গরম সেদ্ধ ডিম। আগুন, পৃথিবীর সবটুকু জায়গা জুড়ে আগুন, প্রবল এক আর্তনাদের মধ্য দিয়ে ওর সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়।

কত অনন্ত রাত্রি পেরিয়ে গেছে ও জানে না। যখন জ্ঞান ফিরে দেখে ঘরে আলো, নড়ার কোনো ক্ষমতা নেই। জানালার খুব কাছে একটি দোয়েল ডাকছে। ওর কালো পিঠ, শাদা বুক দেখতে পায় ইলা। হাতের তালুতে চোখের জল মুছে বলে তাদের সহ্য করার শক্তি দাও। তোমরা একটি কথাই বলো যেন হেরে না যাই। ওদের কাছে একটি কথা বলার আগে আমার শরীরের ওপর দিয়ে যেন বয়ে যায় এই সেপাইদের মিছিল। দোয়েলটা উড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকে এস আই এবং ককেজন সেপাই।

ওহ্ জ্ঞান ফিরেছে দেখছি। কলজের জোর আছে বলতে হবে।

এস আই ওর পেটে লাথি দেয়, বুটের লাথিতে ওলোটপালোট হয়ে যায় নাড়িভুড়ি। সেপাইরাও ছাড়ল না। লাথি দিল প্রত্যেকে।

এই ওর পায়ের গোড়ালিতে পেরেক ফুটিয়ে দে।

পেরেক ওরা নিয়েই এসেছিল, মুহূর্তে ডান পায়ের গোড়ালিতে ঢুকে যায় পেরেক। ও বুঝতে পারে ভিজে যায় মেঝে, চুল ছড়িয়ে আছে মাথার চারপাশে। ওর চৈতন্যে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ প্রজাপতি। আধা অচেতনে শুনতে পায় বুটের দাম্ভিক আওয়াজ এবং কর্কশ কণ্ঠ, আমরা আবার রাত্রে আসব। তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সেপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে যায় ওরা। বন্ধ হয়ে যায় বাইরের জগৎ। পৌষের এক ফালি রোদ ঘুলঘুলি দিয়ে আড়াআড়িভাবে মেঝেতে পড়েছে। ইলা রোদের দিকে হাত বাড়ায়, মনে হয় মোহন হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে, কাছে ধারে কেউ নেই, মোহনের মুখে স্বর্গীয় হাসি। ইলার এখন তৃষ্ণা নেই, খিদে নেই, কিছু নেই। ও আর নিজের মধ্যে তিষ্ঠোতে পারে না। ও দেখতে পায় মোহন ওর বুকের কাছে এসে শুয়ে পড়েছে, ওর বুকের ওমে মোহন ঘুমিয়ে যাচ্ছে। ইলার কণ্ঠে ঘুমপাড়ানি গান। গান গাইতে গাইতে ওর নিজেও ঘুম পায়। কিন্তু ও ঘুমুতে পারে না, ওর গায়ে শক্তি নেই এবং সেজন্য ঘুম আসে না। কেবল অবচেতন বুদ্বুদ ওঠে, ফেনার মতো ভেসে যায় সে বুদ্বুদ।

আবার আসে ওরা। টর্চের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আবার সেই হুমকি, স্বীকারোক্তি না করলে ধর্ষণ করা হবে। ও প্রবলভাবে মোহনকে জড়িয়ে ধরে। ও কিছুই শুনতে পায় না। মুহূর্তে ওর কণ্ঠে আর্তনাদ ওঠে, মোহন কোথায় যেন ছিটকে পড়ে গেছে, কোথাও মোহনকে খুঁজে পাচ্ছে না। নগ্ন হয়ে যাচ্ছে শরীর, নগ্ন হয়ে যাচ্ছে, নগ্ন হয়ে যাচ্ছে। তারপরও একটা কথা বলে না ও।

চিৎকার করে ওঠে এস আই কথা বল কুত্তি।

ও যন্ত্রণায় কোঁকায়, আগুন ছড়িয়ে যায় দেহের সবখানে। তিন-চারজন ওকে ধরে রাখে এবং একজন ধর্ষণ করতে শুরু করলে সমস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে মুখ ফিরিয়ে ওর চেতন লুপ্ত হয়ে যায়। ওর আর কিছু মনে থাকে না।

এক সময় গভীর রাত ফুরোয়, অন্ধকার কেটে যায়, আলো ফোটে, বাইরে পাখি ডাকে, বাতাসে পাতা নড়ে, ফুল ফোটে, ওর সেলে আঁধার, দরজার ফাঁক-ফোকরে সামান্য আলো আসছে। কষ্ট হয় চোখের পাতা খুলতে, একবার তাকিয়ে ও আবার চোখ বোঁজে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রাখে, না কিছুতেই পরাজয় নয়। শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে রুখতে হবে এই পাশবিক অত্যাচার। হরেক তো মরে গেছে একটি শব্দ উচ্চারণ না করে, তাহলে ও কেন পারবে না? বুঝতে পারে রক্তে ভেসে যাচ্ছে কাপড়, প্রবল রক্তক্ষরণে নেতিয়ে আসছে শরীর, মনে হয় ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে চারদিক। যেন ও পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চলে এসেছে, এই বরফের প্রান্তর ও অতিক্রম করবে কি করে? ইলা কপালের ওপর হাত রেখে নিথর পড়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপেক্ষা করে রক্তপাত, ঝরুক, ঝরে যাক। এই অবস্থায় ওকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ আনা হলো। নবাবগঞ্জ জেল গেটের সেপাইরা জোর ঘুঁষি মেরে ওকে স্বাগত জানাল।

নবাবগঞ্জ জেলের সেলে ওকে ধরাধরি করে নিয়ে এলো কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন সেপাই। রক্তপাতের সঙ্গে বাড়তি উপসর্গ হিসেবে শুরু হয়েছে জ্বর, মাথা ছিঁড়ে পড়তে চায়। জ্বরে পুড়ে যায় গা, ভেসে ওঠে রমেনের মুখ, শুকনো, বিধ্বস্ত, ইলা চিনতে পারে না। ওরা ওকে সেলে রেখে চলে গেলে একজন ডাক্তার থার্মোমিটার দেয় বগলের নিচে। জ্বর দেখে আঁৎকে উঠে বলে, ১০৫ ডিগ্রি! কি সর্বনাশ!

পাঁচ দিন পর এটুকু আশ্বাসের কথা শুনে ও পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, মানুষটিকে দেখে। তাহলে এখনো মানুষ আছে পৃথিবীতে। এ কয়দিন এ এক গভীর অরণ্যে একদল হিংস্র নেকড়ের সঙ্গে ছিল। ও ডাক্তারের হাত চেপে ধরে, ডাক্তার সাহেব? আমার ভীষণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

বুঝেছি, আমি দেখেই বুঝেছি, কি নির্যাতন গেছে আপনার ওপর দিয়ে। আমি যতটা পারি আপনার জন্য চেষ্টা করব। একজন মহিলা নার্স দিয়ে আমি আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। আমার নাম আয়ুব আলি।

ইলা ডাক্তারের হাত ছাড়ে না। ভাঙা গলায় বলে, আপনার হাতযশের কথা আমি অনেক শুনেছি, কিন্তু আপনার সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে, আপনি তো গোটা এলাকায় ঝড় বইয়ে দিয়েছেন।

ইলা ম্লান চোখে তাকিয়ে থাকে। শরীর এত খারাপ যে হাসতেও কষ্ট হয়। চোখের কোণ চিকচিক করে ওঠে। ডাক্তারের উষ্ণ আন্তরিকাতয় ও অভিভূত হয়।

আয়ুব আলি জোরের সঙ্গে বলেন, আমি আশা করছি এখানে আপনার ওপর কোনো নির্যাতন হবে না। থানার ওসি রহমান সাহেব আপনাকে চেনেন। উনি নিজে আমাকে বলেছেন যে আপনি যখন বেথুনে পড়তেন, তখন উনি স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তেন।

পরদিন নওয়াবগঞ্জ সরকারি হাসপাতালের একজন নার্স এসে ওকে পরীক্ষা করে। ওর কিছু বলতে হয় না, নার্স দেখেশুনে সব বোঝে। ওর জ্বর কমে না, রক্তপাত বন্ধ হয় না। কিছুক্ষণ পরপর অজ্ঞান হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্জন একাকী সেলে ও ডাক্তার আয়ুব আলির চিকিৎসাধীন থাকে। নার্স কি রিপোর্ট দিয়েছিল ও জানে না, দেখতে পায় ওর রক্তমাখা কাপড়ের বদলে একটি পরিষ্কার কাপড় দেয়া হলো ওকে। ও কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। মাঝে মাঝে ডাক্তার আসে। দু-একটি কথা হয়, ওষুধ দেয়, কিছু পথ পাচ্ছে। এখানকার দিনগুলো মোটামুটি কেটে যায়। শুধু গলানো ভাত চামচ দিয়ে খেতেও কষ্ট হয় ওর। মনে হয় ভেতরের সব বিকল হয়ে গেছে, সামান্য খাদ্যও গ্রহণ করতে চায় না। গোপনে ওসি রহমান আসে, বেশিরভাগ সময় রাত্রে। ওর মাথায় পানি দেয়। কমলার কোষ হাতে ধরিয়ে দেয়। ছোট্ট একটি প্রশ্ন করে, এখন কেমন লাগছে? ইলা ভালো বলতে পারে না। ওর চারদিকে ভালো কোথাও নেই। জ্বর কমে না রক্তপাত বন্ধ হয় না, এই নির্জন সেল বুকের ওপর পাথর হয়ে চেপে থাকে, যন্ত্রণাও অসহ্য লাগে, ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

ওসি রহমান ওকে আশ্বস্ত করে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখানে আপনার কোনো ভয় নেই। আমি কিছু হতে দেব না। ইলা মৃদুস্বরে বলে, ভয় কিসের? আমার কিইবা আছে? আমি তো সবই হারিয়েছি, আমার সর্বস্বের বিনিময়ে যদি হরেককে বাঁচাতে পারতাম!

থাক, বেশি কথা বলবেন না, বিশ্রাম নিন। রাতে এই সাগুটুকু খেয়ে ফেলবেন।

এই সেলে সাতদিন কেটে যায় ওর। প্রতি রাতে রহমান এসেছে, ওষুধ খাইয়েছে। একদিন দুপুরবেলা ঘরে সামনে হৈচৈ শুনতে পায় ও। কারা যেন বলছে ইলাকে ওদের হাতে তুলে দিতে। ওরা ওকে বানিয়ে ছেড়ে দেবে। ওসি রহমান তীব্রস্বরে বলে, ও কোর্টে বিচারাধীন, ওর গায়ে কেউ হাত তুলতে পারবে না।

ঐ কণ্ঠস্বর শোনার পর ইলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ বোঁজে। পথ্য এবং ওষুধে কোনো কাজ হয়নি, শরীরের প্রতিটি জোড়া খুলে আসতে চায়। একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি স্ট্রেচার নিয়ে কয়েকজন সেপাই এসে দাঁড়াল ওর সেলে।

নির্বিকার গম্ভীর কণ্ঠে জানাল, পরীক্ষার জন্য অন্য জায়গায় যেতে হবে। ইলা জানতে চায় না যে কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে। ও শুধু বলে, আমার শরীরে ব্যথা, আমি উঠতে পারব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাম করে একটা বেতের বাড়ি এসে পড়ে মাথার ওপর। মুহূর্তে ওর চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। প্রতিরোধের স্পৃহা জেগে ওঠে। কিন্তু ওরা আরো কিছু করার জন্য এগিয়ে আসতেই স্ট্রেচারে উঠে শুয়ে পড়ে ইলা। মাথা বোধহশক্তিহীন হয়ে যায়।

ও বুঝতে পারল যে ওরা ওকে যেখানে নিয়ে এসেছে সেটি একটি বাড়ি। জানালার নীল পর্দা ঝুলছে। ঘরে একটি চৌকি এবং টেবিল। ছেঁড়া চাদর, তেল চিটচিটে বালিশ থেকে ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। ইলা আধা অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। কে যেন ওর মুখে এক চামচ ওষুধ দেয়, ঠোঁটের দুপাশ বেয়ে ওটা গড়িয়ে পড়ে যায়। ওর সামনে একটা শাদা কাগজ এগিয়ে দেয়া হয়, এটাই সই করো। নিমীলিত চোখের তারায় সবকিছু শূন্য মনে হয়, মাঠ-ঘাট-প্রান্তরে ঘন কুয়াশা পড়ে আছে, এক হাত দূরেরও কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না। অথচ ওকে যেতে হবে অনেক দূরে। জানালার নীল পর্দাটা কি মাছরাঙা পাখি? জ্বরের ঘোরে তাকাতেও কষ্ট হয়, চোখের পাতা ভারি হয়ে আছে। চারদিকে বুটের শব্দ, এগিয়ে আসছে ওর দিকে। বুটের শব্দে ঝড় উঠেছে, উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বসতি এবং মানুষ।

ভারি কর্কশ কণ্ঠ গর্জে ওঠে, এখানে সই করো।

ও নিজে সই করবে না। ওকে দিয়ে সই আদায় করে নাও।

ওকে বসিয়ে দেয়া হয়। একজন ওর ঘাড়ের ওপর হাত দিয়ে রেখেছে। একজন বাম হাত ধরে রেখেছে, অন্যজন ডান হাতে কলম গুঁজে দিয়ে শাদা কাগজের ওপর চেপে ধরে আঙুল। ওর মাথা নুয়ে যায় টেবিলের কাছাকাছি।

আবার সেই কণ্ঠ, ওকে দিয়ে লিখিয়ে না নিলে হবে না। তোমরা জোর করে হাত চেপে ধরে কলমটা কাগজের ওপর বুলিয়ে নাও।

ততক্ষণে মসৃণ কাগজের ওপর ফুটো উঠেছে দাগ, সাদা কাগজে আঁকাবাঁকা হরফে চিত্রিত হয়েছে একটি নাম। ইলা এক পলক তাকায়, বুঝতে পারে ওটা ওর নাম নয়, ওটা হরেকের হাতের বল্লম, কিংবা শুক্র মাডাং-এর বর্শা, নয়তো হাজার হাজার তীর দ্রুত ঢুকে যায় তফিজউদ্দীন দারোগার বুকে। পরমহূর্তে নামটা কার্তুজে রূপান্তরিত হয়ে গেলে ইলা গড়িয়ে পড়ে বিছানায়, বসে থাকার সাধ্য ওর নেই। শুধু বুঝতে পারে ঐ কার্তুজটা এখন ওর হাতের মুঠোয়, ওর সামনে যুদ্ধ, আবার যুদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন অবস্থা আরো বেশি খারাপ হওয়ায় ওকে পাঠানো হলো নওয়াবগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে। ও দেখতে পায় না আয়ুব আলি ঝুঁকে আছে ওর মুখের ওপর, ইনজেকশন দিচ্ছে, কপাল কুঞ্চিত, ভুরুর মাঝখানে উঁচিয়ে আছে চিন্তিত রেখা। জ্বরের ঘোরে ও ভুল বকে। ওর মাথা ধুয়ে দেয় একজন নার্স!

দ্রুত অবস্থা খারাপ হতে থাকে। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চেহারা, বেরিয়ে আসছে গলার হাড়, বুকের খাঁচা, ভেঙে যাচ্ছে চোয়াল, দুহাতে জেগে উঠেছে রগ, চোখের দৃষ্টিতে দীপ্তি নেই, যেন মণিজোড়া দ্রুত নির্বাপিত হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

এই অবস্থায় রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে জেল হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়া হলো। মহিলা ওয়ার্ড, চারদিকে লোক। মানুষের মাঝে এসে ও বুকভরে নিঃশ্বাস নেয়। ওর বিছানার পাশে ভিড় করে মহিলারা, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, একে অপরের সঙ্গে কথা বলে। দু-একজন সাহস করে জিজ্ঞেস করে খুব মেরেছে বুঝি আপনাকে? ইলা ঘাড় কাত করে। ইস, চেহারা কেমন হয়েছে! আরেকজনের বিস্ময়। এরা মানুষের বাচ্চা না? অপরজন ঘৃণায় কুঞ্চিত করে ঠোঁট। ঘোমটা-পরা বৃদ্ধা যখন প্রশ্ন করে, আপনে ক্যাংকা কর‍্যা সইলেন? তখন ওর চোখে জল আসে। বৃদ্ধা আবার বলে, আল্লাহ আপনেরে তাড়াতাড়ি ভ্যালো করে য্যান। আহারে কচি মেয়েডা। বৃদ্ধা দোয়া পড়ে। বৃদ্ধার দাঁত নেই, গালের চামড়া কুঁচকে আছে, দৃষ্টি ঝাপসা। হয়তো এক শতাব্দীর জীবন সে যাপন করেছে। নিজের বিছানা ছেড়ে খুব কষ্টে ওকে দেখতে এসেছে, সান্ত্বনার কথা বলেছে। মনে মনে তাকে প্রণাম করে ইলা বিড়বিড় করে, তবু কোনো অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলিনি। ওরা আমার মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬

নাচোল থানায় চারদিন অমানুষিক অত্যাচারের পর ওদের নিয়ে আসা হলো চাঁপাইনবাবগঞ্জ থানায়। এর মধ্যে ধরা পড়েছে অনেকে। শেখ আজাহার হোসেন আর অনিমেষ লাহিড়ী ধরা পড়েছে রামচন্দ্রপুর শেখ আজাহারের বাড়িতে। ট্রেনে করে পালিয়ে যাচ্ছিল বেশ কিছু সাঁওতাল, তাদেরকে রাজশাহীর কাছে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার হয়ে আসতে থাকে আরো অনেকে। গ্রেফতার হয় এত অসংখ্য সাঁওতাল কৃষক যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাব জেল পূর্ণ হওয়ায় কয়েক দফায় আসামীদের পাঠানো হয় রাজশাহী জেলে। ওরা এখনো জঙ্গি, তেজী এবং একরোখা। চিগুরায় দাঁত মেলে হাসে, ওরা আমাদের ধরবে ধরুক, মারবে মারুক, জেলে ভরবে ভরুক, আমরাও শেষ দেখতে চাই।

সোমায় সারেন মাথা নাড়ে, রানীমা কেমন আছে?

জানি না।

কেউ কিছু জানে না। রানীমার কি হচ্ছে, ওরা বলতে পারে না।

হরেকের মৃত্যু ওদের ক্রুদ্ধ করে এবং পরক্ষণে ব্যথিত। ওরা নিরুপায় হয়ে ভাবে, আসলে ওদের কিছু করার নেই। আবার নতুন করে বসতি হবে, আবার নতুন করে শুরু।

কোথায় কে যেন আর্তনাদ করে। ওরা অচেতনে কেবল আর্তনাদের শব্দ শোনে। গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি হয়ে হাজতের ছোট ঘরে বসে থাকতে থাকতে ওরা রানীমার কথা ভাবে।

আজমল উঠে বসতে পারে না। ও বুঝতে পারে, ভেতরের কোথাও কোনো হাড় ভেঙে গেছে। সতু ব্যাপারীকে দেখতে পায় না। ওকে খোঁজার মতো অবস্থাও নেই। ওর চিকিৎসা দরকার। চিকিৎসা কোথায় পাবে? ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোলাটে চোখে বন্দী হয়ে আসা জনস্রোত দেখে। কত মানুষ যে এরা গ্রেফতার করেছে! কত? হাজার? লক্ষ? কারো কারো হা-হুতাশ নেই, কান্না নেই। ওরা বুক টান করে দাঁড়ায়, পিটুনি খায় এবং গায়ে গা লাগিয়ে বসে থাকে। আজমল মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়।

পুলিশ হত্যা সম্পর্কিত মামলাটি রাজশাহীর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজেস্ট্রিট আহমদ মিয়ার কোর্টে ন্যস্ত করা হয়। আসামী একত্রিশ জন। ওদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান পেন্যাল কোডের ১৪৮, ৩০২/১৪৯ এবং ৩৩৩/৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়। শেখ আজাহার হোসেন ভাবে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত থাকা সত্ত্বেও মামলার বিচার এখানে না করে নিয়ে যাওয়া হলো রাজশাহীতে। কেন? ওরা কি ভয় পাচ্ছে এই এলাকাকে? ওরা কি ভাবছে, এখানকার মানুষ আবার জেগে উঠবে? পুড়িয়ে দেবে আদালত ভবন, কেড়ে নিয়ে যাবে আসামীদের? শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিধ্বস্ত আজাহার হোসেন হাঁটতেও পারে না। থানা হাজতের ছোট জানালা দিয়ে তাকালে আমগাছের মাথা দেখা যায়। সেখানে প্রচুর কাক বসে আছে। যারা মরে গেছে, তাদের কি করেছে ওরা? বৃন্দাবন সাহা কেমন আছে? ইলা মিত্র? আজাহার হোসেনের হাঁটুতে ব্যথা, হাঁটতে খুব কষ্ট হয়, পিপাসায় বুক ফেটে যায়। তবু থুতু গিলে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে চুপচাপ বসে থাকে। দেখে, গাছের মাথা থেকে কাজের ঝাঁক উড়ে চলে যাচ্ছে।

ওরা জেনেছে, ইলা মিত্র এক নম্বর আসামী, অনিমেষ লাহিড়ী দুই, শেখ আজাহার হোসেন তিন, বৃন্দাবন সাহা চার।

অনিবেশষ লাহিড়ী কনুই দিয়ে ঠেলা দেয়, কি শুনছো? আজাহার হোসেন বলে, আসামীরা কে কত নম্বরে দেখছি।

লাভ কি?

লাভ।

আজাহার হোসেন থমকে যায়, লাভ নেই।

ভাবছো শাস্তির মাত্রা কি হবে?

না। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে যখন নেমেছি, তখন থেকেই জানি যে, এপথ কুসুম বিছানো নয়।

অনিমেষ লাহিড়ী স্বগতোক্তি করে, সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। পেলামই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না হয় সে সাজা। হরেকদের মৃত্যু কি আমাদের পথ দেখায়নি?

দেখিয়েছে।

শেখ আজাহার গভীর প্রত্যয়ে বলে। দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ।

রমেন আর মাতলা ধরা পড়েনি।

ওরা হয়তো সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেছে।

কে জানে।

এরা আমাদের রাজশাহী জেলে নিয়ে যাবে।

হ্যাঁ।

দুজনে আবার চুপ হয়ে যায়। বাইরে বুটের শব্দ, খিস্তি এবং উচ্চৈঃস্বরে গালাগালি। থানাকে এরা নিজেদের জগৎ করেছে, সুতরাং যেভাবে খুশি, সেভাবে চলবে। কারো কিছু বলার নেই।

শেখ আজাহারের ঝিমুনি আসে। ও দেয়ালে হেলান দিয়ে মাথা ঠেকিয়ে রাখে। পুরো ঘটনা ওর সামনে ভেসে ওঠে এবং ও আগামী দিনও দেখতে পায়। দেখতে পায় নির্জন সেলে মৃত্যুর জন্য প্রহর গুনছে। ওর ঘুম গাঢ় হতে থাকে। অনিমেষের কাঁধের ওপর ওর মাথা ঝুঁকে যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭

রাজশাহী জেলের হাসপাতালে শুয়ে আছে আজমল। ওষুধের গন্ধ ওকে বিষণ্ন করে দেয়। ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে জবাফুলের গাছটা দেখতে পায়। প্রচুর ফুল ফুটেছে। ও নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। গতকাল থেকে ওর আবার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। নিঃশ্বাস নিতে গেলে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। ওর দম আটকে আসে, চোখ দিয়ে পানি পড়ে। তখন ওর অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। ছয় মাসের ওপর হাসপাতালে আছে, কিন্তু ভালো হবার কোনো লক্ষণ নেই। এতদিন ওর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেনি। ওর কাছেও বাইরের কোনো খবর নেই। ভোলাহাটের কথা মনে হয়। মনে পড়ে কয়েদ চাচা ও কুতুবকে। ভোলাহাটের জীবন থেকে ও পালাতে চেয়েছিল, সে জীবন ওর পছন্দের ছিল না। চরিত্রহীন বাবার নিগড় ছিল ওর কাছে পীড়ন, ও চেয়েছিল ভিন্ন জীবন। আজিজের আদর্শ ওকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং এক তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ও ছুটে এসেছিল নাচোলে। এখানকার সাধারণ মানুষের সংগ্রামে নিজেকে একজন ভেবে গৌরববোধ করেছিল। ওর গ্লানি কেটে গিয়েছিল। ওর মনে হয়েছিল, এতদিনে ও নিজের মতো করে দিন পেয়েছে—যে দিনগুলো ওর একান্তই আপন, কাছের এবং নিজস্ব। যে দিনগুলোর ভাষা ওর স্বাভাবিক জীবনযাপনের এক ব্যতিক্রম। ওর কোনো দুঃখ নেই, কষ্টও না। বিছানায় শুয়ে ও আকাশ দেখতে পায় না, বাইরের পৃথিবীও না। তবু তো মনে হয়, এই ভালো, কোনো একটা বড় কাজের একটা বিন্দু হতে পেরেছে, এটা ওর সঞ্চয়, এ সঞ্চয় আমৃত্যু ওকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগাবে।

ওর কিছু ভালো লাগছে না, ও ছটফট করে। আশেপাশে নার্স নেই। ও অবশ্য প্রবল কষ্টেও নার্সের তোয়াক্কা করে না। বুকের নিচে বালিশ চেপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখে এপাশ-ওপাশ করে ও নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে। ওর শরীর ঘেমে ওঠে।

বেলায়েত এগিয়ে আসে, রাজবন্দী, চিকিৎসার জন্য সপ্তাহখানেক ধরে হাসপাতালে আছে। খুব চটপটে এবং করিৎকর্ম। এর মধ্যে ওয়ার্ডের সবার সঙ্গে আলাপ করে ফেলেছে। কারো কিছু প্রয়োজন হলে ছুটে যায়। নাচোলের ঘটনার কারণে আজমলকে সমীহ করে। তার ওপর পাশাপাশি বিছানা বলে টুকটাক কথাবার্তা হয় ওর সঙ্গে। মাঝে মাঝে এটা-ওটা খবর দেয়। আজও এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রাখে, আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে আজমল সাহেব?

ও মাথা নাড়ে, অক্সিজেন।

অক্সিজেন? ওয়ার্ডে তো কোনো নার্স দেখছি না। কি করি? এই শুয়োরের বাচ্চারা ডিউটি না করতে পারলেই বেঁচে যায়। দেখি আমি কি করতে পারি?

বেলায়েত দরজার দিকে যায়। ওর পায়ে কি যেন হয়েছে, সেজন্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। বেশি হাঁটলে ওর ব্যথা বাড়ে, কিন্তু ডাক্তারের উপদেশ ও বেশি আমল দেয় না।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে হাত উল্টায়, আশেপাশে কেউ নেই। একজন ওয়ার্ড বয়কে ধরলাম, ব্যাটা বলে যে এই ওয়ার্ডের অক্সিজেন সিলিন্ডার অন্য ওয়ার্ডে নিয়ে গেছে। এখন আনতে পারবে না। ইচ্ছে হচ্ছিল ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম।

বেলায়েত ওর বিছানার পাশের টুলের ওপর বসে। আজমলের মনে হয়, ওর কষ্ট অনেক কমে এসেছে। কিছুটা আরাম লাগছে। ও চিৎ হয়ে শ্বাস নেয়। বেলায়েত ঝুঁকে ওর কানে কানে বলে, জানেন, কোর্টে ইলা মিত্র নাকি দারুণ বিবৃতি দিয়েছে। সবার মুখে মুখে এই এক কথা।

আজমল চোখ বড় করে শোনে। ও বেলায়েতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ও কি কোনো নতুন খবর বলতে পারবে? ও বেলায়েতের হাত চেপে ধরে, বলুন না আর কি জানেন?

এখনো তেমন কিছু জানি না। তবে খবর পড়ব। গোপনে আমার কাছে কাগজপত্র আসে।

কিভাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে আপনি বুঝবেন না। আমরা রাজনীতি করে জেলে, আমাদের অনেক পথ আছে। তবে পুলিশ হত্যা মামলার বিচার চলছে তো, এখন রাজশাহীতে ছাত্ররা খুব তৎপর। ওরা জনমত গড়ার চেষ্টা করছে।

আজমল বড় করে শ্বাস নিয়ে চোখ বোঁজে, ক্লান্তি লাগছে। বেলায়েত নিজের বিছানায় ফিরে যায়। যাবার আগে বলে, সরকারের দমননীতির কারণে বড় ধরনের প্রতিবাদ জানানো তো সম্ভব নয়। তাই ছাত্ররা কালো ব্যাজ পরে কোর্টে আসে। কোর্ট লোকে লোকারণ্য থাকে। সর্বত্র দারুণ উত্তেজনা। জেলের ভেতরেও তার ঢেউ এসে লেগেছে।

কালো ব্যাজ? আজমলের চেতনায় কালো শব্দ লেপ্টে যায়। কালো ব্যাজ, কালো মানুষ, কালো মাটি। ও গভীর কিছু ভাবার আগেই আবার ব্যথা বাড়ে। বুকের ওপর হাত রেখে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে পড়ে থাকে। ইদানীং ঘন ঘন ব্যথা উঠছে। দ্রুত শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মাথা ঝিমঝিম করে, মনে হয় শক্তি নেই। হঠাৎ করে কখনো মনে হয়, দিন কি ফুরিয়ে আসছে? তখন আর কোনো কিছু ভালো লাগে না।

কয়েকদিন পর বেলায়েত বলে, জানেন, কম্যুনিস্ট পার্টি ইলা মিত্রের জবানবন্দী ইশতেহার আকারে বিলি করে প্রচার করছে। খবর কাগজে তো কিছু ছাপা হবে না। এভাবে সাধারণ মানুষ মুসলিম লীগ সরকারের নৃশংসতার কথা জানতে পারবে। কি বলেন?

ঠিকই বলেছেন। ইশতেহার আপনি পাননি?

এখনো পাইনি। পেয়ে যাব দু-একদিনের মধ্যে।

জানেন রাজবন্দী ভানুদেবী আর মনোরমা বসু এই জবানবন্দী দেয়ার পেছনে সাংঘাতিক ভূমিকা পালন করেছে।

কেমন?

ওঁরা ইলা মিত্রকে বলেছেন, সব সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে অত্যাচারের পুরো বিবৃতি দিতে হবে। ভানুদেবী তো জোর দিয়ে বলেছেন, নির্যাতনের কথা হুবহু না বলে এমনিতে জবানবন্দী দিলে তিনি ইলা মিত্রের পার্টি সদস্যপদ বাতিলের জন্য পার্টিতে বলবেন।

তাই নাকি?

আজমল বিস্মিত হয়ে বেলায়েতের মুখের দিকে তাকায়, আপনি এসব কোথা থেকে জানলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলায়েত মৃদু হাসে, আগেই বলেছি না আমার কাছে খবর আসে। অনেক গোপন চ্যানেল আছে। এসব আপনি বুঝবেন না। আপনার শরীর আজ বেশ ভালো মনে হচ্ছে?

কি জানি, আমার তো মনে হয় না।

আজমল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আমি যদি এই মুহূর্তে এই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেতে পারতাম!

কি করতেন?

আমি আবার চণ্ডিপুর ফিরে যেতাম।

ওখানে কি কিছু আছে, সব তো ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

দিক। একজন লোকও যদি থাকে তবু, আমি তার সঙ্গে আবার কাজ করব।

বেলায়েত ওর পিঠে হাত রাখে, কামনা করি আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।

আজমল ওর দিকে তাকায়, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কোটরগত চোখ জ্বলজ্বল করে। বেলায়েত আপন বিশ্বাসে উদ্বেগে তরুণ। ওর ভালো লাগে বেলায়েতের সঙ্গ। ওর সঙ্গে কথা বলে নিজেকে হালকা লাগে। বেলায়েত নিজের বিছানায় ফিরে গেছে। ও বাইরে তাকায়। জবা গাছের ডালে একটা শালিক এসে বসেছে। বুক টন টন করে ওঠে, বিল ভাতিয়া এখন হাজার পাখির ডাকে মুখরিত।

দুদিন পর বেলায়েত উত্তেজিতভাবে ওর বালিশের নিচে একটা ইশতেহার গুঁজে রাখে।

লুকিয়ে লুকিয়ে পড়বেন। এরা যেন টের না পায়।

আজমল ঘোলাটে চোখে ওর দিকে তাকায়, ওর খুব অবসন্ন লাগছে। তবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়, ঠিক আছে। গতকাল ওকে কিছুক্ষণের জন্য অক্সিজেন দেয়া হয়েছে। সাময়িক একটা ভালোলাগা বোধ ছিল, কিন্তু এখন আবার যে-কে সেই। ওর কিছুই ভালো লাগে না। ইশতেহারটা হাতের মুঠিতে নিয়ে রাখে। ডাক্তার রাউন্ড দিয়ে চলে গেছে। একজন নার্স একটু দূরে একজনের ড্রেসিং করছে। ও কাত হয়ে কাগজটা মেলে ধরে :

'কেসের ব্যাপারটি আমি কিছুই জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিগত ৭-১-৫০ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোল নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধোর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে এই বলে এস আই আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখে।'

আজমল আর পড়তে পারে না। কাগজটা দ্রুত ভাঁজ করে বালিশের নিচে রেখে দেয়। ক্রুদ্ধ আক্রোশ ওকে প্রবলভাবে গ্রাস করলে ওর বুকে ব্যথা হয়, প্রচণ্ড ব্যথা। ও দুহাতের মুঠিতে বিছানার চাদর খামচে ধরে। মুখ দিয়ে লালা পড়ে। ওয়ার্ডের বয় ভাতের ট্রে রেখে যায় ওর বিছানার পাশে। এক মুহূর্ত ওকে দেখে। তারপর কিছু না বুঝে বলে, আপনি পানি খাবেন? আজমল উত্তর দেয় না। ও চলে যায়। ওর এখন বাতাস দরকার, বুকের ভেতর বাতাস-শূন্য হয়ে যায়। ও দুহাতে খাটের রেলিং ধরে খিঁচুনি সামলায়। দুপুরে খাবারের পর কিছুটা ভালো বোধ করলে ও আবার কাগজটা বের করে পড়ে।

'আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সেদিন সন্ধ্যাবেলাতে এস-আই-এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময় আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এরপর আমার কাপড়-চোপড় আমাকে ফেরত দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় বারোটার দিকে সেল থেকে আমাকে বের করে সম্ভবত এস আই-এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না।'

কাগজটা ওর পড়তে কষ্ট হয়, অক্ষর ঝাপসা হয়ে আসে। ও ভাবে ওর জ্বলে ওঠা উচিত। কিন্তু না, জ্বলে উঠতে পারে না, জ্বলে ওঠার শক্তি ওর ফুরিয়েছে। ওর চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে, মুখ দিয়ে শব্দ বের হয় না, চোখে জলও নেই। এভাবে, মানুষের এভাবে বেঁচে থাকা উচিত না। প্রত্যেকের কিছু করা উচিত। ওর বুকের ভেতর থেকে ক্রোধ ফুরিয়ে যায়। ও গভীর মমতায় আবার পড়তে শুরু করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যে কামরাটিতে আমায় নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা নানা রকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালাল। দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দুটি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল এবং সে সময়ে চারিধারে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা বলছিল যে, আমাকে 'পাকিস্তানি ইনজেকশন' দেওয়া হচ্ছে। এই নির্যাতন চলার সময়ে তারা একটা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিল। জোর করে আমাকে কিছু বলতে না পেরে তারা আমার চুলও উপড়ে তুলে ফেলেছি। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিল না।

'সেলের মধ্যে আবার এস আই সেপাইদের চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুমুক দিল এবং বলল, 'এবার সে কথা বলবে।' তারপর চার-পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চিৎ করে শুইয়ে রাখল এবং একজন আমার যৌন অঙ্গের মধ্যে একটা গরম সেদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।'

আজমলের মুখ থেকে আকস্মিকভাবে অস্ফুট ধ্বনি বের হয়। ও দ্রুত হাতে বুক চেপে ধরে। ও বুঝতে পারছে যে, এই উত্তেজনা ওর পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। মানুষের বর্বরতার এই অমানবিক কাহিনী ওকে চুম্বকের মতো ধরে রাখে। তার ওপর কাহিনী এমন একজনের, যে ওর অত্যন্ত কাছের এবং অত্যন্ত প্রিয়। যার সঙ্গে কারো কোনো তুলনা হয় না। বেলায়েত ওর কাছে উঠে আসে, পড়েছেন?

ও দুহাতে চোখের জল মুছে বলে, পড়তে পারছি না।

ঠিকই বলেছেন। পড়া যায় না। এই ইশতেহার পূর্ব বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলে মানুষ জানবে, কত ঘৃণিত এবং নৃশংস কাজ করতে পারে এই সরকার।

আজমল শ্বাস নেবার চেষ্টা করে, পারে না।

বেলায়েত তাড়াতাড়ি বলে, ঠিক আছে, ওটা এখন রেখে দিন। আপনার ব্যথা বোধহয় বাড়ছে।

আজমল ম্লান হাসে। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে রাখে। দুপুর গড়িয়ে যায়। ভাবছে, বারান্দায় গিয়ে বসবে, উঠতে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাক, বাইরে না যাওয়াই ভালো। বেলায়েত ঘুমুচ্ছে, ওর নাক ডাকছে। জানালার লোহার শিকের ওপর একটা চড়ুই এসে বসে। এই বিষণ্ণতা ভারাক্রান্ত করে রাখে ওকে। ও আবার কাগজটা খুলে ধরে।

৯-১-৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো, তখন উপরোক্ত এস আই এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুট দিয়ে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করল। এরপর আমার ডান পায়ের গোড়ালিতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সে সময় আধা অচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস আই-কে বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম : আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না কর, তাহলে সেপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এস আই এবং সেপাইরা ফিরে এল এবং তারা আবার সেই হুমকি দিল। কিন্তু আমি যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজি হলাম না, তখন তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখল এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করল। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

'পরদিন ১০-১-৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন আমি দেখলাম যে, আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে এবং আমার কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণভাবে ভিজে গেছে। সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হলো। নবাবগঞ্জ জেল গেটের সেপাইরা জোর ঘুষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল।

'সে সময় আমি একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম। কাজেই কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং কয়েজন সেপাই আমাকে একটি সেলের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেল। তখন আমার রক্তপাত হচ্ছিল এবং খুব বেশি জ্বর ছিল। সম্ভবত নবাবগঞ্জ সরকারি হাসপাতালের একজন ডাক্তার সেই সময় আমার জ্বর দেখেছিলেন ১০৫ ডিগ্রি। যখন তিনি আমার কাছে আমার দারুণ রক্তপাতের কথা শুনলেন, তখন তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, একজন মহিলা নার্সের সাহায্যে আমার চিকিৎসা করা হবে। আমাকে কিছু ওষুধ এবং কয়েক টুকরো কম্বলও দেওয়া হলো।'

আজমল ঘড়ি দেখে বুঝতে পারে যে, এখন নার্স আসবে। ও কাগজটা বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। জবাগাছের ডালে হলুদ আলো এসে পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলায়েত ওর বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে বই পড়ছে। আজমলের মনে হয়, ওর উঠে বসারও শক্তি নেই। ও হয়তো আর কোনোদিন উঠে বসতে পারবে না।

আপনার ওষুধ।

নার্সের কর্কশ কণ্ঠ ওর কানে বাজে। ও তাকায় না। হাত বাড়িয়ে দেয়। ওষুধটা খেয়ে ফেলুন। শরীর কেমন লাগছে?

জানি না।

নার্স একমুহূর্ত ওর দিকে থমকে তাকায়। তারপর চলে যায়। ওর বলতে ইচ্ছে করে যে, সিস্টার, আমি সত্যি কথাই বলেছি যে আমি কেমন আছি, জানি না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটু পর বেলায়েত উঠে এসে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, হয়েছে পড়া?

না।

ধুত, আপনি কোনো কাজের না। এ তো এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার জিনিস।

সেটা আপনি পারেন, আমি না। আমার বুক পুড়ে যায়, দগদগে ঘা হয়, সে ঘায়ে পোকা জমে। এবং যন্ত্রণা আমাকে কুরে খায়। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারি না। ওটা পড়লে আমার মৃত্যুর কথা মনে হয়। আমি জানি, ওটা পড়া শেষ করতে পারলে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। আজমলের চোখ জ্বলে ওঠে। সে আলোর দিকে তাকিয়ে বেলায়েতের খুব ছোট মনে হয় নিজেকে। দ্রুত আজমলের হাত জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনার আবেগ বুঝতে পারিনি।

আজমল জামার হাতে চোখের জল মুছে বলে, পৃথিবীতে যদি কোনো পবিত্র জিনিস থাকে, রানীমা আমার কাছে তাই। শুধু কথা দিয়ে এটা বোঝানো যায় না।

বেলায়েত আবার ওর কাছে মাফ চায়। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, আমরা রাজনৈতিক কর্মী, কিন্তু আপনারা জীবনের বিনিময়ে রাজনীতির যোগ্য হয়েছেন। এত অল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনার অনুভূতি বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মাফ করবেন।

বেলায়েত নিজের বিছানায় ফিরে যায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নার্স এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানালা বন্ধ করে দেয়। ও নিষেধ করে, দোহাই লাগে, জানালাটা বন্ধ করবেন না।

অন্যদের ঠাণ্ডা লাগছে।

সেই কর্কশ কণ্ঠ আজমলের বুকে এসে লাগে। ও আর কথা বলে না। ওষুধগুলো খায়নি, খাটের পাশে ফেলে দিয়েছে। ঘরে মিটমিটি আলো জ্বলছে। রাতের খাবার দেয়া হয়েছে। সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ। বেলায়েত কম্বলে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে। ও নিজেও গায়ের ওপর কম্বল টেনে নেয়। তারপর আবার সরিয়ে রাখে। মনে হয় গরম লাগছে। প্রচণ্ড অস্থিরতা ওকে দাবড়ে বেড়ায়। ও কাগজটা মেলে ধরে। অল্প আলোয় পড়তে কষ্ট হয়, তবু পড়ে ফেলতে চায়।

১১-১-৫০ তারিখে সরকারি হাসপাতালে নার্স আমাকে পরীক্ষা করলেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন, সেটা জানি না। তিনি আসার পর আমার পরনে যে রক্তমাখা কাপড় ছিল, সেটা পরিবর্তন করে একটা পরিষ্কার কাপড় দেওয়া হলো, এই পুরো সময়টা আমি নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার শরীরে খুব বেশি জ্বর ছিল, তখন আমার দারুণ রক্তপাত হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।

'১৬-১-৫০ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আমার সেলে একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসা হলো এবং আমাকে বলা হলো যে, পরীক্ষার জন্য আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। খুব বেশি শরীর খারাপ থাকার জন্যে আমার নড়াচড়া সম্ভব নয়—এ কথা বলায় লাঠি দিয়ে আমাকে একটা বাড়ি মারা হলো এবং স্ট্রেচারে উঠতে আমি বাধ্য হলাম। এরপর আমাকে অন্য এক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি সেখানে কিছুই বলিনি, কিন্তু সেপাইরা জোর করে একটা শাদা কাগজে সই আদায় করল। তখন আমি আধা অচেতন অবস্থায় খুব বেশি জ্বরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিল, সেজন্য পরদিন আমাকে নবাবগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে পাঠান হলো। এরপর যখন আমার শরীরের অবস্থা আরো সঙ্কটাপন্ন হলো, তখন আমাকে ২১-১-৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানে জেল হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হলো। কোনো অবস্থাতেই আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশকে কিছু বলিনি এবং ওপরে যা বলেছি, তার বেশি আমার আর বলার কিছু নেই।'

পড়া হয়ে গেলে প্রবল বিবমিষায় ওর চারপাশ ঘোলাটে হয়ে যায়, নিস্তেজ হয়ে আসে শরীর। ও দুহাতে লোহার খাটের রড আঁকড়ে ধরে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বুকের ব্যথা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ওর ফুসফুসে কোনো বাতাস নেই। একজন কেউ যদি ঐ জানালাটা খুলে দিত? বন্ধ জানালার এ-পাশে ও স্নিগ্ধ, নির্মল বাতাসের জন্য মুখ হাঁ করে। ওর চোখ স্থির হয়ে যায়। এবং সে হাঁ আর বন্ধ হয় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ইত্যাদি প্রকাশনা

ISBN 984 70289 0290 6

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~